তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ

মোঃ ফজলুর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নং : ১৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৪-২০০৫
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
মার্চ ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ

মোঃ ফজলুর রহমান

Dhaka University Library
466320
466320

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
মার্চ ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন এমএ; এম ফিল; পিএইচ ডি
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০২-৯৬৬১৯০০/৬০২৪
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল : gias_shamim@yahoo.com

একুশে-৫, আবাসিক শিক্ষক ভবন
অমর একুশে হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০২-৯৫৭ ১২ ৭১ (বাসা)
০১৫৫২-৩৪ ১৭ ৮৯ (মোবাইল)

মঙ্গলবার ২৭ মার্চ ২০১২

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি , এবং কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

(ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-কথন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে 'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ' শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনায় নিয়ত তাগিদ ও সুচিন্তিত প্রয়োজনীয় পরামর্শদানে তিনি আমাকে উপকৃত করেছেন। তিনি নানামুখী দিক-নির্দেশনা, সময়োপযোগী মতামত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণা-উপযোগী গ্রন্থ প্রদান করে আমার গবেষণাকর্মকে করেছেন ত্বরান্বিত। গবেষণার বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর আহমদ কবির। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। একই বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর বিভিন্ন সময়ে গবেষণা-উপযোগী তথ্য প্রদান করে আমাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁদের অবদান কখনো ভুলবার নয়। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের লেকচারার তাশরিক-ই হাবিব।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কথাকোবিদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। রাঢ় বাংলার নন্দিত কথাকার তিনি। বাংলা কথাসাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পে তাঁর বিচরণ সর্বপ্রসারী। তাঁর ছোটগল্পের বর্ণাঢ্য ও বিস্তীর্ণ পরিসরে উঠে এসেছে রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতির বহুবর্ণিল জীবনকথা। অথচ এ প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপবিষয়ক গবেষণা সীমিত পরিমাণেই হয়েছে। আমাদের এ অভিসন্দর্ভে রাঢ় বাংলার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষের নানামুখী বৃত্তি, বৈচিত্র্যময় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার-সংস্কৃতি, ধর্ম, টাবু, টোটেম প্রভৃতি গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে। আদিবাসী বাউরি, বাগ্‌দি, ডোম, হাড়ি, চণ্ডাল, সাঁওতাল, বেদে প্রভৃতি বর্ণ-উপবর্ণের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ মূল্যায়ন অভিসন্দর্ভটিতে বিশেষ প্রযত্নে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। 'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে তিনটি অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'তারাশঙ্করের দেশ-কাল ও সাহিত্য ভাবনা।' এ অধ্যায়ে তারাশঙ্করের মানসপ্রবণতা, ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-প্রতিবেশ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্ত-জনজাতি সম্পর্কে তারাশঙ্করের ভাবনার নবীকরণ করা হয়েছে এ- অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের অবস্থান'। এ অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পের প্রবহমান ধারায় রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করে বিভিন্ন গল্পকারের অবদান ও প্রবণতা উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের প্রাতিস্বিকতা ও অনন্যতা এ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ'– এ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ক. জীবন,

খ. জীবিকা, এবং

গ. সংস্কার ও সংস্কৃতি

রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জনজাতির যে জীবনাচার মহৎ শিল্পী তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বর্ণিত হয়েছে তা এ অধ্যায়ে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে রূপাঙ্কিত হয়েছে। রাঢ়ের প্রান্তস্পর্শী মৃত্তিকাশ্রিত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, গোত্র ও গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অকথিত জীবন, জীবিকা, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিমিশ্র এক জগতের বর্ণনা নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে এ অধ্যায়ে।

'উপসংহার' অংশে বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী তিন অধ্যায়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের সারাৎসার। এ অংশে প্রান্তিক চরিত্র চিত্রণে তারাশঙ্করের অবস্থান বিশেষভাবে সুচিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ সুষ্ঠুভাবে রচনার জন্য আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কবি সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। বিশেষত ক্যান্টনমেন্ট কলেজের লাইব্রেরিয়ান জনাব মো: শামসুল আলম নানা সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রদান করে আমাকে ধন্য করেছেন। অভিসন্দর্ভ মুদ্রণে আমাকে ঋণী করেছেন আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ইনফরমেশন সেলের মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ খাঁন।

সহধর্মিণী শিরির হাসিমুখ আমাকে নিরন্তর উদ্দীপিত করেছে অভিসন্দর্ভ রচনায়। পুত্র অরণ্যের লাবণ্যদীপ্ত মুখশ্রী আমাকে দিয়েছে নীরব প্রেরণা। এদের প্রতি আমার অফুরান ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রাক-কথন

প্রথম অধ্যায় :	তারাশঙ্করের দেশ-কাল ও সাহিত্য ভাবনা	১-১১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের অবস্থান	১২-৩২
তৃতীয় অধ্যায় :	তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ	
	ক. জীবন	৩৩-৬১
	খ. জীবিকা	৬২-৯১
	গ. সংস্কার ও সংস্কৃতি	৯২-১৭৪
উপসংহার		১৭৫-১৭৮
গ্রন্থপঞ্জি		১৭৯-১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্করের দেশ-কাল ও সাহিত্য ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের দেশ-কাল ও সাহিত্য ভাবনা

বাংলা কথাসাহিত্যের এক নন্দিত রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। তিনি ছিলেন রাঢ়ের গর্বিত সন্তান। রাঢ়বঙ্গের মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ প্রান্তিক জীবনের অসামান্য রূপকার তিনি। জন্মভূমির ভূ-বিন্যাস, জলবায়ু, মৃত্তিকার আচার-প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। তারাশঙ্করের দেশ-কাল ও সাহিত্য সাধনায় তাঁর জন্মস্থান লাভপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাব বিশেষভাবে সুচিহ্নিত। 'লাভপুর তথা রাঢ়-বঙ্গের বীরভূম জেলার বালি-কাঁকর-মিশ্রিত গৈরিক মৃত্তিকার এবং রুদ্র প্রকৃতির উষ্ণ বায়ুপ্রবাহী প্রভাব-পরিচর্যার আশ্রয়ে তারাশঙ্কর-মানস পরিস্রুত।'[১] রাঢ়ের যে মৃত্তিকায় তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন আমৃত্যু, সে মাটির ঘ্রাণকে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে লালন করেছেন। তাঁর বর্ণিল সাহিত্যসম্ভারে এই মৃত্তিকাসম্পৃক্ত প্রান্তিক মানুষের সার্বিক জীবনাচার আকাঁড়া বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়েছে। রাঢ়বঙ্গের লীলাময় ভূবিন্যাস বিশেষত 'বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরই জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে একদিকে বর্ধমানের শস্যপূর্ণ আদিগন্ত প্রান্তর, অপরদিকে বীরভূম ও বাঁকুড়ার তরঙ্গময় কাঁকুরে রুক্ষতা, জীবনের দ্বৈত রূপকে এখানে যুগপৎ ধরে রেখেছে।'[২] রাঢ়ের ভূ-প্রকৃতিতে জীবনের এ-দ্বৈতরূপ বিশেষভাবে প্রকটিত। গ্রীষ্মের বৃষ্টিপাতহীন মরু প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডব এ অঞ্চলে যেমন পরিদৃশ্যমান; তেমনি বর্ষায় রূঢ় প্রকৃতির বুক ফুঁড়ে কাঁকর মৃত্তিকায় ফুটে ওঠে জীবনের গীতল লাবণ্য। 'রাঢ়ের নিসর্গ রূঢ়। রূঢ়তার কন্দরে অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহের নির্ঝর, উদ্দাম ও গতিশীল। রূঢ়তার বহিরাবরণ ভেদ করে তবে এই নির্ঝরের উচ্ছ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। রাঙামাটি কাঁকরবালি আর ঝামাপাথরের মধ্যে মধ্যে সবুজের স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ।'[৩] অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষীর সঞ্জীবনী স্রোতধারা রাঢ়ের রুক্ষ-মরু প্রস্তরময় ভূ-প্রকৃতিতে এনেছে পাললিক মসৃণতা।

তারাশঙ্কর বীরভূমের জাতক। 'বীরভূমের 'বীর' কথা মুণ্ডারী কথা, অর্থ হল 'জঙ্গল'। প্রবল পরাক্রান্ত কোন বীরের দেশ বলে বীরভূম নয়, জঙ্গলভূম অর্থে বীরভূম। উত্তর রাঢ়ের মল্লভূম বীরভূম ঝারিখণ্ড জঙ্গলমহল, সবই গভীর বনাকীর্ণ ছিল। আদি-অস্ত্রাল বা নিষাদ ও দ্রাবিড়–ভাষাভাষী দাসদস্যুদের বাস ছিল এই অঞ্চল

---

[১] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪০

[২] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃষ্ঠা-২৪২

[৩] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদনা-রঞ্জনকুমার দাস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সাঁওতাল-পরগণা ছোট নাগপুরের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে। ... বাংলার রাঢ় অঞ্চল আদিবাসী প্রধান। স্তরিত শিলার মত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির স্তরে স্তরে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান নানা রূপে ও বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত হয়ে রয়েছে।'[১] বীরভূমের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বহুমাত্রিকতা এ অঞ্চলের মানুষকে একদিকে যেমন বৈষ্ণব জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলেছে; অন্যদিকে শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষিত করেছে। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এবং চারিত্রধর্মে এই দুই সহজাত বৈশিষ্ট্যই সমভাবে ক্রিয়াশীল। এই দ্বৈত ভাবনার মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্পমানস। তাঁর জন্মভূমি লাভপুরের জল-বায়ু-মৃত্তিকা তাঁকে দিয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। 'ওই (লাভপুর) গ্রামটিকে কেন্দ্র করে তিনি আশেপাশের কয়েক মাইলব্যাপী বিস্তৃত একটি বিরাট ভূ-খণ্ডের সমাজজীবনকে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তিনি ওই গ্রামে জন্মেছেন বলে নিজেকে 'ভাগ্যবান' মনে করেছেন, কারণ তিনি স্বীকার করেছেন, কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না।'[২] তারাশঙ্করের জীবনবোধ সৃষ্টিতে ও নিরন্তর সত্যের সাধনায় লাভপুর যুগিয়েছে সীমাহীন প্রেরণা।

দেশ কালের বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটেই তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পের উদ্ভব। রাঢ় বঙ্গের মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ প্রান্তিক মানবজীবনের অমসৃণ রূঢ় বাস্তবতা, সে জীবনের অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাস, তাদের গতি-প্রকৃতি, আদিম অনার্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বোহেমিয়ান উত্তরাধিকারঋদ্ধ জীবনধারা, তাদের গীতল শ্রুতিময় ভাষা ও সুপ্রাচীন গৌরবময় সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তাঁর সাহিত্যে জলতরঙ্গের ন্যায় একটা বিশেষ ঝংকার সৃষ্টি করেছে। তিনি রাঢ় বাংলার ভূ-প্রকৃতি আর প্রান্তিক জনসমষ্টির জীবনকে তাঁর সাহিত্যে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিকোণ থেকে নবতর ভঙ্গিতে চিত্রিত করতে আগ্রহী হয়েছেন।

তারাশঙ্করের চরিত্রমানসে ও সাহিত্যসাধনায় জন্মভূমি লাভপুর-কেন্দ্রিক ভূ-প্রকৃতি তথা সমাজব্যবস্থা যেমন একটা বর্ণনাতীত প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্বময় ঐতিহ্য তাঁর মনোজগতকে আমৃত্যু দোলাচলে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সামন্ত-সংস্কৃতির আভিজাত্য ও কুলমর্যাদা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিন্তু ঘূর্ণায়মান সময়ের স্রোতধারায় তাঁকে ধনতান্ত্রিক-বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সঙ্গেও সঙ্গতির সেতুবন্ধন রচনা করতে হয়েছে। বিলীয়মান জমিদারতন্ত্রের পাশাপাশি বিকাশমান পুঁজিবাদের

---

[১] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬১

[২] নিতাই বসু, *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিমাত্রিক মিথস্ক্রিয়া তাঁর সদাচলিষ্ণু মন ও মননে গভীর রেখাপাত করেছিল। 'তারাশঙ্করের জন্ম সেকাল ও একালের সন্ধিলগ্নে। একালের অন্নবস্ত্রেই তিনি মানুষ। কিন্তু তাঁর জীবনের 'পাতায় পাতায়' অদৃশ্য লিপি দিয়ে 'পিতামহদের কাহিনী' তাঁর মজ্জায় মজ্জায় লিখিত হয়েছে। গোপনচারী অতীতের 'সঞ্চার' তিনি শুনেছেন 'মর্মের মাঝখানে'।[১] পুঁজিবাদের নব উত্থান ও সামন্তবাদের নিঃশব্দ ভাঙনের সন্ধিক্ষণে তারাশঙ্করের আবির্ভাব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সামন্ত-কুলীন। তিনি ব্যবহারজীবিতাকে জীবনের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং কুলীন ধর্মের সহজাত প্রবৃত্তি স্বরূপ তিনি তিনবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দীনদয়াল চেয়েছিলেন পুত্র হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতো শিক্ষিত হয়ে ব্যবহারজীবিতাকে সমুন্নত রাখবে এবং সমাজে মান-মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শৈশব থেকে হরিদাস সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। 'নব প্রতিষ্ঠিত সিউড়ি জেলা-স্কুলে সামন্ত আভিজাত্য-চেতনায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।'[২] চলমান জীবনের অবিমিশ্র স্রোতধারায় হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিকূল সমাজ প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে একটা সময় ধাতস্থ হন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উত্তর জীবনে তিনি যেমন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন; তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিজের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রুচির ধারক স্ত্রী প্রভাবতী দেবী তাঁর এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে তাঁর জীবনে সামন্ত-কুল গৌরব একটা সৌম্য-শান্ত রূপ লাভ করে। ডায়েরি লেখার নেশা তাকে পেয়ে বসে। ডায়েরিতে তিনি অকপটে তার মনের অব্যক্ত কথাগুলি বলেছেন এবং আত্মসমালোচনা করে নিজের দোষগুলি অবলীলায় স্বীকার করেছেন। পিতা দীনদয়ালের আকাঙ্ক্ষাকে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারেননি বলেই পুত্র তারাশঙ্করের জীবনে পিতামহের অপূর্ণ আকঙ্ক্ষার বীজ রোপণ করতে চেয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মাত্র আট বছর। এই আট বছরে পিতা বালক-পুত্রকে ঘিরে তাঁর স্বপ্নের কথা ডায়েরি লিখেছিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় : 'অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশ প্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সংকল্প করিলে

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*, (১ম খণ্ড), ৭ম মুদ্রণ, ২০০৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯

[২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

তাহা বজায় রাখিবে। ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকীল হইবে। ...এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।'[১] উত্তর জীবনে তারাশঙ্কর উকিল হতে পারেননি বটে, কিন্তু 'তাঁর সাধনায় লাভপুর বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণীতীর্থে পরিণত হয়েছে।'[২] তারাশঙ্করের একক প্রচেষ্টাই লাভপুর পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মাত্রা।

তারাশঙ্করের জীবনে নিরন্তর প্রেরণার উৎস ছিলেন জননী প্রভাবতী দেবী। তারাশঙ্করের সৃষ্টিশীল জীবনবোধে তিনিই ফুটিয়েছিলেন দেশপ্রেম ও সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার বিশুদ্ধতার ফুল। তাঁর আপোষহীন ব্যক্তিত্ব, পরিমার্জিত রুচি এবং অনমনীয় দৃঢ়তায় তারাশঙ্করের মানসভুবন পরিপ্লুত ও পুনর্গঠিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বে তীক্ষ্ণতা, মন ও মননে আধুনিকতা, এবং প্রাগ্রসর রুচির ধারক প্রভাবতী দেবী লাভপুরের আভিজাত্যে ঘেরা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক জীবনে নতুন বীণার সুর ধ্বনিত করেন। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা প্রভাবতী দেবীর পর যে নারীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা তারাশঙ্করকে আমৃত্যু আলোড়িত করেছে তিনি হলেন তাঁর পিসিমা শৈলজা দেবী। 'তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী, স্বামী সন্তানহারা পিসিমা কুলধর্মে জমিদারের মেয়ে ও মর্যাদাবোধে অনমনীয়।'[৩] তারাশঙ্করের বর্ণিল ছেলেবেলা কেটেছে পিসিমার স্নেহানুশাসনে। তাঁর পিসিমা শৈলজা দেবী ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত আভিজাত্যের প্রতীক; পুরাতন কালের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অহংবোধের ধারক এবং বাহক। মূলত "সেকালে'র প্রতিনিধি পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসিমা শৈলজা দেবী এবং 'একালে'র প্রতিভূ জননী প্রভাবতী দেবীর মধ্যকার আদর্শিক দ্বন্দ্ব পরস্পরিত হয়েছে তারাশঙ্কর চরিত্রে। যে-দ্বিধা তারাশঙ্করের জীবনবীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তার উৎস ঐ পরস্পরবিরোধী প্রভাবের মধ্যে অনুসন্ধানীয়।"[৪]এর ফলে ' তেজস্বিনী ও দৃপ্তভাষিণী পিসিমার আকর্ষণ তাঁকে কেন্দ্রানুগ শক্তির মতো পারিবারিক ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য টানতে লাগল। কিন্তু প্রভাবতীর প্রভাব ছিল একেবারে বিপরীতধর্মী, তিনি কেন্দ্রাতিগ শক্তির মতো পুত্রকে বহির্বিশ্বে মুক্তি দেবার প্রয়াসিনী ছিলেন।'[৫]

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪০৮

[২] নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬

[৩] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪

[৪] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫

[৫] নিতাই বসু, *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক পরিকাঠামো থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত দ্বান্দ্বিক বিশ্বাস তারাশঙ্করের মানস-ভূমিকে অনেক সময় দ্বিধাবিদ্ধ করেছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বময় বিশ্বাস তাঁর সাহিত্যের ভুবনকে পাললিক মৃত্তিকার মতো উর্বর করেছে; ফুল ও ফসলে ঋদ্ধ হয়েছে তার সাহিত্যের তথা বাংলা সাহিত্যের ডালা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাঢ়বঙ্গের মৃত্তিকাজাত প্রান্তিক জনসমষ্টির অন্তরঙ্গ কথাকোবিদ। ক্রমপরিবর্তনশীল রাঢ়ের সংস্কৃতি, সেখানে বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন, তাদের আচার-আচরণ, পুরুষানুক্রমিক অর্জিত বিশ্বাস ও সংস্কার, বিচিত্র ধরনের ব্রত-পালা-পার্বণ, বহুমাত্রিক ও বহুকৌণিক জীবন-জীবিকা, ধর্ম-বর্ণ এবং অবিমিশ্র মূল্যবোধের রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর কথাসাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটগল্পে। 'ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উনিশ শতকের জীবনরসে পুষ্ট। অধিকাংশ সাহিত্যের পটভূমি জুড়েও রয়েছে ঐ কালেরই পরিচিত অঞ্চল পরিবেশের পরিচিতি। তাই তাঁর জীবনের 'সেকাল' উনিশ শতকের বীরভূমের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। আর 'একাল' এই সমকাল–বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। এই উভয়কালের কাঠামো তাঁর সাহিত্যের পটভূমি।'[১] উনিশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সংস্কৃতির ধূসরতা এবং বিশ শতকের ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সংস্কৃতির নব অভ্যুদয় তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পের সৃজনভূমিতে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যভাবনায় দেশ-কালের এই চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত।

তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনায় দেশ-কালের ব্যাপকতা সুগভীর রেখায় সুচিহ্নিত। রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আদিম অনার্য সংস্কৃতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০০-১৯৬৭) মতো তারাশঙ্করের অন্তরে বুনে দিয়েছিল শিল্পীসত্তার বীজ। আর জন্মভূমি লাভপুরের জল, মাটি বায়ু সে বীজকে অঙ্কুরে পরিণত করেছে এবং সময়ের আবর্তে এই অঙ্কুর শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। 'বাংলার জল-হাওয়া মাটিতে তাদের অভিন্ন যোগসূত্র আজও অম্লান। শুধু তাই নয়, অরণ্য- প্রকৃতিতে জীবন- স্বভাবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষী সত্তায় রূপান্ত রিত হয়ে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার সূচনা করেছে। বেদে, ডোম, কাহার, বাগদী, মাঝি, চণ্ডাল, ডাইনী, বেশ্যা, ডাক-হরকরা প্রভৃতি অবজ্ঞাত মানুষেরা তারাশঙ্করের সেই কৌতূহলের বিষয়।'[২] তাই তাঁর গল্পের বর্ণিল ক্যানভাসে রাঢ় বাংলার ভূমিনির্ভর সমাজব্যবস্থার সংস্কার ও সংস্কৃতি (কালাপাহাড়), যাদুকরী বা বাজীকর

---

[১] সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮

[২] দীপক চন্দ্র, তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি, *তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য*, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের যাযাবর জীবনের অনুপুঙ্খ চিত্র (যাদুকরী), আধুনিক সভ্যতার আলোর বিপরীতে অমার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্য (বেদেনী), ময়ূরাক্ষীর জলে-বাতাসে লালিত এবং বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহায় তাড়িত মাঝি-জীবনের অবিমিশ্র সংস্কৃতি (তারিনী মাঝি), ডোম শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল অকৃত্রিম দুঃসাহসিক জীবনাচার (চোর),বৈষ্ণব জীবনকেন্দ্রিক দর্শন ও তত্ত্বের সুনিপুণ রূপায়ণ (স্থলপদ্ম, রাইকমল, প্রসাদমালা), প্রান্তিক পটুয়া (রাঙাদিদি, কামধেনু) সম্প্রদায়ের অনবদ্য জীবনের গীতল বর্ণনা দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিল্পীর সহজাত প্রতিভার আঁচড়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। 'তিনি (তারাশঙ্কর) বহুতর গোষ্ঠীর মানুষকে নিরালম্ব নামগোত্রহীন বিশ্বমানের প্রতিভূ করে নয় তাদের লীলাভূমিতে, স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বকীয় ও সঠিক পরিচয়ে এঁকেছেন।[১] রাঢ়বঙ্গের রুক্ষ ভূ-প্রকৃতি, লাল কাঁকরযুক্ত মাটি ও তৎসংলগ্ন ব্রাত্য মানুষের সংস্কার ও সংস্কৃতি তাঁর গল্পে অনুপম রেখায় এবং মনোমুগ্ধকর ভাষায় আভাসিত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর অধিকাংশ গল্পে রাঢ়ের প্রান্তিক জনপদের সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিচিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু সাহিত্যিক তারাশঙ্কর যে ভূখণ্ডকে স্বীয় বিশ্বাস বোধে জেনেছেন তার 'এক প্রান্তে শাল পলাশের বন, আর এক প্রান্ত গিয়ে সীমা টেনেছে উদ্ধারণপুরের শ্মাশান ঘাটে। মাঝখানে কোথায়ও কোথায়ও ফসলের ভরাক্ষেত কোথায়ও বা মহানাগের বিষ নিঃশ্বাসে জর্জরিত কাঁকর বিকীর্ণ বিশাল ব্রক্ষডাঙ্গা যার নাম হয়তো ছাতিফাটার মাঠ।'[২] দেশকালের এ বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটেই তাঁর অধিকাংশ গল্পের উদ্ভব। মৃত্তিকাসম্ভব মানবজীবন এবং সে জীবনের আদিম সংস্কৃতি তাঁর অন্বিষ্ট। তাই তাঁর গল্পে হাড়ি, বাগদী, চণ্ডাল, বাউরি, ডোম, সদ্গোপ, লেটরা, সাঁওতাল বাঁসফৌড় , যদুপতি, মুচি, মাঝি, মালোপাহাড়ি, আদিবাসী, ঝুমুর, চৌকিদার, কামার, কুমোর প্রভৃতি প্রান্তিক জনচরিত্রের সংস্কার ও সংস্কৃতির স্বরূপ তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিদৃশ্যমান। বীরভূমের প্রান্তিক মানুষের সংস্কৃতিতে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচারের পাশাপাশি লৌকিক ধর্মীয় আচার-আচরণও পরিস্ফুট। 'ধর্ম ঠাকুরের পূজা, ডাক সংক্রান্তি, ধান্যরোপণ বিষয়ক তুকতাক, পানের চাষের জন্য কুমারী পূজা, ক্ষেত্র পূজা, পণ্ডাসুর প্রক্রিয়া, এরকসিম, মুঠপূজা, ক্ষেতুড়ী, চাউরী, বাউরী, আউনি, বাউনি প্রভৃতি'[৩] লোকাচার ও লোকরীতি প্রান্তিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এক অভিন্ন সংস্কৃতির মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে। তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা প্রান্ত মানুষের আকাঁড়া অমার্জিত সংস্কৃতিকে

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা*, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭, নবার্ক, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৯

[২] উদ্ধৃত, সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্করের: জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৪

[৩] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৮

Dhaka University Institutional Repository

তার সাহিত্য ভাবনায় এনেছেন এবং অসংখ্য গল্পের প্লট হিসেবে এই সংস্কৃতির অমসৃণ রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন 'ডাইনী ডাকিনী ভূত প্রেত সঙ্কুল আমার সেকাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতিদিনই এদের কারু না কারুর বা কোন দলের না কোন দলের সঙ্গে দেখা হতই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারণেই।'[১] আর এজন্যেই তারাশঙ্করের গল্পে কৌম জনজাতির জীবনাচার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে।

রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিকড়সন্ধানী জীবনবোধ ও তার বিচিত্র স্বরূপ চিত্রণে তারাশঙ্কর ছিলেন বরাবরই আন্তরিক। 'রাঢ় অঞ্চল কৌম সংস্কৃতির বাহক। কৌম বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নিয়েই রাঢ়ের আঞ্চলিক সংস্কৃতি। বহু কৌমের জীবন ও ধর্মাচরণের সামগ্রিক রূপ নিয়েই বৃহৎ রাঢ়ের সংস্কৃতি। রাঢ় সংস্কৃতির এই বিভিন্ন ধারার মধ্যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি অন্যতম। বীরভূমের এককূলে রয়েছে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন সংস্কৃতি, অন্যকূলে প্রবাহিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় সহজিয়া ভক্তিধর্মের ফল্গুধারা।'[২] বীরভূমের এই সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা বোঝাতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রাইকমল' উপন্যাসের প্রারম্ভে বলেছেন 'পশ্চিম বাংলার রাঢ়দেশ। এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। ... এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই।'[৩] তারাশঙ্করের চিন্তায় এবং সাহিত্যে রাঢ়ের অন্ত্যজ সংস্কৃতি এবং সহজিয়া বৈষ্ণব সংস্কৃতির দ্বৈত প্রভাব সমান্তরালভাবে অনুসৃত হয়েছে। তিনি শিল্পীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে যেমন পতনোন্মুখ সামন্ত সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন; তেমনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবরিত সংস্কৃতির নিটোল ছবি অঙ্কন করেছেন তাঁর কথাসহিত্যে; বিশেষত ছোটগল্পে। 'আর্টিস্টের অনাসক্ত দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর দেখেছেন—মানুষের আদিম অপরাধ প্রবণতা, দেহ-মনের কুৎসিত ব্যাধি, পতনোন্মুখ জমিদারকুলের অস্তগামী গরিমা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ, এবং তার পাশাপাশি আদিম মানুষ বেদে-বাউরি-সাঁওতাল-রাজবংশীর দল।'[৪] সমাজের প্রান্তবর্তী মানুষের জীবন এবং সে জীবনের বিচিত্র স্বরূপের প্রতি শিল্পী তারাশঙ্করের ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। সমাজের উপান্তে বসবাসরত যে চরিত্রগুলো মূল স্রোতধারা থেকে

---

[১] আমার কালের কথা, *তারাশঙ্কর রচনাবলী* ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১

[২] সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৬

[৩] *তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, ১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৫

[৪] রথীন্দ্রনাথ রায়, গল্পকার তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), রমা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৮০

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্ন; যাদের সংস্কৃতি সুমার্জিত সভ্যতার লীলাভূমি থেকে দূরবর্তী, তিনি তাঁর সাহিত্যে সেইসব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'তারাশঙ্কর তাঁর আধা কাল্পনিক আধা বাস্তব কাহিনীতে রুক্ষ রাঢ়ভূমির গোষ্ঠী ভিত্তিক জীবনের রসনালোভী জীবনযাত্রার কথা বলেছেন। তাদের ধর্মীয় জীবন, আচার-আচরণ, মেলা পার্বণ, নবান্নের গান, গাজনের উৎসব, রাঢ়ের নিষ্ঠুর প্রকৃতি, ছাতিফাটা মাঠের নির্মম নির্জনতা, ময়ূরাক্ষীর বান-প্রভৃতি স্থানিক সত্যতা ও কিছু লৌকিক কাহিনীর মাধুর্যে রাঢ়ের লৌকিক জীবন ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপ রসে গন্ধে ভরিয়ে তুলেছেন।[১] রাঢ়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বর্ণ-উপবর্ণের মানুষের স্বভাব-সংস্কৃতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ সংস্কার এবং মৃত্তিকাজাত আচার-আচরণ তাঁর সাহিত্যভাবনায় দেশ-কালের প্রেক্ষাপটেই চয়িত হয়েছে। 'প্রথম থেকেই তিনি কারো প্রতিধ্বনি নন–প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা।'[২] তিনি জীবনের আদি-অকৃত্রিম রহস্যেরই অনুসন্ধান করেছেন। রাঢ়ের আদিম অনার্য সংস্কৃতি তাঁর লেখনীর প্রাণস্পর্শে সভ্যজনের কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে।

সময়ের পথ-পরিক্রমায় ব্যক্তি তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য ভাবনায় রাজনৈতিক প্রভাব প্রগাঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। তিনি যে সময়ের জাতক সে সময়ে বাংলার রাজনীতি একটা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে উনিশ এবং বিশ শতকের অস্থির চিত্তকেই যেন প্রকাশমান করে তুলেছিল। তারাশঙ্করের স্বীয় চেতনা যেমন রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে; তেমনি তাঁর সাহিত্য ভাবনাতেও লেগেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ছোঁয়া। 'চৈতালী ঘূর্ণি,' 'মন্বন্তর', 'হাসুলী বাঁকের উপকথা', 'কালান্তর' উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ পরিদৃশ্যমান। তাঁর সমকালে একদিকে 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়ন এবং দেশীয় জমিদার, মহাজন, কাবুলিওয়ালা, নায়েব গোমস্তাদের শোষণ ও পীড়ন ছিল উচ্চমাত্রায়, অন্যদিকে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক আরোহণ ও অবরোহণের সঙ্গে বঙ্গবঙ্গ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আইন অমান্য আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–প্রভৃতি ঘটনা লাভপুরের ভেঙ্গে পড়া সমাজের সামনেও উপস্থিত হয়েছিল নবরূপে। অরন্ধন, হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বস্ত্রে আগুন, মানিকতলায় বোমার হামলা, দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞের শোভাযাত্রায় বোমা প্রভৃতি মহানগর কেন্দ্রিক ঘটনার জোয়ারে লাভপুরের জনজীবনেও এসেছিল নতুন উদ্দীপনা; প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' থিয়েটার, 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'। আর নাট্য আন্দোলনকেই কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল সাহিত্য চর্চা। এই বিচিত্র পারিপার্শ্বিক তারাশঙ্করের কৈশোর

---

[১] সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্করের: জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২০

[২] রথীন্দ্রনাথ রায়, গল্পকার তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের পরিবেশ।'[১] সংঘাতময় এই পরিবেশ তাঁর অন্তরকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে সে আলোড়নকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন গণমানুষের দুয়ারে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যমানস নির্মিত হয়েছে সমকালীন জীবনের বিচিত্র এইসব ঘটনার আলোড়ন ও বিলোড়নের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক প্রতিবেশই তাঁর রাজনৈতিক অনুভূতিকে সক্রিয় করে তুলেছিল। 'শৈশবের পারিবারিক পরিমণ্ডল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়ক হয়েছিল। পিতা ও জননীর স্বদেশানুরাগ রাজদ্রোহী- মানসিকতা এবং মাতুল পক্ষের বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংস্রব শৈশব-কৈশোরেই সৃষ্টি করেছিলো তারাশঙ্করের সতর্ক ঔৎসুক্য।'[২] বিপ্লবী নলিনী বাগচী (১৮৯৬-১৯৮১), অহিংস আন্দোলনের পথিকৃৎ মহাত্মাগান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শ তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। স্বদেশপ্রেমের আদর্শও তিনি পেয়েছিলেন বিপ্লবী নলিনী বাগচীর কাছ থেকে। তারাশঙ্কর অবশ্য বিপ্লবী নলিনী বাগচীর আকর্ষণ থেকে বিযুক্ত হয়েছিলেন জীবনের উন্মেষ পর্বেই। তবে নেতাজী সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে 'আমার সাহিত্য জীবন'-এর স্মৃতিকথায়। তাঁর মতে- 'বাঙালার যৌবন শক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত।'[৩] নেতাজীর তেজস্বিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন মনোবৃত্তি তারাশঙ্করের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবনের সুত্রপাত ঘটেছিল সাত বছর বয়সে। মাতা প্রভাবতী দেবীই তাঁকে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন; শিখিয়েছিলেন স্বদেশপ্রেমের অভয় বাণী। ১৯০৫ সালের ৩০ আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রাখী বন্ধনের প্রবর্তন হয়। 'বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে সারা বাঙলা জুড়ে স্বদেশ প্রেমের যে জোয়ার এসেছিল তারই ঢেউ লাভপুরের পল্লিজীবনকেও আলোড়িত করেছিল। ত্রিশে আশ্বিন প্রভাবতী দেবীই তারাশঙ্করের হাতে প্রথম রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর বলেছেন, সেই তাঁর 'উপনয়ন'।[৪] একদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস; অন্যদিকে সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি দোদুল্যমান সমর্থন তাঁর অবিমিশ্র রাজনৈতিক চেতনাকে কখনো কখনো দ্বিধা বিভক্ত করেছে। উত্তরজীবনে তিনি সনাতন

---

[১] সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২
[২] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬১
[৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, বেঙ্গল পাবশিলাশর্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৯
[৪] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের জীবনচর্চার সন্ধান এবং তারই আদর্শে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার সাধনা করেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শিল্পী তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছেন 'পল্লী জীবন ও পল্লী সমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙ্গে পড়তে গিয়ে কোন ক্রমে সেই ভাঙ্গা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে- শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ; ঈশ্বরের নীরবতা গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।'[১] তারাশঙ্কর ছিলেন কংগ্রেসের কর্মী, কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ও ভারত ছাড় আন্দোলনের সমর্থক কিন্তু এর কোনটাকেই জীবনের চরম আদর্শ বলে ধারণ বা লালন করেননি তিনি। শেষ জীবনে অবশ্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাতত্ত্ব দ্বারাই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। গান্ধীকে তিনি তাঁর জীবনের পরম পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীর অহিংসা আন্দোলন তাঁর উর্বর মনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আকর্ষণের সেই পরম অনুভবের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন- '১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে। ... আরও একটা দিক আকর্ষণ করেছিল-সেটা হ'ল মানব জীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা।'[২] গান্ধীকে জীবনের মর্মে অনুধাবন করার পূর্বে লেনিনের প্রভাবকে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শে দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা তিনি প্রতিনিয়ত করেছেন। রাজনৈতিক চেতনার দোলাচলতাকে তিনি জয় করেছিলেন দৃঢ় মনোবলের সাহায্যে। স্বীয় সক্ষমতার উপর আজীবনই তাঁর আস্থা ছিল অটুট। 'তারাশঙ্কর দেখেছেন অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী গোপনচারী হিংসা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু, অর্থনৈতিক বিপর্যয় নীতিবোধের পশ্চাদপসরণ–তবু এ সমসাময়িকতাকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি তার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন।'[৩] রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় তারাশঙ্করের যে মানসদ্বন্দ্ব তা তাঁর দেশ-কালের প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য। এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর সাহিত্য ভাবনাকে করেছে দিগন্ত প্রসারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল কালসীমায় তাঁর জন্ম এবং বিংশ শতাব্দীর মৃত্তিকা জল হাওয়ায় তিনি বিকশিত হয়েছেন। বীরভূমের রক্ষণশীল সমাজের অর্গল ভেঙে সেখানে নবযুগের প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছেন। রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষ তাঁর সাহিত্যে ভীড় করে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক দোদুল্যমানতা এই সব প্রান্তবর্তী মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করেনি। 'পরিবর্তনের

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮

[২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

[৩] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর প্রসঙ্গ, *তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য*, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢেউ বীরভূমের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ শতকের যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলা কথাসাহিত্যের নববিকশিত রূপ, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর সেই পটভূমি-রস পুষ্ট।'[১] রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষের অকৃত্রিম জীবনাচার, সে জীবনের আবেগ-অনুভূতির বিচিত্র স্বরূপ নানামাত্রিক বিন্যাসে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে রেখাঙ্কিত হয়েছে।

কবিতা দিয়ে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের পট উন্মোচিত [২] হলেও কালক্রমে নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে অবিরত। শেষ পর্যন্ত ছোটগল্পের সৃজন ভূমিতে বিশেষ করে রাঢ় বাংলার প্রান্তিক চরিত্রের বিচিত্র স্বরূপ অঙ্কনে তিনি একক সার্থকতা অর্জন করেছেন। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক বোধে দীক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনাকে কখনো কখনো দ্বিধান্বিত করেছে। কিন্তু দেশ-কালের ঐতিহ্যকে আত্তীকৃত করে শেষ পর্যন্ত তিনি সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশ সেবার পথ অনুসন্ধান করেছেন। জীবনের সমস্ত দ্বিধাকে অতিক্রম করে রাঢ়ের মৌলিক শিল্পী তারাশঙ্কর বিশ্বাস ও বোধে, অনুভব ও উপলব্ধিতে ছিলেন বিশুদ্ধ চেতনার অধিকারী এক সিদ্ধ পুরুষ। সত্য ও ন্যায়ের কণ্টকিত পথেই তিনি হেঁটেছেন; চলমান সে পথে আঘাত এসেছে কিন্তু তিনি বিপর্যস্ত হননি; সংকল্প থেকে কণামাত্র বিচ্যুত হননি। তিনি রাঢ়ের প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী তাই রাঢ়কে নিয়ে তাঁর গর্বও ছিল অন্তহীন। রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষের জীবনাচার তাঁর কথাসাহিত্যে পেয়েছে নতুনমাত্রা; অনাবিষ্কৃত সে জীবনকে তিনি বর্ণিল রঙে সুশোভিত করেছেন। জীবনের কাছে তারাশঙ্কর কখনো পরাজিত হননি, তাই জীবনের মহতী উৎসবে তিনি কখনো বিমুখ থাকেননি। মস্তিষ্কে ও মজ্জায় তিনি রাঢ়কে ধারণ করেছেন, বহন করেছেন রাঢ়ের বর্ণময় ঐতিহ্যকে। সে ঐতিহ্যকেই তিনি নিপুণ কারিগরের মতো সৃষ্টির সম্ভারে রাঙিয়ে তুলেছেন।

---

[১] সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩
তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুরু আট বছর বয়সে কবিতা রচনা করে। একদিন তিন বন্ধু মিলে খেলা করছিলেন। তখন তারাশঙ্করের বয়স সাত পেরিয়ে আট। হঠাৎ তাঁদের বৈঠকখানার সামনের বাগানে একটি গাছের ডালে পাখির বাসা থেকে একটি পাখির বাচ্চা পড়ে গেল মাটিতে। তারপর তারা বাচ্চাটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পক্ষিশাবটি মারা যায়। পক্ষিমাতা বাসায় ফিরে শাবটিকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে মরা ছানাটির পাশে এসে ঠোঁট দিয়ে নাড়া দিতে থাকে। এই করুণ দৃশ্য তারাশঙ্করের মানসকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। তিনি খড়ি দিয়ে বৈঠকখানার দরজায় একটি চতুষ্পদী কবিতা লিখলেন–

পাখির ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

[২] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের অবস্থান

বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ শতাব্দীতে সংঘটিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস সামষ্টিক চেতনার স্থলে ক্রমশ ব্যক্তিচেতনার স্ফুরণ স্পষ্টতর করে তোলে। ধর্ম-আশ্রিত সাহিত্যের বেদিমূলে নিবেদিত হয় আধুনিক জীবনবোধ। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজ-প্রতিবেশে এক ব্যাপকতর পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষত এ সময়কালে বাংলা সাহিত্যের রূপাবয়বে যুক্ত হয় নানামাত্রিক অনুষঙ্গ। রেনেসাঁস আধুনিক মানুষের জীবনকে যেমন দিয়েছে বহুমাত্রিকতা; তেমনি যাপিত জীবনে সৃষ্টি করেছে অনাকাঙ্ক্ষিত অন্তর্জটিলতা। মানবমনের বিচিত্র সর্পিল গতি-প্রকৃতি এবং অস্তিত্বের সীমাহীন সংকট সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন শিল্পরূপের প্রকাশকে করে তুলেছে অনিবার্য। এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছোটগল্পের গর্বিত পথযাত্রায় বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে আরো সমৃদ্ধ ও উৎকর্ষমণ্ডিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্স-রাশিয়া-ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ছোটগল্পের যে নন্দিত ও শিল্পিত আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায় তার বহুধা প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে, এমনকি বাংলা সাহিত্যেও। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণায় এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনেও ছোটগল্পের নান্দনিক আত্মপ্রকাশ অনুলক্ষিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ছোটগল্পের এই আত্মপ্রকাশকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। '১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্প দিয়েই বাংলা গল্পের যাত্রাশুরু।'[১] 'মধুমতী' সর্বাঙ্গ সার্থক ছোটগল্প না হলেও এরই মধ্যে সুপ্ত ছিল আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বীজ। যা পরবর্তীতে ছোটগল্পের সফল অগ্রযাত্রাকে করেছে ত্বরান্বিত। 'পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের বেগ ও ভিতরের দেশজ আবেগ এই দুই মিলে মিশে বাঙালিদের বুদ্ধির জগত যেমন নাড়া খায়, জাতিত্ব বুদ্ধি ও অভিমান যেমন তীব্র হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের দিকে মুখ ফেরাবার তাগিদও আসে। সাহিত্য-সংস্কৃতি তখন দেশীয় আবহাওয়াকে কখনো ত্যাগে, কখনো বা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিদেশি নতুনকে স্বাগত জানাতে উৎসুক, উন্মুখ। এমন দেওয়া-নেওয়ার মানস-সম্মিলনের কালে বাঙালি লেখকরা যে আপন আপন মুক্তির কথা ভাবছিলেন, নানান দিকের 'ডাইমেনশন' থেকে তার বড় ক্ষেত্রফলে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ। আর, রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ মন্দিরাবাদক–প্রথম নান্দীকার।'[২] রবীন্দ্রনাথের একক সাধনা এবং সিদ্ধিতে বাংলা ছোটগল্প অপরিপক্কতার খোলস ছেড়ে নান্দনিক মহিমায় তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে নাটক-প্রহসন-মহাকাব্য-গীতিকবিতা ও

---

[১] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৯, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৮

[২] বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-০৯

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের দ্বারা। সেই অর্থে ছোটগল্পের সরব আবির্ভাবের জন্য বিদগ্ধ পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছে এ শতাব্দীর শেষ দশক অবধি। উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক অগ্রযাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আর এই নবতর যাত্রার যিনি সার্থক স্রষ্টা, তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরোধা পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)। তিনিই বাংলা ছোটগল্পের নন্দিত নির্মাতা, তাঁর ছোঁয়ায় বাংলা ছোটগল্প অপরিপক্কতার খোলস ছেড়ে পরিপক্কতার পূর্ণাবয়বে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের দীপ্র আবির্ভাব নতুন এক কালের সূচনা করে। নবতর রূপকল্প হিসেবেই কেবল নয়, বাঙালি জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও স্বপ্নবিভঙ্গতার সচিত্র চিত্রায়ণ রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকেন্দ্রিভূত হয়ে সাহিত্যের বিচিত্র শাখা-প্রশাখাকে করেছে পরিপুষ্ট; বিশেষত, ছোটগল্পের বিশুষ্ক প্রান্তরকে দিয়েছে গীতল লাবণ্য। উপনিবেশবাদের নির্মম শোষণ ও শাসনের ফলে পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনে ভূ-কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ মানুষের জীবনের সাদা-মাটা রূপ এবং পল্লি প্রকৃতির মায়াময় স্নিগ্ধতার দ্বৈত আকর্ষণই ছোটগল্প সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে প্রাণিত করেছিল। বাংলা ছোটগল্পে তিনিই এক বিস্ময়কর জগত সৃষ্টি করেছেন। স্বীয় জীবন চেতনা ও দার্শনিকতার আধারে ছোটগল্পের এক বিনির্মিত রূপরেখা তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সর্বদা নিরীক্ষাপ্রিয় বর্ণময় রবীন্দ্রপ্রতিভা সময়ের বিবর্তনে ব্যাপকভাবে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও সাহিত্যে বিশেষভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ রূপ পেয়েছে। গ্রামীণ ও শাহরিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁর গল্পে ভিড় করে এসেছে এবং এরাই গল্পের অন্যতম প্রধান পাত্র-পাত্রী হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্র-রচিত ছোটগল্পে পদ্মার তীর-সংলগ্ন আটপৌরে পল্লি-প্রকৃতির ছায়া সুনিবিড় মায়ামুগ্ধ অচঞ্চল প্রতিবেশ চিত্রায়িত হয়েছে। এই পর্যায়ের গল্পে প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের নিগূঢ় মেল-বন্ধন তিনি যেমন ঘটিয়েছেন; তেমনি প্রকৃতির কেন্দ্রে প্রতিস্থাপিত করে মানব চরিত্রের অতলান্ত রহস্যকে ক্রম উন্মোচিত করতে আগ্রহী হয়েছেন। 'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' 'সুভা'; 'অতিথি', প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের অনায়াস মিথস্ক্রিয়া পরিদৃশ্যমান। পল্লির অনাড়ম্বর জীবনের 'মাঙ্গলিক' প্রতিবেশের সরব পরিচর্যা এ পর্বের গল্পে অনুলক্ষিত হলেও এ সময়ে 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি কেবল গ্রামজীবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়নি, সেই সঙ্গে কলকাতার নগর জীবনের গভীরে পৌঁছেছে।'[১] 'মধ্যবর্তিনী', 'কঙ্কাল'এ চেতনার সোনালি ফসল।

---

[১] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে রচিত গল্পে রবীন্দ্রনাথ পল্লির অনাড়ম্বর জীবনকে অতিক্রম করে নগরকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এ পর্বের গল্পে তিনি শিল্প-উপাদান রূপে গ্রহণ করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ রোম্যান্টিকতার ঘেরাটোপ থেকে বিযুক্ত হয়ে রূঢ় বাস্তবতার সুকঠিন মাটিতে পা রেখেছেন। ফলত নগরজীবন সম্পৃক্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন, অন্তঃসারশূন্যতা আর বিপর্যয়কে প্রতীয়মান করে তুলেছেন তিনি। 'নষ্টনীড়' এই কালসীমায় রচিত প্রতিনিধিত্বশীল ছোটগল্প। প্রথম পর্বের গল্পে ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের আবেগকে রবীন্দ্রনাথ সংবেদনশীল সত্তা দ্বারা কেবল উপলব্ধিই করেননি তাকে গল্পে বাণীরূপ দিয়েছেন, কিন্তু এ পর্বে অর্থাৎ (দ্বিতীয় পর্বে) সামাজিক-পারিবারিক প্রতিবেশে নিঃসঙ্গ মানুষের বহির্জগতের পরিচয় প্রদানই তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট।

তৃতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্র-গল্পে সংযুক্ত হয়েছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক ও বহুকৌণিক জীবন জটিলতা। এ পর্যায়ে রবীন্দ্র-গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক প্রথা- সংস্কার-সংস্কৃতি ও সমষ্টির অনিবার্য সংঘর্ষ এবং সকল প্রথাগত চেতনার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তির তীব্র দ্রোহ। বিশেষত, নারী-ব্যক্তিত্বের মুক্তি সাধনা এ কালের গল্পে বিশেষভাবে সুচিহ্নিত। 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীরপত্র', 'বোষ্টমী', 'পয়লানম্বর', 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি', 'শেষ কথা' রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের বিদগ্ধ শিল্পিসত্তার ব্যতিক্রমী প্রয়াস। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করেছেন নারীর ব্যক্তিত্ববোধ এবং গল্পের অনিবার্য পরিণতিতে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিস্থাপিত করেছেন। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রবীন্দ্র-ছোটগল্পে বাঁক বদল ঘটেছে; নানা ধরনের পর্বান্তর ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-ছোটগল্প তার অভীষ্ট লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-ছোটগল্প সময়ের প্রতিধ্বনি হয়ে উত্তরকালের ছোটগল্পকে করেছে সন্দীপিত। 'বাংলা ছোটগল্পের জন্মের পিছনে বেগ দিয়েছে রেনেসাঁ, প্রেরণা দিয়েছে বিদেশী একাধিক অনূদিত গল্প, পালন করেছে বিষয়ের ক্ষেত্রে সমকাল, জারক রস যোগান সম্ভব হয়েছে শিলাইদহের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায়। তাকে মনোরম করেছে প্রকৃতি ও কবির প্রকৃতি প্রীতি।'[১] রবীন্দ্রনাথ কালিক বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে তাঁর ছোটগল্পের বহুবর্ণিল সৌধ বিনির্মাণ করেছেন। বাংলা ছোটগল্পের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ এক নির্ভীক কান্ডারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা ছোটগল্প ও রবীন্দ্রনাথ সমার্থক অর্থেই ব্যবহৃত; রবীন্দ্রনাথই প্রথম গল্পকার যিনি বাংলা ছোটগল্পকে একটা পূর্ণতর রূপদান করেছেন। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর ব্যঞ্জনা তাঁর গল্পেই প্রতিলক্ষিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের সৌরভে ও গৌরবে তাই তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

---

[১] বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের সমকালে কথাশিল্পের নন্দিত ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য দৃশ্যমান তার পাশে শরৎচন্দ্রের গল্প রাখলে তাঁর স্বকীয়তা অনুধাবন করা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত চিরচেনা বাঙালির আটপৌরে জীবনের অকথিত উপাখ্যান শরৎ সাহিত্যে, বিশেষভাবে ছোটগল্পে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাঙালির সহজ সরল গার্হস্থ্য জীবনের অমলিন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মান-অভিমান ও প্রেম-ভালবাসার কতকথা নান্দনিক ঐশ্বর্যে অনুপম রূপরেখায় শরৎসাহিত্যে প্রগাঢ় স্নিগ্ধতায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলিতে বাঙালির সংস্কার-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও মননের সহজতর রূপটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে প্রেমজনিত নানা উত্থান-পতন, আকর্ষণ-বিকর্ষণ যেমন লক্ষ্য করা যায়; তেমনি স্নেহ-বাৎসল্যের তির্যক গতি তাঁর গল্পে সামন্ত রালভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম ধারার গল্পগুলির মধ্যে 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'অনুপমার প্রেম', 'দর্পচূর্ণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ধারার গল্পের মধ্যে 'রামের সুমতি' 'মেজদিদি' অন্যতম। 'মহেশ' শরৎচন্দ্রের এই দুই ধারার মধ্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি-প্রচেষ্টা। এ গল্পে মানুষ এবং অবলা পশুর প্রতি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের যে সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে, তা গল্পকার হিসেবে তাঁকে যেমন স্বতন্ত্র মাত্রার খ্যাতি এনে দিয়েছে; তেমনি মানবতাবাদী শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি নারী চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্র বাংলাছোটগল্পে একক মুন্সিয়ানার দাবিদার। তাঁর গল্পের অধিকাংশ নারী চরিত্রের মধ্যে তিনি শাশ্বতকালের বাঙালি নারীসত্তার স্বরূপ উন্মোচনে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর গল্পে মানুষের স্বার্থান্ধ, হীন ষড়যন্ত্র, বিকৃত লোভ-লালসা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রক্ষণশীলতার চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে; তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসার মতো মানবিক গুণাবলির স্ফুরণ শতধারায় বিকশিত হয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, 'শরৎচন্দ্রের গল্প চরিত্র বা ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেই নিভে যায় না, তা সেই সঙ্গে অন্য চরিত্রকে আলোকিত করতে চায়, তা ঘটনার স্বল্পতায় সন্তুষ্ট হয় না, বহুলতাকে ভালোবাসে। ... তাঁর ধর্ম ভাবাতিরেক, তাই ছোটগল্পের ছোট পরিসরে বাকস্বল্পতার ও মিতভাষণের মধ্যে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। আর তাঁর লক্ষ ঔপন্যাসিক সুলভ খুঁটিনাটির দিকে ও ঘটনা প্রবাহের ধাক্কায় চরিত্রকে তরঙ্গিত করে তোলা।'[১] বাঙালির প্রতিদিনের জীবনের চালচিত্র, যাপিত জীবনের ভেতরকার অন্ত র্দাহন, স্বার্থ লোলুপ বাঙালির ক্রুর ষড়যন্ত্র, তাদের নীচতা, হীনতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার তাঁর গল্পে বাঙালির চরিত্র-মানসের দালিলিক প্রমাণ স্বরূপ বিবেচ্য হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনের ধারায় প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) এক স্বতন্ত্র সারণি সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমকালে তিনি ছিলেন সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ রুচির

[১] শিশিরকুমার দাশ, *বাংলা ছোটগল্প*, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮১-১৮২

Dhaka University Institutional Repository

জনয়িতা। প্রমথ চৌধুরী অস্থি মজ্জায় একজন বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক; তাই তাঁর গল্পের শরীরে প্রবন্ধের সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, চিন্তা-চেতনা ও মননের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি সুস্পষ্ট। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্ত র্ভেদী। 'তিনি আমাদের সংকীর্ণ সমাজের সর্বত্র প্রদক্ষিণ করেছেন; তার আনাচে-কানাচে অলিতে গলিতে, আড়ালে-আবডালে, উপরে-নিচে, ভেতরে-বাইরে ঘুরেছেন, দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। কখনও কখনও মধ্যবিত্ত জীবনের সূত্র ধরে বা সূত্র টেনে পাড়ি দিয়েছেন অভিজাত সমাজে।'[১] গল্পের বিষয়, রূপ ও রীতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি নব্যতন্ত্রী ধারার অগ্রপথিক। তাঁর গল্পের অন্তর্নিহিত ভাব বা বিষয়ে নেই কোন সুগভীর তত্ত্ব বা উপদেশ; মানব বা মানবীর আদর্শিক প্রেম কিংবা স্বপ্নের ফানুসে মোড়ানো রোম্যান্টিক সম্পর্কের চিরচেনা আবেগ সেখানে অনুপস্থিত। মানব চরিত্রের বহুধা রূপাঙ্কনে তিনি তাঁর গল্পে সাতিশয় সক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট যেমন বিচিত্র, তেমনি ঘটনার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি কখনো গ্রাম, শহর, লঞ্চ, স্টিমার, ট্রেন, বাংলাদেশ কিংবা বিদেশকে অনায়াস ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন। সামাজিক কাঠামোর স্তরভেদে তাঁর গল্পে অজস্র চরিত্র ভিড় করে এসেছে। আসামি, নেশাখোর, ভবঘুরে, পানওয়ালী (নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা) হতে শুরু করে আমীন-আমলা, কেরানি, (অদৃষ্ট), মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক ('ছোটগল্প'), প্রজা, লাঠিয়াল, বিলাতফেরত ('চার-ইয়ার'), ইংরেজ গোরা ('সহযাত্রী'), জমিদার ('আহুতি') প্রভৃতি কোন চরিত্রকেই তিনি গল্পের বহিরাবরণে রাখেননি। এ সমস্ত চরিত্রই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে বিবেচ্য হয়েছে। গুরু-গম্ভীর পরিস্থিতি লঘু করবার জন্য কখনো কখনো ভূত-পেত্নীর মতো কাল্পনিক চরিত্রকে তিনি সুনিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এর ফলে তাঁর গল্পে হাসি, ভয়, করুণা প্রভৃতি রসের নান্দনিক মিথস্ক্রিয়া পরিদৃশ্যমান। তাঁর গল্পেও তাঁর প্রাবন্ধিক প্রতিভার অনুরণন লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পের প্লট যুক্তি ও তর্কের উপস্থিতিতে কখনো কখনো জটিল হয়ে উঠেছে, যা প্রকৃত গল্পরস সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। 'তাঁর গল্পের শরীরেই পাওয়া যায় প্রবন্ধের বিচিত্র আস্বাদ; বস্তুত তাঁর ছোটগল্পগুলো গল্প ও প্রবন্ধ সুলভ আলোচনার এক বিচিত্র বর্ণশঙ্কর।'[২] তাঁর গল্পে আবেগের স্নিগ্ধতা আর কল্পনার লাবণ্য বিশেষভাবে অনুপস্থিত। চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায় তিনি বাংলা ছোটগল্পে নতুন কণ্ঠস্বর।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) রবীন্দ্র উত্তরকালে বাংলা ছোটগল্পের অনন্য সারথি। জীবনের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ঘটনা তাঁর সাহিত্যের প্রেরণাস্থল। তিনি বৈচিত্র্যময় জীবনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে জীবনের বহুধা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'চলমান জীবন-যানের দ্বারপথে ছুটে চলা জগৎকে তিনি তাঁর নির্বিকার মন দিয়ে দেখেছেন, তাকেই হুবহু ধরে এঁকে দিয়েছেন গল্পের মধ্যে। জীবনের ছবি দেখে গল্পের ছবি আঁকা প্রভাতকুমারের শিল্পধর্ম।'[৩] সাদা-মাটা জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়কে অনুধ্যান করে তাকে গল্পের

---

[১] জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *প্রমথ চৌধুরী*, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৬, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭৬

[২] রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, ১৯৮৮, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯৬

[৩] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

শরীরে প্রদীপ্ত করে তোলার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমারের পারঙ্গমতা শিখরস্পর্শী। রবীন্দ্র-সমকালের কথাশিল্পী হয়েও তিনি পূর্বসূরির সৃষ্ট পথে পরিভ্রমণ করেননি; মননে ও চিন্তায়, দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে তিনি একক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাঙালির মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সেই সমাজের অন্তঃপুরে ঘরোয়া দাম্পত্য সম্পর্কের রোমান্স ও ছোট-খাটো বিষয়ান্বিষ্ট ঘটনাকে তিনি যেমন লঘু-চপল হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে 'বউচুরি', 'প্রিয়তম', 'বলবান জামাতা' 'প্রণয় পরিনাম', 'রসময়ির রসিকতা', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' প্রভৃতি গল্পে ব্যক্ত করেছেন; তেমনি স্বদেশ ও বিদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে এক চিরকালীন মানবসত্যের অনুসন্ধান তিনি করেছেন; 'ফুলের মূল্য', মাতৃহীন'- এর মতো ভিন্ন পটভূমির গল্পের মধ্যে। প্রভাতকুমারের দৃষ্টি পরিব্রাজকের জীবনের বাঁকে বাঁকে তিনি ঘুরেছেন এবং অভিজ্ঞতার ডালি পুঞ্জিত করে গল্পের পশরা সাজিয়েছেন। 'প্রভাতকুমার হাস্যরসিক নন, কিন্তু হাসি তার গল্পদেহে স্নিগ্ধ লাবণ্যের মত নয়নাভিরাম। তাঁর দৃষ্টিতে আছে প্রসাদগুণ, তাই তাঁর সৃষ্টিতে হাসির মধুস্বাদ। জীবনকে উদার চোখে দেখারও সাধনা তিনি করেছেন।'[১] বাংলা ছোটগল্প যদি হয় এক প্রবহমান স্রোতস্বিনী তবে প্রভাতকুমারের গল্প তার বেগবান ধারা। তিনি জীবনের উপরিতলের ভাষ্যকার, জীবনের অতলে ডুব দিয়ে তার নিভৃত গহীনে লুকিয়ে থাকা ক্ষতকে তিনি অনুসন্ধান করেননি। তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে সরল সুরের মূর্ছনা; যা অন্তরে কেবল কম্পনই জাগ্রত করে না, ঢেউও তোলে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও এক বর্ণময় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যে তিনি বাংলা ছোটগল্পের নবতর চিত্রকর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে 'কল্লোল' (১৩৩০), 'কলিকলম' (১৩৩৩), 'প্রগতি'(১৩৩৪) প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগান্তসৃষ্টিকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। একদিকে মার্কসবাদ, অন্যদিকে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ শিল্পসাহিত্যের প্রচলিত প্রথাগত ধ্যান-ধারণার শিকড়ে কুঠারাঘাত করে। রবীন্দ্র-আদর্শ ও চেতনা থেকে সরে এসে এই সময়ের তরুণ লেখকগোষ্ঠী মানবমনের বিকৃত ও সর্পিল যৌনাকাঙ্ক্ষা, মধ্যাবিত্তের নীতি-নৈতিকতার দ্বন্দ্ব এবং স্বপ্নালু রোম্যান্টিকতা ও ভাব বিহ্বলতার অসঙ্গতি; ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও আদর্শহীনতাকে আত্মস্থ করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। বাংলা সাহিত্যে এই সময়টাকেই বলা হয়েছে কল্লোল যুগ। বিশেষত, কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত লেখক লেখনি ধারণ করেছিলেন বলে তাদেরকে কল্লোলীয় লেখক বলে অভিহিত করা হত। এদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, (১৮৮২-১৯৬৪) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭) প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দাবী 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, ভারবি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যক্তদের এলাকায়।'[১] প্রথম সমরোত্তর কালে কল্লোলীয় ঘরানার লেখক হিসেবে সকল সংশয় সন্দেহ ও বিপন্নতাকে আত্তীকৃত করেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৬৪) আবির্ভাব। মানব মনের অবদমিত লিবিডো চেতনা তাঁর গল্পে বাণীরূপ পেয়েছে। অকম্পিত ভাব আর স্পর্ধিত ভাষায় কল্লোলের মৌল বিশ্বাসকে তিনি তাঁর গল্পে ধারণ করেছেন। তাঁর স্বনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প 'ঠানদি' তে পরকীয়া প্রেমের ভিন্নতর এক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। অবৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা এ গল্পে জীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্যুতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। আর এই বিচ্যুতির রূপাঙ্কনে তিনি যেমন ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তেমনি সংশয়হীন। মানব জীবনের গূঢ় যৌনচেতনার বর্ণনাদানে তিনি ছিলেন সঙ্কোচহীন। ফ্রয়েড ও এলিস দ্বারা তিনি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে তাঁর গল্পে মানুষের যৌনসম্পর্কের নানা বিকার ও বিকৃতি, বিবিধ অসঙ্গতি ও অনাচার বিচিত্রমাত্রিকতা নিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মানব-মানবীর দুর্নিরোধ্য সুপ্ত কামনা-বাসনার প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী। বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ কিংবা প্রৌঢ়া নারীর পরপুরুষকেন্দ্রিক অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার চরিত্র-চিত্রণে তিনি বাংলা ছোটগল্পে উত্তর আধুনিক মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি বাংলা ছোটগল্পে যে ধারণার সূত্রপাত করেছেন পরবর্তী কল্লোল কালের গল্প লিখিয়েদের হাতে সেই ধারণা সময়ের জল ও হাওয়ায় আরো পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

বাংলা ছোটগল্পের পালাবদলে কল্লোলের উৎসমুখ যদি হয় দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), তবে সে মুখে বীজমন্ত্র যুগিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)। সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, রঙহীন আদর্শের ফাঁপা জৌলুশ আর অবিশ্বাসের মৃত্তিকায় বেড়ে ওঠা নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্কের বিনির্মিত পটভূমিতে কল্লোল গোষ্ঠী যে নবতর সমাজ গঠনে প্রত্যয়ী হয়েছিলেন, অচিন্ত্যকুমার ছিলেন তাদেরই অন্যতম অগ্রণী পদাতিক। সময়ের সকণ্টক অভিজ্ঞতাকে আশ্রুত করে বাংলা ছোটগল্পে তাঁর সংক্ষুব্ধ পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সমকালীন ভবঘুরে মানসিকতা, মধ্যবিত্ত জীবনের নিঃসঙ্গতা, আত্মবিচ্ছিন্নতা ও পলায়নপর মনোবৃত্তি, নর-নারীর যৌন সম্পর্কের নানামাত্রিক বিশ্লেষণ, প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের প্রতি বিদ্রোহ এবং ভাবাবেগতাড়িত যৌবনরাগ তাঁর গল্পের অন্যতম অনুষঙ্গ। তিনি ফ্রয়েড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী অচিন্ত্যকুমার ছিলেন প্রথাবিরোধী লেখক। একদিকে কল্লোলের আহ্বান, অন্যদিকে শিল্পীর তাড়না, সাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পে তাঁকে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উদ্‌গীরণ করতে সামূহিক প্রেরণা দিয়েছে। তিনি জীবনকে দেখেছেন রোম্যান্টিসিজমের মোহ মাখানো দৃষ্টিতে। তিনি জীবনভূমিতে নোঙরের প্রত্যাশী ছিলেন না; তীরের ভাবনা তাঁর কোনদিন ছিল না, ছিল ভাসবার অদম্য নেশা। যে নেশা তাঁর মানস প্রবণতাকে কখনো কখনো ক্ষত-বিক্ষত করেছে। 'বেদে'র মধ্যে,-তথা অচিন্ত্যকুমারের প্রথম পর্যায়ের প্রায়

---

[১] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, দশম সংস্করণ, ১৪১৬, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সকল গল্পেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে একটানা হেঁটে চলার এক শ্বাসরোধকর একঘেঁয়েমি-ক্লান্তি এবং কিছুটা বিষণ্ন আতঙ্কও জমাট বেঁধে আছে।'[১] গল্প সাহিত্যে-তিনি পঙ্ক ঘেঁটে পঙ্কজের অনুসন্ধান করেছেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ের গল্পে তিনি রোম্যান্টিকতার মোহ-মুগ্ধতার পৃথিবী ছেড়ে রূঢ় বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় পদার্পণ করেছেন। তিনি নগর মধ্যবিত্তের আত্মবিচ্ছিন্ন ভুবন ছেড়ে বিচরণ করেছেন চাষা-ভুষা-মুচি-হাড়ি-ডোম-জেলে-মালো-কুলি-মজুর প্রভৃতি খেটে খাওয়া গণমানুষের জীবনের অলিতে-গলিতে। জীবনের উত্তাল-উত্তরোল ঝাঁজটুকুকে সাঙ্গীকৃত করে অচিন্ত্যকুমার সেই ক্ষয়িত বেলাভূমিতে জ্বালিয়েছেন আশ্বাসের দীপালি। ধূসর সময়ের পথ পেরিয়ে তাই তাঁর প্রতিভা ক্রমবিকশিত হয়েছে। উত্তরজীবনে তাঁর সাহিত্য সকল অস্থিরতার সীমানা পেরিয়ে হয়ে উঠেছে সর্বজনীন ও গণমুখী। তিনি পূর্ব বাংলায় চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরেছেন এবং দেখেছেন মেহনতি মানুষের জীবনসংগ্রাম। 'কেরাসিন', 'জাত-বেজাত', 'গঙ্গাযাত্রা', 'হাড়ি হাজরা' গল্পে তাঁর রূপান্তরিত মানস কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যকে আলিঙ্গন করেছে। শিল্পসাধনার আদিতেই কল্লোল-যুগের যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তিনি তার নন্দিত রূপকার। তিনি কল্লোলের এই বিদ্রোহের দণ্ডধারী দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা।

বিশ শতকের প্রথম সমরোত্তর মধ্যবিত্তের নৈরাশ্য, বিপর্যয়, প্রেম-অপ্রেম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুস্থতা-অসুস্থতা, স্মৃতিকাতরতা, জীবনের বিকার ও বিকৃতির কাহিনী বিবৃত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৭) ছোটগল্পে। কলকাতা নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের তলদেশ ও উপরিভাগের দগদগে ক্ষত এবং বিপন্নতা তাঁর গল্পে কল্লোলীয় চেতনার প্রতিভূ হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। ভাবগত এবং আদর্শগত অর্থে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকৃতই কল্লোলীয় এবং কল্লোল লেখকগোষ্ঠীর পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক সংকট ও সমস্যা, মধ্যবিত্ত চরিত্রের জটিল মানসপ্রবণতা ও অন্তর্গত মনোবিশ্লেষণ তাঁর ছোটগল্পে মৌল উপাদানরূপে বিবেচ্য হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের নিরূপায় ব্যর্থতা ও আদর্শচ্যুতি তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে চিহ্নাঙ্কিত হয়েছে। 'শুধু কেরাণী' 'পুন্নাম' প্রভৃতি গল্পে একদিকে যেমন জীবনের সুখ- দুঃখের গণ্ডি ভেঙ্গে বৃহৎ জীবনের মাঝে অন্বিত হবার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়েছে; তেমনি অন্যদিকে নীতিভ্রষ্ট মধ্যবিত্তের বিবেক দংশন, নিরুপায় অসহায়তা আর সন্তানস্নেহের অন্তরালে অন্যায়ের সঙ্গে আপসকে গল্পকার নির্মম লেখনীতে উন্মোচন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষয় ও ভাবানুষঙ্গে বৈচিত্র্য আনয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। এ পর্বের গল্পগুলোতে তিনি বিশ্বাসের মৌল ভিত থেকে বিচ্যুত ভাঙাচোরা মানুষগুলির অখণ্ড জীবনরূপ বিনির্মাণে এক অনন্য পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সংসার সীমান্তে', 'সাগর সঙ্গম' গল্পে রয়েছে এই অখণ্ড জীবনের সত্য অনুসন্ধানের নিরলস প্রচেষ্টা। মধ্যবিত্তের দাম্পত্য সংকট এবং সেই সংকট থেকে অঙ্কুরিত ঘৃণা, অবিশ্বাস ও সংশয়ের জটিলতার রূপাঙ্কনেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ করিগর। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে : 'এক প্রকার শুষ্ক,

---

[১] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনা, বাঙালী-সুলভ ভাবার্দ্রতার (Sentimentality) সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগ প্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁহার মুখ্য বিশেষত্ব।'[১] জীবনের ভাঙন ও অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনি তাই অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার বিশ্লেষণে নিপুণ ব্যবচ্ছেদক।

বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যময় সমৃদ্ধ ধারায় বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) আবির্ভাব আকস্মিক নয়, বরং অনিবার্য। কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সংযোগ সংযুক্ত থাকলেও তাঁর গল্পে সমকালীন যুগসঙ্কট কাব্যিক স্কেচধর্মিতার মধ্য দিয়ে প্রদীপ্তমান হয়ে উঠেছে। 'যুগধর্মের বৈনাশিকতায় বুদ্ধদেব বসুর মানসপ্রান্তর হয়েছিল বৃত্তাবদ্ধ জীবনসন্দিগ্ধ শিকড়-উন্মীলিত বিশ্বাসবিচ্যুত, কখনো-বা সত্তাবিচ্ছিন্ন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষত ছোটগল্পে, অঙ্কন করেছেন দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের নৈঃসঙ্গ্যের দুর্ভর বেদনা, আত্মদহনের তীক্ষ্ণমুখ জ্বালা, বিচ্ছিন্নতার দুর্মর যন্ত্রণা, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার আত্মমুখী স্বপ্নলোক। বদ্ধুদেব বসু মূলত ঢাকা এবং কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তবে তাঁর গল্পে নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম-ক্ষোভের ছবি নেই, আছে শাহরিক মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক প্রেম, সূক্ষ্ম পরিশীলিত অন্তর্জীবন আর হার্দিক রক্তক্ষরণের বহুবর্ণিল প্রান্তর।'[২] চিন্তার বৈপরীত্য, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে চরম দোটানা মনোবৃত্তি, রোম্যান্টিকতার রঙিন ফানুসে ভর করে জীবনের বেলাভূমিতে সুনীল সন্তরণ, সংকটময় বাস্তবতা থেকে নস্ট্যালজিক জগতে উত্তরণ ও প্রগলভ কল্পনার মাধ্যমে তিনি গল্পের শরীরে বুনে দিয়েছেন কবিতার মায়াবী মুগ্ধতা।

জগদীশগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের পুরোধা পুরুষ। বাংলা ছোটগল্পে তিনি পূর্বসূরিদের প্রদর্শিত পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছেন। সাহিত্য তাঁর কেবল পুরাতনের প্রতি অবিশ্বাসই নয়, যুগার্জিত প্রচলিত বিশ্বাসের মৌল ভিতকে তিনি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন। অনাস্থা আর অবিশ্বাসকে আত্মায় ও সত্তায় আত্মস্থ করে বাংলা ছোটগল্পে তাঁর অসন্দিগ্ধ আবির্ভাব। প্রণয়, রোম্যান্টিকতা ও আদর্শের মোহাচ্ছন্নতাকে ঝেড়ে ফেলে তিনি কথাসাহিত্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন মানবজীবনের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রত্ন ইতিহাস। মানুষকে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন নিরন্তর যন্ত্রণা ও দুঃখের মধ্যে, নিঃসীম একাকীত্ব ও অসহায়ত্বের মধ্যে। তিনি তাঁর গল্পে মানবজীবনের অর্থহীন ভাববিলাসিতা, রোম্যান্টিকতার মোহ জড়ানো স্বপ্নমুগ্ধতা, কাঙ্ক্ষিত অনুভূতির মায়াবী হাতছানিকে কেবল অস্বীকারই করেননি; অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে তাকে তমিস্রাচ্ছন্ন করে তুলেছেন। তিনি অস্থিমজ্জায় কল্লোলের হলেও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন কল্লোলোত্তর। মানবজীবনের সৌন্দর্য ও কল্যাণ সম্পর্কে তিনি তাঁর গল্পে সর্বদা নঞর্থক ধারণাতে কেন্দ্রীভূত থেকেছেন। নীতি ও নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি দ্বিধান্বিত; আদর্শ তাঁর কাছে কেবল অপেক্ষিকই নয়, অর্থহীন এক চেতনার কল্পিত রূপ বলে বিবেচ্য। তাঁর গল্পে সততা, সৌন্দর্য, আদর্শ ও

---

[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪৭৫

[২] বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা ছোটগল্প: রূপ-রূপান্তর, *একুশের প্রবন্ধ* ১৯৯৯, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

শুভবোধের ভাঙন ও বিপর্যয় নির্লিপ্ত প্রাতিস্বিকতায় রেখাঙ্কিত হয়ে উঠেছে। নিয়তির অমোঘ পরিণতি, স্বার্থান্ধ মানুষের প্রবৃত্তির কাছে সীমাহীন অসহায়তা, নর-নারীর বিকৃত যৌন সম্পর্কের ভয়াবহ বিনাশী রূপ জগদীশ গুপ্তের গল্পে ভিন্নতর মাত্রায় সংযোজিত হয়েছে। 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন', 'আদিকথার একটি', 'দিবসের শেষে', গল্পগুলিতে শিল্পীর মানসপ্রবণতার বিশ্বস্ত ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি নঞর্থকতার চিত্র এঁকে তাঁর গল্পে জীবনের শতদল ফুটিয়েছেন; কখনো কখনো জীবনকে অবমুক্ত করেছেন সীমাহীন অনিশ্চয়তার প্রগাঢ় অন্ধকারে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭) বাংলা ছোটগল্পের বিস্তীর্ণ আবাদি ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছেন আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে। তাঁর গল্পে কল্লোলের মিশ্র রোম্যান্টিকতার লালিমা ফিকে হয়ে সে স্থানে অভিজ্ঞতালব্ধ আকাঁড়া বাস্তবতার নির্মম বিন্যাস অনুসৃত হয়েছে। তাঁর গল্পে আদিম নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর প্রেম ও যৌনাকর্ষণের অন্তর্গূঢ় জটিল দিকই কেবল রেখায়িত হয়নি, সেই সঙ্গে বঙ্গ-বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল-বাউড়ি-হাড়ি-ডোম প্রভৃতি প্রান্তিক শ্রেণি চরিত্রের জীবনসংগ্রামের নানামুখী দিক ক্রম উন্মোচিত হয়েছে। ছোটগল্পে তাঁর প্রেরণাস্থল রূপে কাজ করেছে দারিদ্র্যপীড়িত প্রান্তিক শ্রেণি-চরিত্রের জৌলুশহীন জীবনবেদ। কুলি মজুর তথা নিম্নবর্গের জীবন অঙ্কনে তাঁর প্রতিভা ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। তিনি বীরভূম-বর্ধমানের গ্রামীণ জীবন ও কলকাতার নিম্নবিত্ত জীবন নিয়ে বেশ কিছু শিল্পসমৃদ্ধ গল্প রচনা করেছেন। শৈলজানন্দ কল্লোলের পরিসীমার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে বাংলা ছোটগল্পে এক নবতর ভূখণ্ডের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি কল্লোল কালের জাতক, কিন্তু কল্লোলের সমগ্র বৈশিষ্ট্যের ধারক নন।

কল্লোল পরবর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) কেবল কীর্তিমান কথাকোবিদ-ই নন; সামূহিক ভাঙনের পটভূমিতে জীবনের সুস্থ ধারার বীণাবাদকও বটে। বিশ শতকের সাহিত্যের খন্ড বিশ্বাস আর ক্ষুব্ধ হতাশ্বাস চেতনার পটভূমিতে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে শব্দ ও সুরের তাজমহল। মৃত্তিকা তৃষ্ণা, নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি দুর্মর-আকর্ষণ, অধ্যাত্মবোধ, অলৌকিকতা, ভবঘুরে জীবন ও পথিক সত্তায় আত্মানুসন্ধান তাঁর গল্পের শরীরে দিয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। সত্যানুসন্ধান, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভাঙনহীন বিশ্বাস, চিরায়ত মূল্যবোধের প্রতি আদি-আকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ, বৈশ্বিক কালচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার প্রতি অন্তহীন সমর্থন তাঁর গল্পে বিশিষ্ট সূত্রে গ্রথিত। তাঁর গল্পের নর-নারীরা দৈহিক প্রেমাকর্ষণের চেয়ে শাশ্বত প্রেমের প্রতি বেশি অনুরক্ত। 'সুলোচনার কাহিনী', 'বিড়ম্বনা' গল্পগুলিতে এই অনুভূতি সুপরিব্যাপ্ত। কথাসাহিত্যে তিনি সুস্থ, সুন্দর জীবনের উপাসক। নির্জন প্রকৃতির শক্তিমান কথাকার হিসেবে বাংলা ছোটগল্পে তাঁর দীপ্র আর্বিভাব।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। কল্লোলের উত্তাল-উন্মাতাল যৌবন যখন খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে, সেই অস্তরাগের ধূসরতার মধ্যে 'অতসী মামী' (১৯২৮)র জমকালো আবির্ভাব গল্পসাহিত্যে মানিকের আগমনকে শুধু সুচিহ্নিত নয়, করেছে সুদৃঢ়। তিনি 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। 'বস্তুত 'কল্লোল'–এর সমস্ত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য যেন সংহতিবদ্ধ হল এই নতুন প্রতিভার মধ্যে। তারুণ্যের দুঃসাহসী কল্পনার সঙ্গে মিলিত হল শিল্পীর সংহতিবোধ, অনাবিষ্কৃত পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কুণ্ঠিত পদক্ষেপের বদলে দেখা দিল অস্খলিত পদচারণার বলিষ্ঠ চিহ্ন।'[১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তায় ছিল মার্কসবাদ আর চেতনায় ছিল ভাববাদ এই দ্বিমাত্রিক বৈপরীত্য তাঁর সৃষ্টির মন্দিরকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন অমার্জিত সভ্যতার পটভূমিতে এবং অন্বেষণ করেছেন এর গভীরে প্রোথিত আদিম প্রবৃত্তির নানামাত্রিক জটিলতা। 'প্রাগৈতিহাসিক' সে জটিলতার এক বিনির্মিত স্বাক্ষর। নিয়তিবাদ ও ভাববাদের দ্বৈতমিশ্রণ, নর-নারীর যৌন সম্পর্কের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ ও তার বহুমাত্রিক প্রয়োগ, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেকারত্ব ও অস্তিত্ব সংকট এবং নিম্নবিত্ত মানুষের অধিকারের প্রশ্নে মার্কসীয় চিন্তা ও চেতনার সুনিপুণ বাস্তবায়ন তাঁর গল্পের মৌলপ্রবণতা রূপে বিবেচ্য হয়েছে। আদিগন্ত স্বপ্ন আর অনিঃশেষ জীবনীশক্তি নিয়ে বাংলা ছোটগল্পে তাঁর গর্বিত অবস্থান নির্ণীত হয়েছে। আর এখানেই বাংলা গল্পসাহিত্যে মানিক কেবল স্বতন্ত্র নন, ব্যতিক্রমও বটে।

বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যময় পথ পেরিয়ে বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭৯) নান্দনিক আবির্ভাব। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বনফুল যেমন বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন; তেমনি তিনি গল্পের মাঝে নিরেট নির্ভেজাল সত্যকে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি কখনো জীবনের বাইরে আবার কখনো এর ভেতরে প্রবেশ করে মানবচরিত্রকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তরে ও বাহিরে, আচার ও আচরণে, স্খলনে ও পতনে বনফুল জীবনসঞ্চিত অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর গল্পের শরীরে সে অভিজ্ঞতার নানামাত্রিক পরিচয় অঙ্কিত হয়েছে। মানব-জীবনের জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, একাকীত্বকে তিনি তাঁর গল্পে কখনো কখনো হাস্য রসিকতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। 'মানুষের মন', অজান্তে ', 'অভিজ্ঞতা', নিমগাছ' প্রভৃতি গল্প তাঁর এই চেতনার স্বাক্ষরবাহী। বনফুল যাপিত জীবনের অভ্যস্ত পথ দিয়ে হাঁটতে পছন্দ করেননি। মানুষ যে সব অভিজ্ঞতাকে প্রত্যহ এড়িয়ে চলে, বনফুল সে অভিজ্ঞতাকেই প্রাণ দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে একদল কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে; যারা জীবন সম্পর্কে রাবীন্দ্রিক বিশুদ্ধবাদী দর্শন থেকে দূরে সরে এসে জীবনের বিন্যস্ত সৌন্দর্য কিংবা কদর্যকে দেখেছেন নির্মম, নিরাসক্ত

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিকোণ থেকে। দেড়শো বছরের বামনসদৃশ পুরাতন মধ্যবিত্তের জীবনকে এই সমস্ত কথাশিল্পী নতুন আঙ্গিকে তাদের গল্পে মেলে ধরবার প্রয়াস দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০) কেবল অন্যতম নন, অনেকের তুলনায় প্রাগসরও বটে। তিনি তাঁর গল্পে বিষয় ও প্রকরণে পূর্বতন গল্পকারদের ধারা ও প্রথাকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর জীবনবোধে আসক্তি ও অনাসক্তি সমভাবে কেন্দ্রানুগ ছিল। সুবোধ ঘোষের গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ভণ্ডামি, অস্তিত্বসংকট, পলায়নপর মনোবৃত্তি (ফসিল) বিপন্নতা, অন্তঃসারশূন্যতা, প্রসাধনে মোড়ানো ভদ্রতা, নগরকেন্দ্রিক দাম্পত্য জটিলতা ('জতুগৃহ', 'থিরবিজুরি'), সৌন্দর্যের ভিন্নতর সংজ্ঞায়ন ('সুন্দরম') যেমন প্রকাশিত; পাশাপাশি গরীব, নিম্নবিত্ত ও অচেনা আদিবাসী সমাজের বহুকৌণিক জীবনবাস্তবতার অনুপম চিত্রায়ন পরিদৃশ্যমান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যমতে: 'ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় সুবোধ ঘোষ মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ... তাঁহার সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাগূঢ় বাক্যবলী তীক্ষ্ণধার বর্ষাফলকের মত বর্ণিত বিষয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরতম রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে। স্বল্প কয়েকটি সুনির্বাচিত রেখায়, অর্থভূয়িষ্ঠ সামান্য কয়েকটি মন্তব্যে পাঠকের সম্মুখে এক বর্ণোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া ওঠে।'[১] সুবোধ ঘোষের গল্পে জীবনবোধ, ইতিহাসচেতনা ও বাস্তবচেতনার এক নবতর চেহারা উন্মোচিত হয়েছে যা কেবল ছুরির মতো ধারালো নয়; তীরের মতো তীক্ষ্ণ ।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমারের বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে অনুধ্যান করে, 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬) ও 'প্রগতির' (১৯২৭) জৈব অস্থিরতা, ফেনিল উদ্দামতা, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, উদ্ভ্রান্ত উচ্ছৃখলতা, মানসিক হতাশা-বিপর্যয় ও ভাঙন, রোম্যান্টিক স্বপ্নবিহ্বলতা ও বোহেমিয়ান জীবনচর্চায় প্রলুব্ধ না হয়ে; শৈলজানন্দের 'বঙ্গ-বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল-বাউড়ি-হাড়ি-ডোমদের নিছক বাস্তব জীবনের'[২] হাতছানিকে সামগ্রিক পরিপূর্ণতা না ভেবে বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৮–১৯৭১) আবির্ভূত হন রাঢ় বাংলার অপ্রতিম কথাকোবিদ হিসেবে। 'সময় ও সমকালের দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথে বিক্ষত, প্রবৃত্তিতাড়িত ও নিয়তিশাসিত মাটিঘেঁষা মানুষের চারুশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোলীয় নাস্তির কুণ্ডলী ছিঁড়ে রাঢ়বাংলার গ্রামীণ জীবনকে আশ্রয় করে তারাশঙ্কর নির্মাণ করেছেন মানবাত্মার শাশ্বত জয়গাঁথা, চিরায়ত মানবধর্মের মাঙ্গলিক মূর্ছনা। ... রাঢ় বাংলার রুক্ষ মাটিতে জীবনসংগ্রামরত গ্রামীণ লোকালয় শতধারায় শিল্পিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। বস্তুত, বীরভূমের পরিবর্তমান রাঢ়জীবন আর লালমাটির লোকসংস্কৃতি নিয়েই তারাশঙ্করের শিল্পভুবন। শৈলজানন্দের মতো, তারাশঙ্করও সাহিত্যের উপাদান হিসেবে নির্বাচন করেছেন আঞ্চলিক জীবন।'[৩] এ-প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের সুচিন্তিত মন্তব্য স্মরণীয়- 'শৈলজানন্দ

---

[১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪৬–৪৭

[২] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪,,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮৩

[৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা ছোটগল্প: রূপ-রূপান্তর, *একুশের প্রবন্ধ* ১৯৯৯, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৭–২৮

Dhaka University Institutional Repository

কয়লা-কুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন–পুরানো জমিদার-ঘর হইতে নদী চরের মাল-বেদে পাড়া পর্যন্ত।'[১] বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর যে কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি পাঠকের কর্ণে পৌঁছে দিয়েছেন তা ব্যাপকতার দিক থেকে কেবল সুবিস্তৃত নয়; বিশালতার দিক থেকেও গগনস্পর্শী।

বিভূতি-মানিক-বনফুলের গল্প-উপত্যকার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের আর সৌকর্যের পথ মাড়িয়ে তারাশঙ্করের যাত্রা শৈলচূড়ার শীর্ষবিন্দুর দিকে। 'তারাশঙ্করের সাহিত্যের মূল সত্তা ও আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় রাঢ়ের লোক সমাজে ও লোক-সংস্কৃতিতে। তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তির প্রসবণ এই লোক সমাজের গিরিগহ্বর থেকে উৎক্রান্ত। ... রাঢ়ের এই ঐতিহ্যের মধ্যে তারাশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং লালিত পালিত হয়েছেন। রূপে ও গুণে, প্রকৃতিতে ও প্রতিভায় তিনি এই ঐতিহ্য সমগ্রভাবে বহন করে চলেছেন। শিল্পী তারাশঙ্করের বলিষ্ঠ জীবনবোধের সঙ্গে রাঢ়ের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একটা আন্তরিক যোগসূত্র আছে। এই বলিষ্ঠতা রাঢ়ের গণদেবতার বলিষ্ঠতা, ডোম, বাগ্‌দী-বাউরী-কাহার-সাঁওতালদের রূঢ় অমার্জিত বলিষ্ঠতা।'[২] তিনি রাঢ়ের পতিত জনগোষ্ঠীর জীবনকে তাঁর লেখায় কেবল চিত্রময় করে তোলেননি; তাকে বাঙ্ময়ও করে তুলেছেন। রাঢ়ের প্রান্তিক জন-জাতির জীবনতৃষ্ণা, তাদের অস্তিত্ব সংকট, স্বপ্নবিভঙ্গতার সাতকাহন তাঁর গল্পে বাণীরূপ পেয়েছে। জীবনের সকল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, শোষণ ও বঞ্চনার যন্ত্রণাকে জীবনীশক্তিতে রূপান্তরিত করে রাঢ়ের নামহীন ব্রাত্য জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়তই বেঁচে থাকার সংগ্রামে মুখর থেকেছে। রাঢ়ভূখন্ডের শ্রেণিহীন, গোত্রহীন, বর্ণহীন নানা জাতি-উপজাতির অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষগুলির হৃদয়ের ভাব, মুখের ভাষা, আর মনের প্রজন্মলালিত স্বপ্নকে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে নবরূপ দিয়েছেন। রাঢ়ের উপেক্ষিত, বৃত্তচ্যুত প্রান্তিক জনচরিত্রের বিচিত্র মানসপ্রবণতা তাঁর গল্পে বর্ণিল রেখায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তারাশঙ্কর এক বোহেমিয়ান জীবনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এই সময় পর্বে তিনি জন্মভূমি লাভপুর তথা রাঢ় বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একজন পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরেছেন, দেখেছেন এবং বিভিন্ন শ্রেণিজীবী ও পেশাজীবীর মানুষ বিশেষত, রাঢ় বাংলার হাড়ি-বাগদি-কেওট-ডোম-বাউরি-কাহার-লোহার-জেলে-কৈবর্ত, চামার, মুচি, নমশুদ্র, বৈষ্ণব-বাউল-বেদে, পটুয়া-ঝুমুর বাজিকর প্রমুখ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এক ধরনের আত্মিক এবং হার্দিক সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করেছেন।

---

[১] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৫৫

[২] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি, (তারাশঙ্কর সংখ্যা)*, রঞ্জনকুমার দাস (সম্পাদিত), ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৬-৬০

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যে তাঁর সাহিত্যে এইসব মানুষের সংস্কার, সংস্কৃতি, চরিত্র ও মুখোচ্ছবি ভিড় করে এসেছে। সাহিত্য জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তারাশঙ্কর তার অকপট স্বীকারোক্তি করে বলেছেন: 'তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি ওদের আত্মীয় আমি।'[১] রাঢ়ের সহজ-সরল প্রান্তিক মানুষগুলিকে তারাশঙ্কর আত্মার আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অভিজাত সমাজের বিবেচনায় যারা অচ্ছুত, উচ্চবিত্তের কাছে যাদের নিজস্ব কোন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি নেই – এ রকম সহায় সম্বলহীন রাঢ়ের ভাঙাচোরা ব্রাত্য জনসমষ্টিকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে নিবিড় মমতায়, পরম আগ্রহে প্রতিস্থাপিত করেছেন এবং তাদের জীবন ও মনোবিশ্লেষণে একজন নিরেট ও নিখুঁত স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

তারাশঙ্কর জীবনের ঐশ্বর্য ও মহিমার পাশাপাশি জীবনের সশব্দ পতনও নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। আদিম সনাতনী জৈব জীবনের নানা মাত্রিকতা তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি নির্বাকভাবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি অবলোকন করেছেন নিয়তির নির্মম লীলা পরিহাসকে। ভাঙনের পথে, অবিশ্বাসের পটে, বিপর্যয় আর ব্যর্থতার নিকষ কালো আঁধারে ডুব দিয়ে তিনি অপরাজেয় ডুবুরির মতো তুলে এনেছেন মানবতার অমৃতসুধা। এখানেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তারাশঙ্করের অবস্থান সুবিদিত ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তিনি 'রাঢ়বঙ্গের সৃষ্টি আবার সেই রাঢ় বঙ্গের জীবনের রূপান্তরের দ্রষ্টা ও ভাষ্যকার।'[২] রাঢ়ের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের আত্মার নিবিড় যোগসূত্র থাকার কারণে বাংলার এই বিশেষ অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-বিন্যাস, নিসর্গ-প্রকৃতি তথা ভৌগোলিক রঙ ও রূপ এক নান্দনিক মাত্রা নিয়ে তাঁর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাঢ়ের পতনোন্মুখ সামন্ত জমিদারতন্ত্রের লালিত আভিজাত্যের সকরুণ বিপর্যয় তারাশঙ্করকে যেমন ব্যথিত করেছে; তেমনি এই ভঙ্গুরতার ভেতর থেকে বিশ শতকের পুঁজিবাদের চারাগাছের অঙ্কুরোদগম তাকে আকর্ষিত করেছে। বীরভূমের জমিদার বংশের উত্তরাধিকার তারাশঙ্করের জমিদারপ্রথা তথা সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর প্রতি ছিল দ্বিধামিশ্রিত সমর্থন। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, উচ্চশিক্ষার প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাই তাঁর মন একদিকে যেমন পুরাতন জমিদারতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে অভিজাত্যের গৌরবকে লালন করতে চেয়েছে; তেমনি অন্যদিকে আধুনিকতার সুবাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত করতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁর মানসের এই দ্বৈত প্রবণতা তাঁর গল্প রচনার ক্ষেত্রেও সক্রিয় থেকেছে। শৈশবে তারাশঙ্কর তাঁর জন্মভূমি লাভপুরে যেখানে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যৌবনে সেখানেই তিনি দেখেছেন পুঁজিবাদের আধিপত্য।

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, ১ম সংস্করণ, ১৩৬০, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩০

[২] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের লালমাটির সমাজ প্রতিবেশেও এই ভাঙনের সুর যেমন প্রকটিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে, নতুন কালের জয়ঢাক সমাজের কেন্দ্রমূলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাই 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি', গল্পে তারাশঙ্কর সামন্ত আভিজাত্যের ভগ্ন দেবালয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন নিঃশব্দ ভাঙনের মহোৎসব; অপরদিকে 'ময়দানব', 'ঘাসের ফুল', 'খাজাঞ্চিবাবু' প্রভৃতি গল্পে তিনি কয়লাকুঠি, কালিয়ারীর জীবনচিত্র অঙ্কন করে দেখিয়েছেন 'রাঢ়ের হৃদপদ্ম বীরভূমের' পুঁজিবাদতন্ত্রের প্রদীপ্ত আবির্ভাব। 'জীবনের প্রাথমিক বৃত্ত লাভপুরের গ্রাম্যসমাজে বসে তিনি সেকালের সামন্তযুগের এই অস্তাচল যাত্রা লক্ষ করেছেন। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে, অর্থাৎ পরিবার থেকে পেয়েছেন কৌলীন্য জমিদারীর আভিজাত্যবোধ, যে বোধ তার উষ্ণ উদার মানবিকতাবোধের সঙ্গে সাহিত্য জীবনে মিলিত হয়েছে। ... তারাশঙ্কর এই মগ্নমান গ্রাম্য আভিজাত্যের ভাঙা তরীর যাত্রী। একই তরীতে বহু সহযাত্রীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছে। 'সাড়ে সাত গণ্ডার' জমিদার তিনি বহু দেখেছেন তার গ্রাম্য পরিবেশে। ... সমাজের উপর তলায় ছোট-বড় জমিদারদের সঙ্গে তারাশঙ্কর এই বিশিষ্ট রাঢ়ীয় জনসমাজের জীবনধারাও গভীর আবেগে অনুশীলন করেছেন। তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য রাঢ়ের এই বিস্তীর্ণ উপেক্ষিত জনসমাজের কলরবে মুখর। এই কলরব জীবনের স্বাভাবিক তাগিদে কোথাও উচ্ছ্বাস-ফেনায়িত, কোথাও বিক্ষুব্ধ ও উদ্দাম; কোথাও বা অসংযত।'[১] রাঢ়ের প্রান্তিক জন-জাতির চলমান জীবন এবং সে জীবনের উত্তরাধিকারসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তারাশঙ্কর শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাঢ়ের ব্রাত্য সম্প্রদায়ের জীবনকে জানার এবং কাছ থেকে দেখার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। তারাশঙ্করের বর্ণময় জীবনে সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটেছে ধাপে ধাপে। আর এ কারণে রাঢ়ের প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ চিত্রণে শিল্পী তারাশঙ্করের বিশুদ্ধ কল্পনা এবং প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতার দ্বৈত সমন্বয় ঘটেছে।

জীবনকে তারাশঙ্কর দেখেছেন আসমুদ্রহিমাচলের মতো করে এবং এঁকেছেন সে জীবনের খণ্ডিত নয় পরিপূর্ণ বৃত্ত। 'মানব-প্রেম মানবিক চেতনা তাঁর রচনার প্রধান message বা বাণী। তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমি আমাদের এই দেশ; চরিত্রগুলি একান্ত ভাবেই দেশের মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের প্রীতি ভালবাসা, তাদের দ্বেষ হিংসা, তাদের সমস্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-জীবনের মধ্যে শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব, সমস্তই দেশের মাটির সঙ্গে যোগযুক্ত—তারাশঙ্করের রচনাকাল সেকাল ও একাল।'[২] বাংলা ছোটগল্পে অনাড়ম্বর আদিম অনার্য লাভপুরের কাঁকরমৃত্তিকা আর সেখানে বসবাসরত বহুজাতিক মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক প্রত্ন ইতিহাসকে জিয়ন্ত করে তাকে সাহিত্যে স্বমহিমায় ভাস্বর করেছেন মাটি ও মানুষের কারুশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানেই বাংলা ছোটগল্পে তাঁর অবস্থান একক ও অদ্বিতীয়। 'লাভপুরের পরিপার্শ্বে, রাঢের সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে পরিপুষ্ট হয়েছে তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রতিভা। ... প্রাণের টান সারাজীবন তাঁর গ্রামের প্রতি, গ্রাম্য মানুষের প্রতি, গ্রাম্য সমাজের প্রতি। এই গ্রাম্য সমাজ তাঁর সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে

---

[১] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি, (*তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯

[২] সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জীবন-সত্যের সার্থক সন্ধানী তারাশঙ্কর, *শনিবারের চিঠি, (তারাশঙ্কর সংখ্যা),* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্যসমাজ। রাঢ়ের এই গ্রাম্য সমাজে তিনি যে শুধু জন্মেছেন তা নয়, তাঁর মানসিকতার বিকাশ হয়েছে এই সামাজিক প্রতিবেশে। ... তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য প্রেরণার গঙ্গোত্রীর সন্ধান পেয়েছেন রাঢ়ের গণজীবনে ও গ্রাম্য প্রতিবেশে।'[১] গ্রামীণ সমাজ প্রতিবেশে-ই তাঁর স্বপ্ন কুঁড়ি থেকে পাপড়ি মেলেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ-প্রসঙ্গে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেছেন- 'তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়ি নি।'[২] রাঢ়ের গ্রামীণ পরিবেশে প্রপালিত প্রান্তিক মানুষের যাপিত জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি যেন তারাশঙ্করের ছোটগল্প। তাই ছোটগল্পে তারাশঙ্কর রাঢ় ভূখন্ডের একক ও অনন্য কথাকার।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭) বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) কিংবা জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) বিনির্মিত মূল্যবোধ, জীবতত্ত্বীয় জৈব আসক্তি, যৌন জীবনের বহুমাত্রিক বিকার-বিকৃতি, মধ্যবিত্তের নৈঃসঙ্গ্য, ভণ্ডামি এবং মানব চরিত্রের সামগ্রিক পতন ও স্খলনে তারাশঙ্কর ব্যাপকতর আগ্রহ দেখাননি। এজন্যে কল্লোল কুলের অনেকেই মনে করেন তারাশঙ্কর তাদের গোত্রভুক্ত হতে পারেননি। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন– 'তারাশঙ্কর যে মিশতে পারেননি (কল্লোল দলের সঙ্গে) তার কারণ আহ্বানের আন্তরিকতা নয়, তাঁরই নিজের বহির্মুখিতা। আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির সে স্থৈর্যের। উত্তাল ঊর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।'[৩] এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেছেন–'কথাগুলির মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। তবুও বিদ্রোহ কথাটি স্পষ্ট। বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি (তারাশঙ্কর) বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙ্গেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা মনে হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল। উত্তাল ঊর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্তি পাবার মতো মনের গঠন আমার ছিল না।'[৪] জীবনের চরম পরাভবেও তারাশঙ্কর আশান্বিত; সমূহ ভাঙনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও তিনি জীবনের জয়গানে মুখর।

তারাশঙ্কর সমকালীন স্রোতে ভেসে খড়কুটোকে অবলম্বন করে অন্যের প্রদর্শিত পথে হাঁটতে চাননি। 'জীবনকে ডুবতে দেননি তারাশঙ্কর জৈব রসের দীঘিতে, এখানে তাঁর প্রত্যয়-ধর্মিতার অতন্দ্র প্রহরা; একেবারে প্রথম 'রসকলি' গল্প থেকেই।'[৫] তিনি স্বতন্ত্র রেখায় ভিন্নতর আবহাওয়ায় নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মতে– 'জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার

---

[১] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি*, (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭

[২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৪, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২১

[৩] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কলোল যুগ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮০

[৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭

[৫] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১৮

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব।'[১] এখানেই তাঁর সাহিত্য সমকালীনতার ভেতর দিয়ে চিরায়ত সত্যের সাধনায় প্রোজ্জ্বল। 'তারাশঙ্করের সাহিত্যে আশ্চর্যভাবে এই সমকালীন বিকারের উপসর্গ থেকে মুক্ত এবং এতদূরে মুক্ত যে চিরকালীন শৃঙ্গার রসের সাধনাতেও তিনি সিদ্ধশিল্পী হতে পারেননি। সামাজিক বাস্তবতার সমগ্রতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন, অখণ্ড জীবনের রসোদ্‌ঘাটনে তিনি আগ্রহী, যদিও সীমানা তারও একটা আছে এবং সেটা তাঁর নিজস্ব গ্রাম্য সমাজের সীমানা ... জীবন্ত মানুষকে তিনি দেখেছেন, তাঁর গ্রাম্য সমাজের নানারকমের মানুষ, এবং প্রকৃত জীবনশিল্পীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাদের প্রাণধর্ম, দুঃখবেদনা আনন্দ অনুভব করেছেন, সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। 'রসকলি'র রাখালচূড়া-বাঁধা কমলিনী বৈষ্ণবী, 'কবি'র নিতাই বা সতীশ ডোম ও বসন ঝুমুরওয়ালী।'[২] তিনি বর্তমানকে উপেক্ষা করে নয়, বরং বর্তমানকে স্বীকরণ করে; ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী থেকে ভবিষ্যতের রাঢ় বাংলায় গণমানুষঘনিষ্ঠ জীবনবাদী শিল্পী হয়ে উঠেছেন। তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ়ের অন্ত্যজ চরিত্রের স্রোত যেন চতুর্দিক থেকে এসে একই মোহনায় মিলিত হয়েছে। তাঁর গল্পে হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরি, চণ্ডাল হতে শুরু করে বৈষ্ণব, বাউল, ডাইনি, ট্যারা, ডাক-হরকরা প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ বাংলা ছোটগল্পকে বিচিত্র ধারায় সমৃদ্ধ করেছে। তারাশঙ্কর তাঁর চিন্তায় চেতনায় রাঢ়ের এই সব প্রান্তিক মানুষগুলিকে লালন করেছেন এবং সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন এদের জীবনের নির্মম নিপীড়িত অবরুদ্ধ ইতিহাস।

তারাশঙ্কর মন ও মননে ছিলেন মাটির শিল্পী। তাঁর আত্মায় এবং সত্তায় মিশে আছে রাঢ় বাংলার মৃত্তিকার গৈরিক ঘ্রাণ। 'সত্যকার রক্তমাংসের জীবদেহে মানবধর্মের হার-জিতের দ্বন্দ্বই তারাশঙ্করের কথাসহিত্যের উপজীব্য। এখানেই তথাকথিত কল্লোলযুগের লেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্করের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই কল্লোলীয়দের যাত্রা শুরু, আর তারাশঙ্করের আদিপর্বের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে।'[৩] তারাশঙ্করের সাহিত্যে, বিশেষত, ছোটগল্পে ক্রমশ

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০

[২] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের* চিঠি, (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩

[৩] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*, ১ম খণ্ড, ৭ম মুদ্রণ, ২০০৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

লয়প্রাপ্ত আভিজাত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকা জমিদার শ্রেণির উপস্থিতি ('পুত্রেষ্টি', 'জলসাঘর', 'সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার', 'ব্যাঘ্রচর্ম') বিশেষভাবে সুচিহ্নিত; এর পাশাপাশি সহজিয়া বৈষ্ণব সুরের ভাব এবং দর্শনের দ্বৈত মিশ্রণ ('রাইকমল', মালাচন্দন 'হারানোসুর') এক অভাবনীয় মাধুর্যে তাঁর গল্পের শরীরকে অলংকৃত করেছে। তবে এ সবকে অতিক্রম করে তাঁর গল্পে রাঢ় বাংলার প্রান্তিক মানুষের বহুকৌণিক আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, লোকাচার-লোকবিশ্বাস, জৈব-জটিলতা, আদিম-অনার্য ধ্যান-ধারণা, ধর্ম ও বর্ণ সমুদ্রের মত বিশালতায় অঙ্কিত হয়েছে। জীবন পর্যবেক্ষণে তারাশঙ্কর ছিলেন ক্ষান্তিহীন। তিনি সমাজজীবনের উপরিকাঠামো হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন মানুষ ও চরিত্রকে দেখেছেন এবং মিশেছেন। জাতি-বর্ণভেদ প্রথার কারণে ব্রাহ্মণ্য সমাজবিচ্ছিন্ন গোত্রহীন যে ব্রাত্য মানুষগুলো যুগ যুগ ধরে থেকে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সমাজব্যবস্থার বাইরে; সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে তারাশঙ্কর সেইসব মানুষের ভাঙন ও বিপর্যয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। 'আমার সাহিত্য জীবনে'র দ্বিতীয় খণ্ডে তারাশঙ্কর বলেছেন- 'জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধকরি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেননি বা লেখেন না বলে।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়ের বৃত্তচ্যুত প্রান্ত মানুষের বর্ণময় সংস্কার ও সংস্কৃতি, রুক্ষ অমসৃণ জীবনের হিংসা-বিদ্বেষ, ভালোলাগা-ভালোবাসা, প্রেম-অপ্রেম, ন্যায়-অন্যায়ের কাহিনী শিল্পীর বাস্তব তুলির আঁচড়ে তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিত্র ও চরিত্রের স্বরূপ যেভাবে বিকশিত বা বিশ্লেষিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে মধ্যবিত্ত সে রকম আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়নি। কারণ তাঁর মূল দৃষ্টি যেমন ছিল সমাজের প্রান্তে বসবাসরত অন্ত্যজ জনচরিত্রের উপরে, তেমনি সৃষ্টির প্রেরণামুখ হিসেবে তিনি এইসব ব্রাত্য মানুষের কৌতূহলোদ্দীপক জীবন প্রতিবেশকেই বিশ্বস্ততার আধার রূপে মনে করেছেন। সেই সাথে উত্তরাধিকারসূত্রে লালিত সামন্তআশ্রিত ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ জমিদারশ্রেণি তাঁর গল্পে এক অম্ল-মধুর ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। তারাশঙ্করের সাহিত্য একেবারে মধ্যবিত্ত-বিবর্জিত না হলেও, তাঁর গল্পে এই শ্রেণি গভীর আবেদন নিয়ে অঙ্কিত হয়নি। তারাশঙ্করের নাড়ীর সংযোগ ছিল গ্রাম্য জনসমাজের ভিত্তিপ্রস্তরের সঙ্গে। তাই গ্রামীণ জনজাতির রূপই তাঁর গল্পে বিশেষ মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এই জন্য যে, তাঁর জন্মভূমি লাভপুর তথা রাঢ় বাংলার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ এবং সে মাটি বিধৌত সংস্কৃতির ধারক-বাহক অন্ত্যজ মানুষের অকৃত্রিম জীবন প্রবাহের প্রতিচিত্রকে তিনি সভ্যতার আলো ঝলমলে পৃথিবীর দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। যা বাংলা ছোটগল্পে তাঁকে রাঢ় বাংলার মুকুটহীন

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৫২

Dhaka University Institutional Repository

কথাকোবিদের অভিধায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু 'তারাশঙ্করের সাহিত্যে মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তি, যুগসঞ্চিত সংস্কার এবং বংশানুক্রমিক জীবিকা অবলম্বন করেই চিরকালের মানুষ। তাই তারাশঙ্কর বিশেষভাবে রাঢ়ভূমির কথাকোবিদ হয়েও বাংলার সার্বভৌম জীবন শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল সমাজের অজ্ঞাতকুলশীল অন্তেবাসী মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর অন্তরঙ্গতা। ভারতীয় মানব সমাজের আদিস্ত র যারা রচনা করেছে, পরবর্তী কালে আর্য সভ্যতার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফলে যারা সমাজ বন্ধনের বাইরে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী উচ্চমঞ্চের মানুষ যাদের দিকে মুখ তুলে তাকায়নি, তারাশঙ্কর বিশেষ করে সেই ব্রাত্য মানুষেরই কথাশিল্পী।'[১] এই ব্রাত্য মানুষগুলোর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের প্রকৃত স্বাদ ও সৌরভ।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে অজস্র মানুষের স্রোত; এদের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভিন্ন হলেও একই শীর্ষবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বলেছেন-'জীবনে যত মানুষ দেখলাম–মানুষই দেখেছি আমি, মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি, দেখলাম প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কখনো-না-কখনো এমনি এক-একটি বা এমনি কয়েকটি বিচিত্র বিকাশ হয়, যা মনে করিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় তারও মধ্যে সুন্দর বা মধুরের একটি প্রবাহ; সে শুধুই বালুচর নয়, হঠাৎ একদিন বালুচর ভেদ করে উৎসারিত হয় মধুরের নির্ঝর। প্রতিটি–প্রতিটি মানুষের মধ্যেই হয়।'[২] তারাশঙ্কর জীবনভর রাঢ়ের এই প্রান্ত মানুষের জীবনরূপকে অনুধ্যান করেছেন এবং গল্পে তাদেরকে জীবন্ত রূপে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে প্রবৃত্তির লীলাকে অস্বীকার করেননি। তাঁর গল্পে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা-বিপর্যয়, শুভ-অশুভ সবখানেই নিয়তির লীলা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই অমোঘ নিয়তিকে কোন চরিত্রই অতিক্রম করতে পারেনি। তাঁর গল্পে নিয়তির চরম পরিণতি থেকে মানুষের মুক্তি নেই। তারাশঙ্কর জীবনের অতলান্ত গভীরতায় ডুব দিয়ে নিয়তিশাসিত চিরন্তন মানব রহস্যেরই অনুসন্ধান করেছেন। বাংলা ছোটগল্পে তিনি রাঢ় বাংলার যে জনজীবনের ও প্রাকৃতিক পরিবেশ- প্রতিবেশের চিত্র উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রাতিস্বিকতার দাবি রাখে। তারাশঙ্করের ছোটগল্প অনেক বেশি বৈচিত্র্যসন্ধানী। মানবজীবনের পাপ-পুণ্য-হিংসা, প্রেম, আশা, নিরাশা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অভাব, অভিযোগ, মৃত্যু, আত্মহত্যা, খুন, নৃশংসতা, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি বহু বিচিত্র প্রবৃত্তির সন্ধান মেলে তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যে।'[৩] তারাশঙ্কর মানুষের জীবনকে বর্জন করে নয় বরং সে জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাকেই তাঁর সাহিত্যের ভাণ্ডারে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

---

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬১

[২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩

[৩] সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, *তারাশঙ্কর: জীবন ও সাহিত্য*, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯১, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪১

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের মানস প্রবণতা নিরন্তর উৎকণ্ঠিত থেকেছে রাঢ় সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্নে। তাঁর লালিত বিশ্বাসগুলো আবর্তিত হয়েছে এইসব সরলপ্রাণ মানুষকে ঘিরে। তারাশঙ্কর রাঢ়ের পথে-প্রান্তরে ঘুরেছেন; জন্মভূমি লাভপুরের মাটির রসে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন; অন্ত র্ভেদী দৃষ্টিতে সন্ধান করেছেন রাঢ়ের মাটির কোষে লুকিয়ে থাকা প্রাণপ্রবাহকে। তাঁর ভেতরকার ন্যায়-অন্যায় বোধও তৈরি করে দিয়েছিল লাভপুরের মৃত্তিকা। তিনি বলেছেন -'মাটির ভূমির যেমন তৃপ্তি আপন বক্ষের শস্যে, অন্নে, জলে, বাতাসের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মানুষকে পুষ্ট করার , তেমনি আরও একটি গভীরতর তৃপ্তি এই মাটির আছে, সেটি ওই মাটির বুকের সমাজের সংস্কার সংস্কৃতি থেকে সন্তানের মনটিকে পুষ্ট করার। লাভপুরে আমার জীবন কেটেছিল, এক নাগাড়ে বিয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত। এখানেই এ মনটি পেয়েছিলাম। আমার মনের সৎ অসৎবিচারের যে ধারাটি তার দিক নির্ণয় করে দিয়েছে এই লাভপুরের মৃত্তিকা, লাভপুরের সমাজ।'[১] লাভপুরের জীবন ও প্রকৃতি তারাশঙ্করকে রাঢ়ের মাটি ও মানুষের শিল্প হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। সাহিত্যিক তারাশঙ্করের প্রাণ-ভ্রমরা লাভপুরের মাটিতে প্রোথিত। তাঁর জীবনে লাভপুর যেন স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার সেতুবন্ধন রচনা করেছে।

তারাশঙ্করের সাধনা ছিল শিল্পের সাধনা। তিনি রাঢ়কেই করেছেন তাঁর সাহিত্যের উৎসমুখ। এ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্র-র মূল্যায়ন: 'তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতায় দেশের মাটি মানুষ ও আকাশ সমানভাবে ধরা পড়েছে সারা জীবন ধরে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেও তাঁর ক্লান্তি নেই ... চণ্ডীদাসের পর বাংলা সাহিত্যে রাঢ়ের এত বড় নাগরিক দেখা দেননি। রাঢ়-ই তাঁর পৃথিবী, বসুন্ধরা।'[২] তারাশঙ্করের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে,স্বপ্নে ও বাস্তবে রাঢ় বাংলার ধুলি- বালি-কাঁকর যেমন মিশে আছে; তেমনি তিনি এ অঞ্চলের বিমিশ্র সাংস্কৃতিক স্রোতে অবগাহন করে সেখান থেকে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের নিখাদ জীবনচিত্র তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

বাংলা ছোটগল্পের পথ পরিক্রমায় তারাশঙ্কর কেবল অনন্য নয়, ব্যতিক্রমী এই জন্য যে, তিনি একক প্রচেষ্টায় অখণ্ড রাঢ় বাংলার অনাবিষ্কৃত জনসমষ্টির স্বতন্ত্র জীবনপ্রবাহকে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টিসীমায় জীবন্ত করে তুলেছেন। তিনি অকপটে এ সত্য স্বীকার করে বলেছেন:

'আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভিতর থেকেই আমার যা-কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি। তার বেশি আমার আর কিছু নেই।'[৩]

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কথা, *শনিবারের চিঠি*, (তারাশঙ্কর সংখ্যা), কলকাতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০

[২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: উপন্যাস ও উপকথায় অকৃত্রিম, *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*, সম্পাদক অরুণ সান্যাল, প্র.প্র. ১৯৯১, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৯৫-৯৬

[৩] জরাসন্ধ, তারাশঙ্কর ও রাঢ়দেশ, *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ*, সম্পাদক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, তারাশঙ্কর স্মারক সমিতি পরিবেশক, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোট গল্পে দ্বিতীয় রহিত এ কারণে যে, তিনি রাঢ় বাংলার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর , নন্দিত কথাশিল্পী। তারাশঙ্কর জীবনের শেকড় সন্ধানী কথা সাহিত্যিক; পাপ- পুণ্য, ন্যায়- অন্যায় বোধের উর্ধ্বে সাহিত্যে তিনি মানুষের মানবিক গুণাবলির স্ফুরণ আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

তারাশঙ্কর ছিলেন সত্যের সাধক। সত্যের সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। সত্যানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তিনি সকল ভয়কে, জড়তাকে অতিক্রম করেছেন। এ কারণে তিনি জীবনে ও সাহিত্যে ছিলেন বিশুদ্ধবাদী চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক। তারাশঙ্কর মূলত স্বভাবশিল্পী, প্রকৃতির মতো সহজাত তাঁর প্রতিভা। বাংলা ছোটগল্পে তিনি সোনালি সময়ের জাতক। কালের সন্তান তারাশঙ্কর তাই সাহিত্যের সাধনায় হয়েছেন কালোত্তীর্ণ। বাংলা ছোটগল্পে তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি রাঢ়ের ব্রাত্য জনপদের পূর্ণাঙ্গ জীবন-ইতিহাস লেখনীর মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। এখানেই বাংলা ছোটগল্পে তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র এবং অনন্য।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি তাঁর সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় কীর্তি। রাঢ়ের বিশুষ্ক, রুক্ষ মৃত্তিকার প্রকোষ্ঠে তাঁর গল্পের বীজ গ্রীষ্মের লু হাওয়ায় আর বর্ষার প্রার্থিত বারিধারায় অঙ্কুরিত হয়েছে, এবং প্রতিকূল পরিবেশে তা বর্ধিত হয়ে ফুলে ও ফসলে সুশোভিত হয়েছে। 'তাঁর গল্প নির্বস্তুক নয়,–বস্তুবহুল; কিন্তু বস্তু-নিমগ্ন নয়,– স্বপ্ননীল! –বস্তুকে অতিক্রম করেও সেই স্বপ্নের জগতে পৌঁছুবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েই যেন লেখনী ধরেন তিনি।'[১] বাংলা ছোটগল্পে এখানেই তাঁর পারঙ্গমতা প্রমাণিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি রাঢ় বাংলার সামগ্রিক ঐতিহ্যের ঘোষক। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রতিটি স্তরে রাঢ় বাংলার প্রান্ত -জনচরিত্রকেই আরাধ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তারাশঙ্করের সকল খ্যাতি, যশ, সম্মান এই মাটিকে ভালবেসে। তাঁর ছোটগল্প এ মাটির মানুষেরই প্রতিলিপি।

[১] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ

ক. জীবন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের বিশাল পরিসরে বিচিত্রমাত্রিক ধারায় প্রান্তিক জনজাতির যাপিত জীবনের চালচিত্র অঙ্কনে অসামান্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। সমাজের প্রান্তসীমায় বসবাসরত এসব মানুষ সভ্যতার আলো ঝলমল পট-পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এমনকি নাগরিক শিক্ষিত জনশ্রেণির দৃষ্টিতে এদের অবস্থান তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদের দৃষ্টিতে এরা কখনো হরিজন, কখনো ব্রাত্য, কখনো অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য, আবার কখনো বা নিম্নবর্গভুক্ত। যে-নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, এরা যে আবহমান ভারতবর্ষের জীবনপরিসরে সামাজিক সুবিধাভোগ থেকে বঞ্চিত তা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য।

ভারতীয় উপমহাদেশে গত শতাব্দীর আশির দশকে প্রান্তিক জনশ্রেণির ইংরেজি প্রতিরূপ 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। মার্কসবাদী লেখক গ্রামশি তাঁর 'কারাগারের নোটবই' (Prison Notebooks) গ্রন্থে প্রথম 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'গ্রামশি তাঁর এই গ্রন্থে ইতালীয় 'সুবলতেনো' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'সাব-অলটার্ন' কথাটি উল্লেখ করেন।'[১] ইংরেজি ভাষায় এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হিসেবে 'ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মকর্তা' কে বোঝানো হয়। তবে 'সাব-অলটার্ন' শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে Subordinate শব্দটিকে গ্রহণ করা যায়। 'গ্রামশি 'সব-অলটার্ন' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা হয়ে উঠেছে তখন সরাসরি 'প্রোলেতারিতে'–এরই প্রতিশব্দ। এই প্রোলেতারিয়েত গোষ্ঠীর সঙ্গে তার উচ্চবর্গ 'বুজোয়াজী'র যে সম্পর্ক- তা কিন্তু কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যেরই নয়, তার চেয়ে আরও বেশি কিছু। এই আধিপত্যই হল 'হেগেমোনি' বা হেজেমোনি' এটি এক ধরনের সার্বিক সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব, যা সামাজিক–অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করে তোলে।'[২] ফলে দেখা যায় যারা 'সাব-অলটার্ন' শ্রেণিভুক্ত, তারা সমাজের

---

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, ১ম প্রকাশ, ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-০৩

[২] সেমন্তী ঘোষ, সাব-অলটার্ন, *ধ্রুবপদ (বুদ্ধিজীবীর নোটবই)*, সম্পাদক, সুধীর চক্রবর্তী, বার্ষিক সংকলন-৪, ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৬০

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশ্রেণি দ্বারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে শোষিত ও আধিপত্যের শিকার হয়ে থাকে। এই কর্তৃত্বকে স্থানভেদে 'ডমিন্যান্স' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ভারতীয় ইতিহাসে 'সাব-অলটার্ন' তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন রণজিৎ গুহ। তিনি 'নিম্নবর্গ' শব্দটিকে ইংরেজি subaltern শব্দের প্রতিশব্দরূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন। 'সাব-অলটার্ন' বা নিম্নবর্গের ধারণাটি একটি পরিপূর্ণ ধারণা নয়, এর সঙ্গে উচ্চবর্গের ধারণার একটা সম্পৃক্ততা রয়েছে। ক্ষমতা, আধিপত্য, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের উপর নির্ভর করে 'সাব-অলটার্ন' ধারণাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আর এ কারণেই 'পদমর্যাদার ক্রমোচ্চবিন্যাসে পার্থক্যের স্তর পরম্পরায় সমাজের একেবারে পাদদেশে অবস্থান করেও প্রত্যেক নিম্নবর্গ তার চেয়ে নিচুস্তরের যে কারো তুলনায় উচ্চবর্গ।'[১] তাই সমাজে যারা 'নিম্নবর্গ' বলে বিবেচিত তারা সবসময়ই 'নিম্নবর্গ' বলে পরিচিত নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে ডেভিড আর্নল্ড মতামত প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন-'এলিট শ্রেণির জমিদারের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে ধনী কৃষক নিম্নবর্গ আবার আধিপত্যের দিক থেকে এই ধনী কৃষক গ্রামীণ দরিদ্র ভূমিহীন মজুর, কারিগর ও অন্ত্যজ শ্রেণির তুলনায় উচ্চবর্গ।'[২] উন্নত বা সমৃদ্ধ সমাজের প্রান্তভাগে বসবাসরত ধনিক শ্রেণি থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনসমষ্টিকে প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের প্রান্তে এসব জনগোষ্ঠী বসবাস করে বলে এদেরকে প্রান্তিক জনপদ বলা হয় এবং এরা যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত সে সমাজকে প্রান্তিক সমাজ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রান্তিক সমাজে বসবাসরত এবং সেই সমাজের অন্তস্থ আচার- আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস, লোকাচার ও লোকরীতি, টোটেম, পূজা-পার্বণ-ব্রত দ্বারা প্রপালিত এবং সমাজকর্তৃক শাসিত নিগৃহীত ও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক চরিত্র বা 'subaltern character' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্তে বা গ্রামের শেষ সীমানায় বাস করে থাকেন তাকে অন্তেবাসী বলা হয়। আভিধানিক

---

[১] C.A. Bayly, *Ralling Around the subaltern*, The Journal of Peasant Studies, Vol.16, No-1, 1988, P.119.

[২] David Arnold, *Gramsci and Peasant Subalternity in India*, The Journal of peasant Studies, Vol.11, No-4, 1984, P.164.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে যে ব্যক্তি চণ্ডাল অথবা নিচু জাতের মানুষ সমাজতাত্ত্বিকদের পরিভাষায় বলা যায় 'প্রান্তিক' মানুষ।'[১] সমাজ ও সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে আধিপত্য বিস্তারের একটা প্রবণতা গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। ক্ষমতা ধন-সম্পত্তি, অর্থ কিংবা নারী অধিকারকে কেন্দ্র করে চলেছে এই হীন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। অস্তিত্বরক্ষা ও শক্তি প্রদর্শনের এই লড়াই-এ যারা উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী, অর্থ-বিত্তের দিক থেকে সমৃদ্ধ ও আর্যসংস্কৃতির প্রবহমান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তারাই সমাজে নিজেদেরকে উচ্চবর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছে। এদের (উচ্চবর্ণের) অধস্তন এবং সমাজের কেন্দ্রীয় আর্থ-উৎপাদন কাঠামো থেকে উন্মূলিত, মৌলিক অধিকারবঞ্চিত জনসমষ্টি-ই হলো প্রান্তিক শ্রেণি বা মানুষ। এরা সভ্য সমাজের মূল স্রোতধারা থেকে বিভাজ্য; সমাজের উপান্তে বসবাসরত দলিত অনার্য, ব্রাত্য বা অন্ত্যজ শ্রেণিরূপে সর্বাধিক পরিচিত। 'যারা শ্রেণী, বর্ণ, বয়স, পেশা কিংবা অন্য যে-কোন বিচারেই সমাজে মর্যাদাহীন তারাই আমাদের উদ্দিষ্ট নিম্নবর্গ।'[২] এই দলিত বা অন্ত্যজ মানুষগুলির নিজস্ব কোন পরিচিতি নেই। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্যোগ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের ভয়াল শিকার এই ব্রাত্য জনজাতি সর্বদাই অস্তিত্ব সংকটে বিপন্ন এবং সন্ত্রস্ত।

সভ্যতাবিমুখ কিন্তু ঐতিহ্যসচেতন, মৃত্তিকাসম্পৃক্ত প্রান্তিক মানুষ গুলি 'এখন 'ওবিসি' (Other back word classes/ OBC) বা অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে স্বীকৃত।'[৩] সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের জটিল আবর্তে এদের অবস্থান যেমন নিম্নতর পর্যায়ে, তেমনি মর্যাদা ও পেশাগত দিক বিবেচনায়ও এরা কেবল উপেক্ষিত নয়, অনুগৃহীত। 'চতুর্বর্ণের বাইরে ও উচ্চবর্ণের স্পর্শের অযোগ্য ও সমাজে 'জলঅচল ' জাতি হিসেবে পরিচিত এসব নিম্নবর্গ সমাজব্যবস্থায় অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত, এবং অস্পৃশ্য বলেই সমাজে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত শ্রেণি। উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে এরা শাস্ত্রাচারহীন।'[৪] জাতি- বর্ণ ভেদ প্রথার ক্রমানুপাতিক ধারার বাইরে রক্ষণশীল সমাজকর্তৃক চিহ্নিত ; অস্পর্শজনিত দূরবর্তী সীমান্তে অবস্থানরত এই সমস্ত জনচরিত্র যদিও উচ্চবর্ণের বহুমাত্রিক ব্রাত্য কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। তথাপি 'তীক্ষ্ণ ও উন্নতনাসার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নমশূদ্রের কাছে এদের গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করার অধিকার নেই। ... কারণ ডোম, হাড়ি, বাগদি, বাউরি, চামার, মুচি, নমশূদ্র, সাঁওতাল বেদে প্রভৃতি জনগোষ্ঠী হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে চারটি বর্ণের বাইরের মানুষ,

---

[১] ত্রিলোচন জানা, *তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রান্তিক সমাজ*, ২০০৫, পুস্তক বিপণি,কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯১

[২] মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, প্রথম মুদ্রণ, শাখি অফসেট প্রেস, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬

[৩] চিত্ত মণ্ডল ও প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পা), *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, ২০০৩, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪

[৪] সোহরাব হোসেন, আচার সংস্কারহীন মানুষ ব্রাত্য, *বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন*, ২০০৪, করুণা প্রকাশনী,কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩

Dhaka University Institutional Repository

আর আচার অনুযায়ী পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ অতিশূদ্র হিসেবে পরিগণিত।'[১] এরাই সামজিক গোত্র ও শ্রেণি বিভাজনে প্রান্তিক নরগোষ্ঠী বলে বিবেচিত।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে এই প্রান্তিক জনচরিত্র নক্সীকাঁথার মতো বিচিত্র বর্ণে, ঐশ্বর্যে ও আবহমান কালের নান্দনিকতায় সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তার জন্মভূমি লাভপুর তথা সমগ্র বীরভূমে এই জনসমষ্টির পদচারণা ছিল চোখে পড়ার মতো। '১৯৩১ সালের সেন্সাসে বীরভূমে এই জন গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১৪৩৫২২ জন।'[২] রাঢ় অঞ্চলের জীবনধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে ব্যাপক ও কার্যকর ভূমিকা। এখানকার জীবন ও সংস্কৃতির 'উত্তরাধিকার বহন করছে রাঢ়ের উপেক্ষিত জনসমাজ–হাড়ি, বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি উপজাতি। এই কয়েকটি উপজাতির মোট জনসংখ্যা যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আছে, তার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আছে রাঢ়ের তিনটি জেলা বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়ায়। বাংলাদেশে মোট প্রায় আট নয় লক্ষ সাঁওতালের বাস, তার মধ্যে রাঢ়ের এই তিনটি জেলায় ও মেদিনীপুরে বাস করে শতকরা ৭৫ জন। বীরভূম বাঁকুড়ায় যে অঞ্চলেই যাওয়া যাক, সেখানেই দেখা যায় জনসমাজের এই বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এদিককার যে গ্রাম্য সমাজ তার চেহারাই আলাদা। হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের যথারীতি বাস আছে, মুসলমানরা তার পাশাপাশি আছে, আর আছে হাড়ি, বাগদি, বাউরি, ডোম ও সাঁওতালরা। সংখ্যায় তারাই অধিকাংশ স্থানে বেশি। লাভপুর ছোটগ্রাম, তার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। হাড়ি, বাগদি, কেওট ডোম বাউরিদের বাস লাভপুরে বেশি।'[৩] তারাশঙ্করের ছোটগল্পে এইসব অন্ত্যজ জনচরিত্রের জীবনাচার কেবল ফটোগ্রাফির মতো উঠেই আসেনি; সেই সাথে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল- চলন, আচার- ব্যবহার, রীতি-নীতি, কথাবার্তা, খাদ্যাভাস, দৈনন্দিন জীবিকা, তন্ত্র-মন্ত্র, যাদু-টোনা, তুকতাক, প্রেম-ভালবাসা বিমিশ্র মাদকতায় সুবিন্যস্ত হয়েছে।

তারাশঙ্করের গল্পের ক্যানভাসে প্রান্তিক চরিত্রের জীবনপ্যাটার্ন তাদের শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের সমতলে অন্বিত হয়েছে। তাঁর 'ডাক-হরকরা', 'চোরের মা', 'চোর', 'বোবাকান্না', 'ভুলের ছলনা', 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' প্রভৃতি গল্পে ডোমদের জীবনের চালচিত্র স্বতন্ত্র রূপ ও রেখায় প্রতিঅঙ্কিত হয়েছে। 'ডাক-হরকরা'

---

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৯

[২] *Census of India*, 1931, Vol-V, Bengal and Sikkim Calcutta, 1933, P-501.

[৩] বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি*, (তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদক, রঞ্জনকুমার দাস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬১

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের দীনু ডোম সরকারি কর্মচারী। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে সে ডাক নিয়ে ছুটে চলে। এ কাজে তার কোন ক্লান্তি বা বিরাম নেই। দীনু জাতিতে ডোম। সমাজের প্রান্তস্থিত এই অন্ত্যজ চরিত্রটি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব জীবন বিপন্ন করেও পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুত্র নিতাই ডোম দীনুর কাছ থেকে ডাক চুরি করার সময় তাকে আঘাত করলেও সে পুলিশের কাছে নিতাইয়ের পরিচয় গোপন রাখেনি। লেখকের বর্ণনায় দীনু ডোমের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র এ রকম :

বেঁটে কালো, আধা বয়সী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেল ব্যাগ ঝুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছেঁড়া একটি মাথালি, এক হাতে একটি বল্লম; ওই বল্লমটারই ফলার সঙ্গে ঝুলানো ঘণ্টা ঝুন ঝুন শব্দে বাজিতেছে। ... দীনু ডোম ডাক-হরকরা-মেল রানার, সাত মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে হরিপুর পোস্ট আপিসে।(১/৫৭৮)

রাঢ় ভূমিতে বসবাসরত এই প্রান্তিক শ্রেণি উত্তরাধিকারসূত্রে চুরি- ডাকাতি ইত্যাদি ভয়ঙ্কর পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের জীবনকে আবৃত করে রয়েছে তাদেরই পূর্বসূরির প্রত্ন ইতিহাস। তারাশঙ্কর তাঁর ডোম সংক্রান্ত বেশির ভাগ গল্পে শশী ডোম ও তার দুর্ধর্ষ জীবনের লোমহর্ষক বর্ণনা রেখাঙ্কিত করেছেন। 'চোরের মা' গল্পে শশী ডোম অবশ্য পার্শ্ব চরিত্র। তার মৃত মেজদাদার এক মাত্র সন্তান 'ফিঙে'-ই গল্পের নায়ক। শশী 'ফিঙে' কে তার সকল শিক্ষাদীক্ষা ও কৌশল শিখিয়ে জাত ধান চোরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। ডোমের মেয়ে হলেও ফিঙের মা স্বামীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণ করেনি। যদিও এটি ডোম সমাজে প্রচলিত একটি রীতি। লেখক এদের জীবনের তমসাচ্ছন্ন অধ্যায় তুলে ধরেছেন 'চোর' গল্পে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী ডোম। এরা রাতে ধান চুরি করে। শশী ডোম এদের সর্দার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এই গল্পে প্রান্তিক ডোম চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন। ডোমদের জীবন চিত্রায়ণে তিনি লিখেছেন-

এই গ্রামে চোর আছে—পাকাচোর, বংশানুক্রমিক চোরের বংশ। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের রক্তে চৌর্যব্যাধির বীজাণু কিলবিল করিতেছে। সরকারি জেলখানার দেয়ালে পেরেক খোদাই দাগে—বাগানে রোপিত গাছের মধ্যে এ গ্রামের ডোম বংশের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ও গৌরবে জড়ানো আছে। কিন্তু বনিয়াদি বংশের মত তাহাদের ধারা-ধরন তিন পুরুষ ধরিয়া একই চালে চলিয়াছে। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহারা ধান-চোর। ধান চুরি করিতে আসিয়া হাতের কাছে অধিকতর মূল্যের জিনিস পড়িয়া থাকিতেও তাহারা তাহাতে হাত দেয় নাই। এ গ্রামের লোক আজ তিন পুরুষ ধরিয়া ধানের গোলাতেই মোটা এবং শক্ত তালা দিয়াছে, কিন্তু সিন্ধুকের ভাবনা কোন দিন ভাবে নাই। তা ছাড়াও, ডোম বংশের কীর্তি অব্যাহত রাখিতে পুলিশ এক শশী ছাড়া আর কাহাকেও বাহিরে রাখে নাই। বি-এল কেসে আঠারো বছর হইতে পঞ্চাশ পর্যন্ত সকল ডোমের-ই দীর্ঘ কারা বাসের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা হইয়া গেছে। ... এক আছে শশী- শশী অবশ্য এক কালের সিংহ- আফ্রিকার চতুর নরখাদক সিংহ কিন্তু এখন সে স্থবির, বাতে প্রায় পঙ্গু। (২/৩০৩)

চুরি, বিশেষ করে ধান চুরিকে ডোমরা জীবনের প্রতিটি স্তরে আরাধ্য বিষয় বলে জেনেছে। গল্পের নায়ক শশী ডোম অন্ধকারে বাতাসের গতিতে ছুটে চলে। দেড় মণ ধানের বস্তা নিয়ে সে ছুটে চলে বিদ্যুৎ গতিতে। পুলিশ তাকে ধরতে গলদঘর্ম হয়ে যায়। গল্পকার শশী ডোমের জীবন ও পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনায় লিখেছেন-

রোগের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত শশী নিজেই ছিল ডোম দলের সিংহ। তখন তাহার বাড়িতে চাল-চলন প্রায় সামন্ততান্ত্রিক আমলের ছোটখাট বর্বর সামন্তপতির মত! স্ত্রী ছাড়া সেবা করিবার জন্য আরো দুইটি স্ত্রীলোক শশীর ছিল। শশী পাকি মদ ছাড়া খাইত না। ছাগল ভেড়ার পাইকার ইছু সেখের আনাগোনার বিরাম ছিলনা। সপ্তাহে দুই তিনটি বৃহদাকার খাসী সে শশীর বাড়িতে বাঁধিয়া দিয়া যাইত। নবীন স্বর্ণকার রূপার চুড়ি, সোনার নাকছাবী, কানের টপ তৈয়ারী করিয়াই দিন চালাইত। ডোম কন্যারা আজ কিনিয়া দশদিন পর আধা দামে বন্ধক দিত অথবা বিক্রয় করিত। আবার বিশ দিন পর নতুন কিনিত।(২/৩০৬)

ডোমরা অনেক সময় বাঁশ দিয়ে ধুনুচি, ডালা, কুলা তৈরি করে। কিন্তু চৌর্যবৃত্তি তাদের প্রধান পেশা। 'গোষ্ঠীগতভাবে সম্প্রদায়গতভাবে চুরি তাদের অভ্যস্ত বৃত্তি হয়ে উঠে। ... ডোমেরা, লোধারা এবং আরো কতগুলি সম্প্রদায় বংশানুক্রমিক স্বভাব–চৌর্যে রত হয়ে পড়েছিল বৃটিশ আমলে। তারাশঙ্কর তাদের গোষ্ঠী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতটি জীবন্ত করে তুলেছেন।'[১] 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্পটিতে ফটিক ডোমের জীবন-প্রবাহের বর্ণনা গল্পকার অনায়াস ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন–

ফটিকের বাবা চোরা-চাঁদ ডোমকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হয় না, চাঁদ এ অঞ্চলের ধান চোরদের রাজা চোর ছিল। সে অনেকবার জেলে খেটেছে কিন্তু হাতে- নাতে ধরা পড়ে কখনও খাটেনি। কেস সাজিয়ে জেল দিতে হয়েছে। বি- এল কেস, অর্থাৎ ব্যাড লাইভলিহুড কেস করে জেল বন্ধ করতে হয়েছে। তবুও চাঁদ ডোম কখনও দমিত হয়নি, জীবনের শেষকাল প্রায় সত্তর বছর অবধি এই কাজ করে গেছে। চাঁদেরা ছিল চার ভাই–চার ভাই-ই এই কাজ করেছে। তাদের বাবা ছিল ব্যালো ডোম– সে করত ধান চুরি। সেও জেল খেটেছে। চাঁদের ছেলে ফটিক; ছোট ছেলে সে। ফটিকের দাদা তাদের মধ্যে বড় জন, বাপের কাছে হাতেখড়ি নিয়েছিল ধান চুরিতে। তারপর বিএল কেসে একবার জেল খেটে ফিরে এসে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে–ডাকাতি কেসেও আসামী হয়েছে, জেল খেটেছে। ছোট ফটিক। সে বাপের সঙ্গে বার দুই জেল খেটে বেরিয়ে একরকম নিরুদ্দেশ হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে ফিটফাট সাজ-পোশাক করে দেশে আসতো; দিন পাঁচ-সাত থেকে চলে যেত, বলত শহরে

[১] সফিকুন্নবী সামাদী, *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: জীবনের শিল্পিত সত্য*, ২০০৪, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরী করি। বাপের মৃত্যুর পর আর বেশ কয়েক বছর আসেনি। হঠাৎ মাস কয়েক এই বউ আর দুটো ছেলে নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। ফেরার পর ছোটখাটো চুরি ছাড়া-নৃপতির দোকানের চুরি নিয়ে বেশ দুটো বড় চুরি হয়ে গেল। আগেরটার কোন কিনারাই হয়নি কিন্তু এবারটায় পুলিশ এসে ধরলে ফটিক কে। (৩/৪৮৬)

প্রান্তিক ডোম সম্প্রদায়ের শ্রেণিচরিত্র-চিত্রণে গল্পকার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই রাঢ়ের ডোম শ্রেণি সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করত। রাঢ় সমাজে এরা সর্বদা স্বতন্ত্র এক জাতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে এই অন্ত্যজ ডোম শ্রেণির অকথিত জীবনের অতীত অথচ জীবন্ত ইতিহাসকে বাঙময় করে তুলেছেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক বাগদি শ্রেণির জীবনচিত্র দীপ্তোজ্বল হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের বিভিন্ন রচনায় বাগদি শ্রেণির প্রসঙ্গ এসেছে। বাহুবল ও শক্তিমত্তার দিক থেকে তারা রাঢ় সমাজে ঠ্যাঙাড়ে জাতিরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। এরা অনেক সময় লাঠিয়ালরূপে জমিদার, ভূস্বামীদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করত। 'বাগদিরা দৈহিক দিক থেকে শক্তিশালী জাতি। বীরভূমের প্রাচীনতম অধিবাসী। বর্তমানে অনেকটা হিন্দু হলেও তাদের জীবনচর্চায় অনার্য সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট। এরা সাধারণত চাষবাস করে, নৌকা চালায়, মাছ ধরে। এদের মধ্যেও শ্রেণিবিভাগ আছে। সবচেয়ে উঁচু যারা তাদের বলে তেঁতুলিয়া। পুরোনো দিনে বাগদিরা ওস্তাদ লাঠিয়াল হত। ভূস্বামীদের প্রধান বাহুবল ছিল এরাই। চুরি এবং ডাকাতিকে এরা জীবিকা হিসেবেই বেছে নিত এবং তাই ছিল তাদের সম্মানজনক জীবিকা। বাগদির ছেলে ডাকাতি করতে না পারলে সমাজে নিন্দনীয় হত।'[১] বাগদিরা দুঃসাহসিক জাতি। তারাশঙ্কর তাঁর 'আখড়াইয়ের দীঘি, 'রায়বাড়ি, 'সমুদ্র-মন্থন', 'চৌকিদার', 'তমসা', 'স্বাধীনতা', 'গোপালবাঁধের ইতিকথা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে বাগদি জনসম্প্রদায়ের বিপুলায়তন জীবনের কথাচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে হিংস্র কালী বাগদির জীবনলীলা বর্ণিত হয়েছে। কালী বাগদি তার বর্বর জীবনের কথা নিজের মুখে বর্ণনা করেছে :

হুজুর আমরা জাতে বাগদী, আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। ... হুজুর, চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতোই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত। ... রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাটিতে ওঁত পেতে বসে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভেতরে আগুন ছুটত। ... অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত ফাবড়া—শক্ত বাঁশের দুহাত লম্বা লাঠি; সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মতো গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* ১ম খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭

Dhaka University Institutional Repository

হত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম। আর পা দুটো ধরে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙে যেত। (১/২৯২)

জীবনের রূঢ়, অনমনীয়, বিশুষ্কতার নির্মম প্রকাশ লক্ষ করা যায় এ গল্পে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধের মতই যেভাবে ঘাড় ভেঙে সে (কালী বাগদি) বহু মানুষকে হত্যা করেছে, তেমনি করে দীঘির খাদের ভিতর পড়ে ঘাড় ভেঙে হল তার মৃত্যু। তারাশঙ্করের এ গল্পে জীবনের যে হিংস্র ভয়ংকর রূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাকেই অবলম্বন করে কর্ম ও কর্মফলের যে নিষ্ঠুর লীলা রহস্য উদঘাটিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পূর্বে তার কোনোই পরিচয় ছিল না। জীবনের আদিম হিংস্রতায় তলিয়ে গিয়ে জীবনের এ এক নতুন রসাস্বাদন। ... প্রবৃত্তি বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে একেবারে রক্তের মধ্যে মিশে গেলে তা যে কত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তার প্রমাণ 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি।'[১] 'রায়বাড়ি' গল্পে রায়বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায়ের জমিদারির ক্ষয়িষ্ণু জৌলুশের চিত্র উঠে আসার পাশাপাশি তার একান্ত অনুগত ভৃত্য কালী বাগদির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। জমিদারি পরিচালনার জন্য এ রকম লাঠিয়াল জোয়ানকে হাতে রাখত সেকালের জমিদাররা। হুদ্দা-শ্যামপুরের প্রজাবিদ্রোহ দমন করার জন্য রাবণেশ্বর রায় কালী বাগদিকে পাঠায়। প্রজাদের সমস্ত ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয় কালী বাগদি। গল্পকার এই বাগদি চরিত্রের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন—

কালী বাগদীর পদশব্দ নাকি বিড়াল কি বাঘের মত শোনা যায় না। (১/৫৯৫)

গল্পটিতে প্রভু বা মনিবের প্রতি এই প্রান্তিক বাগদি চরিত্রের আনুগত্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সাথে কালী বাগদির জীবনবৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে।

বাগদিরা নির্বিঘ্নে রাত-বিরাতে চলাফেরা করতে ভয় পায় না। তারা অন্ধকার রাতে লাঠি হাতে বের হয়ে পড়ে। খুন ডাকাতি চুরি তাদের রক্তের ধারায় মিশে একাকার হয়ে গেছে। বংশানুক্রমিকভাবে তারা এই ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে। 'চৌকিদার' গল্পে এই প্রান্তিক বাগদি চরিত্রের এক নবতর সংস্করণ লক্ষ করা যায়। এ গল্পে বানোয়ারী বাগদী চৌকিদার। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তাকে চৌকিদারের চাকরি দেয়। রাতে দুবার রোঁদ বা পাহারা দেওয়া তার কাজ। এ গল্পে বাগদির ছেলে বনোয়ারী বাগদি খুন ডাকাতির

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, ভারবি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পটিতে মজিদপুর গ্রামে জমিদার হেমাঙ্গবাবু জমিদারি দেখাশোনার কাজে এলে তার সাথে পরিচয় ঘটে রতন হাড়ির। রতন হাড়ি নিজেকে মজিদপুর চকলার একজন বড় লাঠিয়াল বলে পরিচয় দেয়। গল্পকার রতন হাড়ির বর্ণনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন :

ছয় ফুট সাড়ে-ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান, তেমনি পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো করমচার মত রাঙ্গা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকান্ড একটা কাটা দাগ। (১/৬২৭)

রতন হাড়ি নিজেকে একজন পালোয়ান বলে দাবি করেছে। জমিদার হেমাঙ্গবাবুকে সে নিজের বীরত্বের গল্প শুনিয়েছে। হেমাঙ্গবাবু রতনকে ভাত-কাপড় দিয়ে আশ্রয় দান করেছে। তারপর হেমাঙ্গবাবু রতনকে নতুন কেনা মৌজার দখল নিতে বলে। ঐ রাতেই রতন পালিয়ে যায়। এই গল্পে গল্পকার প্রান্তিক রতন হাড়ির জীবনের চারিত্রিক ভণ্ডামির চিত্র উন্মোচন করেছেন।

'কবি' গল্পের নায়ক নিতাইচরণ হাড়ি বংশের ছেলে। নিতাইচরণ হাড়ি বংশে জন্ম নিয়ে জীবনের পঙ্ককুণ্ড থেকে বের হয়ে এসে কবিয়াল হয়ে উঠতে চেয়েছে। গল্পকার তারাশঙ্কর এ গল্পে সে উত্থানের কাহিনী বিবৃত করেছেন, পাশাপাশি নিতাই কবিয়ালের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যপ্রতিভার নিরেট বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। নিতাইয়ের জীবনে ঠাকুরজির প্রেম তার কবিয়াল হওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছে। নিতাই স্টেশনের কুলিগিরি ছেড়ে দেয়। কারণ সে কবিয়াল হয়ে উঠতে চেয়েছে। তার জীবনকে তার পূর্বপুরুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস স্পর্শ করতে পারেনি। তারাশঙ্করের সর্বজ্ঞ বর্ণনায় নিতাইয়ের হাড়ি বংশের জীবন বৃত্তান্ত ওঠে এসেছে–

নিতাইয়ের মামা গৌর হাড়ি এ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। সদ্য সে তখন পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ফিরিয়াছে ... কেবল মামাই নয়, মাতামহও ছিল ডাকাত, প্রমাতামহ ঠ্যাঙাড়ে। নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর, পিতামহ ছিল ডাকাত–মাতামহের সঙ্গে একসঙ্গে ডাকাতি করিত, প্রপিতামহের ইতিহাস অজ্ঞাত; পিতৃ-পরিচয়হীন পিতামহের বাপই একদা আসিয়া হাড়ীপাড়ায় আশ্রয় লইয়া হাড়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সেই বংশে সত্যসন্ধ কবিজন নিতাইয়ের উদ্ভব। (২/৩১৮)

রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণিগুলোর মধ্যে হাড়ি অন্যতম। কালানুক্রমে হাড়িরা বংশগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। জীবনে ও জীবিকায় তারা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি অনুসরণ করেনি।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে অন্ত্যজ বেদে সম্প্রদায়ের আদি অকৃত্রিম জীবনের বর্ণিল রীতিনীতি সংস্কার-বিশ্বাসকে আকাঁড়া বাস্তবতায় রূপাঙ্কিত করে তুলেছেন। স্মৃতিকথায় তারাশঙ্কর বলেছেন-'বর্বর, অর্ধসভ্য ও সভ্য বেদের তিন -চারটি দল প্রতি বছর তাঁদের অঞ্চলে আসত। ১৯২৩/২৪ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে

Dhaka University Institutional Repository

'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পটিতে মজিদপুর গ্রামে জমিদার হেমাঙ্গবাবু জমিদারি দেখাশোনার কাজে এলে তার সাথে পরিচয় ঘটে রতন হাড়ির। রতন হাড়ি নিজেকে মজিদপুর চকলার একজন বড় লাঠিয়াল বলে পরিচয় দেয়। গল্পকার রতন হাড়ির বর্ণনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন :

ছয় ফুট সাড়ে-ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান, তেমনি পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো করমচার মত রাঙ্গা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকান্ড একটা কাটা দাগ। (১/৬২৭)

রতন হাড়ি নিজেকে একজন পালোয়ান বলে দাবি করেছে। জমিদার হেমাঙ্গবাবুকে সে নিজের বীরত্বের গল্প শুনিয়েছে। হেমাঙ্গবাবু রতনকে ভাত-কাপড় দিয়ে আশ্রয় দান করেছে। তারপর হেমাঙ্গবাবু রতনকে নতুন কেনা মৌজার দখল নিতে বলে। ঐ রাতেই রতন পালিয়ে যায়। এই গল্পে গল্পকার প্রান্তিক রতন হাড়ির জীবনের চারিত্রিক ভণ্ডামির চিত্র উন্মোচন করেছেন।

'কবি' গল্পের নায়ক নিতাইচরণ হাড়ি বংশের ছেলে। নিতাইচরণ হাড়ি বংশে জন্ম নিয়ে জীবনের পঙ্ককুণ্ড থেকে বের হয়ে এসে কবিয়াল হয়ে উঠতে চেয়েছে। গল্পকার তারাশঙ্কর এ গল্পে সে উত্থানের কাহিনী বিবৃত করেছেন, পাশাপাশি নিতাই কবিয়ালের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যপ্রতিভার নিরেট বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। নিতাইয়ের জীবনে ঠাকুরজির প্রেম তার কবিয়াল হওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছে। নিতাই স্টেশনের কুলিগিরি ছেড়ে দেয়। কারণ সে কবিয়াল হয়ে উঠতে চেয়েছে। তার জীবনকে তার পূর্বপুরুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস স্পর্শ করতে পারেনি। তারাশঙ্করের সর্বজ্ঞ বর্ণনায় নিতাইয়ের হাড়ি বংশের জীবন বৃত্তান্ত ওঠে এসেছে–

নিতাইয়ের মামা গৌর হাড়ি এ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। সদ্য সে তখন পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ফিরিয়াছে ... কেবল মামাই নয়, মাতামহও ছিল ডাকাত, প্রমাতামহ ঠ্যাঙাড়ে। নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর, পিতামহ ছিল ডাকাত–মাতামহের সঙ্গে একসঙ্গে ডাকাতি করিত, প্রপিতামহের ইতিহাস অজ্ঞাত; পিতৃ-পরিচয়হীন পিতামহের বাপই একদা আসিয়া হাড়ীপাড়ায় আশ্রয় লইয়া হাড়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সেই বংশে সত্যসন্ধ কবিজন নিতাইয়ের উদ্ভব। (২/৩১৮)

রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণিগুলোর মধ্যে হাড়ি অন্যতম। কালানুক্রমে হাড়িরা বংশগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। জীবনে ও জীবিকায় তারা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি অনুসরণ করেনি।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে অন্ত্যজ বেদে সম্প্রদায়ের আদি অকৃত্রিম জীবনের বর্ণিল রীতিনীতি সংস্কার-বিশ্বাসকে আকাঁড়া বাস্তবতায় রূপাঙ্কিত করে তুলেছেন। স্মৃতিকথায় তারাশঙ্কর বলেছেন-'বর্বর, অর্ধসভ্য ও সভ্য বেদের তিন -চারটি দল প্রতি বছর তাঁদের অঞ্চলে আসত। ১৯২৩/২৪ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাপুড়ে, বেদেনীদের সংস্পর্শে আসেন ও তাদের সঙ্গে হৃদ্যতাও হয়।'[১] যাযাবর এই প্রান্তিক বেদে জনজাতির জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের কৌতূহল ছিল দুর্দমনীয়। 'নারী ও নাগিনী', 'রাজ সাপ,' 'বেদেনী', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'বেদের মেয়ে, 'সাপুড়ের গল্প' প্রভৃতি ছোটগল্পে এই বেদে জীবনকে তিনি নিবিড়ভাবে অঙ্কন করেছেন এবং গল্পে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রান্তিক শ্রেণি চরিত্রের চমকপ্রদ অপ্রকাশিত ইতিহাস ও তথ্যের সম্ভার।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপের ওঝা খোঁড়া শেখের কথা বলা হয়েছে। খোঁড়া শেখ সাপ নিয়ে খেলা করে, সাপকে সে ভালবাসে। ভোরবেলা পূর্বাকাশে উদিত সূর্যের রক্তাভায় উদয়নাগের নৃত্য তাকে মুগ্ধ করে–

শুধু পাখানিই তাহার খোঁড়া নয়, জীবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে–সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর (১/৩৬৮)

খোঁড়া শেখের সঙ্গে উদয়নাগের দাম্পত্য সম্পর্ক মানুষকে জীবের স্তরে নামিয়ে এনেছে। স্ত্রী জোবেদার প্রতিহিংসা সাপকে সতীনের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। মানুষ ও সাপকে এক আসনে বসিয়ে প্রান্তিক কৌম সমাজের মানুষের অভ্যন্তর জীবন-জটিলতা ও অন্তর্বিরোধের চিত্র গল্পকার নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন-

জোবেদা আয়না সিঁদুর আনিয়া ঈশদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া, সাপটির মাথায় একটি রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করিলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল। (১/৩৭০)

সাপের প্রতি স্বামীর এই অস্বাভাবিক আসক্তি দেখে সর্পিণীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে জোবেদা তাকে তাড়িয়ে দেয়। নাগিনী প্রতিশোধ গ্রহণ করে। জোবেদাকে দংশন করে নাগিনী। গল্পটিতে প্রান্তিক জনজীবনের আদিম বিকৃত কামপ্রবৃত্তির চিত্র রূপায়িত হয়েছে। লেখকের বর্ণনায় এ চিত্র গল্পে আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধু তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না। (১/৩৭২)

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, নবার্ক, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

কৌম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষের জীবনের বিচিত্র রূপ তাঁর গল্পে এভাবেই দৃশ্যমান হয়েছে। রাঢ়ের মৃত্তিকায় প্রপালিত ব্রাত্য জনজাতির জীবনের পলে পলে সঞ্চিত নানা অকথিত রোমাঞ্চকর ঘটনাবলিকে তিনি প্রদীপ্ত করে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পের বর্ণময় সম্ভারে।

আদিম কৌমজীবনে বেদের এক ব্যতিক্রমী বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় 'বেদেনী' গল্পে। বেদের মেয়ে রাধিকা 'যেন মদিরা সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও চোখে তেমনি একটা ধরাইয়া দেয় নেশা।' (২/২৩৫)

কৈশোরে এক বেদের ছেলের সঙ্গে রাধিকার বিয়ে হয়। ছেলেটির নাম শিবপদ। ছেলেটি রাধিকার ক্রীতদাসের মতো থাকত। এরপর রাধিকার জীবনে আসে শম্ভু বাজিকর। উগ্র পিঙ্গল বর্ণ, উদ্ধত দৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ দেহ মানুষটি রাধিকার দেহ ও মনকে জয় করে নেয়। এর কয়েক বছর পর শম্ভু বাজিকর বৃদ্ধ হয়; কিন্তু তখন রাধিকার ক্ষীণ তনুতে–

ঘন কুঞ্চিতে কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধ-নিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে–সর্বাঙ্গে মাদকতা। (২/২৩৫)

এই সময় রাধিকার সামনে এসে দাঁড়ায় কিষ্টো বাজিকর। ছ-ফুটের অধিক লম্বা তরুণ জোয়ান, দেখে রাধিকার মন অভিভূত হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ শম্ভু বাজিকরকে ত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে কিষ্টোকে সঙ্গী করে রাধিকা নতুন নিরুদ্দেশ জীবনের মধুর অভিসারে বের হয়ে পড়ে। আধুনিক জীবনের বিপরীতে অমার্জিত রুচি ও সংস্কৃতি বেদেনী জীবন কীভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে তা গল্পটিতে প্রতিস্পন্দিত হয়েছে। এদের মদ পান করা কিংবা লুকিয়ে চোলাই করে মদ তৈরি করার মতো প্রসঙ্গও কথাশিল্পী তারাশঙ্কর তাদেব স্বভাব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্বিত করে সমান্তরালভাবে গল্পে প্রতিস্থাপিত করেছেন :

এ জাতিটি মদ কখন কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়, কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা সাধারণ হিসেবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (২/২৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তিক জীবনের এক ভিন্নতর রূপ এই গল্পের শরীরে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। 'যে প্রাণলীলা কোনো সংস্কার মানে না, কোন বাধা বন্ধনকে স্বীকার করে না, শুধু আপনার বেগেই আপনি ধাবিত হয়, তার স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী মূর্তিই 'বেদেনীতে স্বীকৃতি পেয়েছে।'[১] শিল্পের সকণ্টক পথ অতিক্রম করে এ গল্পে তারাশঙ্কর সন্দীপিত করেছেন প্রান্তিক জনচরিত্রের আদিম উদ্দাম জৈবিক সংরাগ।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বেদে জীবনচরিত লোকজ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছে। 'বেদের মেয়ে' গল্পে বেদে নারী-পুরুষের জীবনচিত্র গল্পকার নিখুঁত ভঙ্গিমায় অঙ্কন করেছেন-

দেখতে দেখতে একটা পুরুষ-ই কেটে গেল। এর মধ্যে ওরা বার কয়েক জেলেও গেল। সেইটাই হল ওদের থাকবার আর এক জোরালো দাবী। জেল থেকে লোকটা না ফিরলে মেয়েরা যায় কি করে? কোন ধর্ম অনুসারেই বা তাড়ানো যায়? ... ওদের (বেদেদের) মেয়েগুলি পুরুষদের মতই স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র চরিত্র। রীতিও বিচিত্র। পুরুষেরা যখন ঘরে থাকে তখন ওরা হিংস্র এবং বন্য, সামান্য কথাতে নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে। যখন পুরুষেরা জেলে যায়, মেয়েরা তখন পোষ মানা হরিণীর মত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের পিছনে পিছনে বেড়ায়, করুণ মদির দৃষ্টিতে চেয়ে তাদের আকর্ষণ করে। (৩/৮৭-৮৮)

'সাপুড়ের গল্পে' ও বেদেনী সম্প্রদায়ের মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনবর্ণনায় গল্পকার লিখেছেন-

মেয়েটা তরুণী নয়, যুবতী কিন্তু যেন ষোল সতেরো বছরের মেয়ে। ছিপছিপে চেহারা, মিশমিশে কালো রঙ, ঠোঁট দুটো আরো কালো, তারও চেয়ে কালো রুক্ষ ... কালো চুলের রাশি। ... তিন তিনবার বিয়ে করে স্বামী ছেড়েছে। আচারে-বিচারেও ওর অনেক স্বেচ্ছাচারিতা। বাবু ভাই, দারোগা, জমাদার এদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও একেবারে উকিল মোক্তার। তার উপর মোহিনী জানে। পুরুষেরা ওকে পছন্দ করে না, কিন্তু না মেনে পারে না। (৩/৩৬০)

মানুষের জীবনের আদিম জৈব প্রবৃত্তির লীলার মধ্যে তারাশঙ্কর জীবনের সদর্থক মানে খুঁজেছেন। প্রবৃত্তির অতল অন্ধকার হাতড়ে তিনি সন্ধান করেছেন মানুষের জীবনের মানবিক মূল্যবোধকে। তাই তাঁর গল্পে প্রান্তিক চরিত্রের জীবন রহস্যেঘেরা, আকর্ষণে ভরপুর এবং আয়োজনে বিপুল সমারোহ সৃষ্টির দাবিদার।

---

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে প্রান্তিক বাউরি শ্রেণির জীবনের অভিন্ন রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। '১৯৫১- এর সেন্সাস মতে পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরির সংখ্যা তিন লক্ষাধিক, তার মধ্যে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এই তিন জেলাতেই ছিল আড়াই লক্ষাধিক; অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মোট বাউরি জনসংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগের বাস রাঢ় এলাকায়।'[১] তারাশঙ্করের 'ট্যারা,' 'প্রতীক্ষা', 'প্রতিমা', 'সুরতহাল রিপোর্ট' প্রভৃতি গল্পে বাউরি সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনগাঁথা বর্ণিত হয়েছে।

'ট্যারা'গল্পে অন্ত্যজ বাউরি শ্রেণির জীবনকথা উঠে এসেছে। নয়ান বাউরির ছেলে ট্যারার জীবনচিত্র এ গল্পে ফুটে উঠেছে। এই বাউরি পরিবারটির বর্ণনায় গল্পকার লিখেছেন-

দরিদ্র পল্লির মধ্যে একখানা কুঁড়েঘর। সেই পটভূমির সম্মুখে ছোট একটি পরিবার-নয়ানের বুড়ী মা, নয়ান, নয়ানের স্ত্রী আর নয়ানের নয়-দশ বছরের ছোট ছেলে ট্যারাকে দেখা যায়। (১/৩১৫)

ট্যারার একটা চোখ ট্যারা আর অতি ক্ষুদ্র। দেখে মনে হয় কানা, জিহ্বায় জড়তা আছে। ট্যারার বাবা-মা দাদি কলেরায় মারা যায়। তারপর ট্যারা স্থানীয় এক মন্দিরে সন্ন্যাসীর আশ্রয় লাভ করে। ট্যারা মন্দিরের গরুগুলি দেখভাল করার দায়িত্ব লাভ করে। ট্যারার চৌর্যবৃত্তির স্বভাব লক্ষ করে মন্দিরের সন্ন্যাসী মোহন্ত ট্যারাকে তাড়িয়ে দেয়। কয়েক বছর পর ট্যারা গৈরিক বেশে মন্দিরে ফিরে আসে। মন্দিরে মোহন্তের মৃত্যুর পর ট্যারা আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

'প্রতীক্ষা' গল্পে বাউরি নারীর জীবনচিত্র সুষম ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। বাউরি নারী পরী; সে দেখতে কালো হলেও বিলাসিনী। সে সর্বদা হাস্যপরিহাসে মুখর। সে নিজে দিনমজুর খাটে। তার এই স্বাধীন বিলাসিনী মনোভাবের জন্য বাউরি পঞ্চায়েত সমাজ তাকে এবং তার বাপকে সমাজচ্যুত করে। এতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। লেখকের ভাষায়–

গিরিশিখর আঘাতে টলে, ভাঙ্গে কিন্তু গিরি কন্যা তরঙ্গিনী আঘাতে উছলিয়া উঠে, রঙ্গিণী রঙ্গ করিতেও ছাড়ে না, স্রোতও বন্ধ হয় না। এ আঘাতে পরীর বাপ মাথা হেঁট করিল, কিন্তু পরী সেই পরী, সে সেই তেমন বিলাস করিয়া রোজ খাটিতে যাইতে যাইতে গান গায়–'পোড়ামুখী কলঙ্কিনী রাই লো!(১/৫৭১)

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

পরীর রূপ তার জীবনে এনে দিয়েছে ভিন্ন এক মাদকতা। রূপ তার স্বভাবকে প্রভাবিত করেছে। তার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন-

বাউরীর মেয়ে পরীর নিকষ-কালো বর্ণ, কিন্তু তবু তাহার রূপকে অস্বীকার করা চলে না। তাহার কালো দেহখানি ঘেরিয়া যে রূপশিখা একদিন যৌবনের সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে বহুজনের মন-পতঙ্গই উন্মত্তের মত ঝাঁপ দিবার জন্য আসিল। (১/৫৭১)

'সুরতহাল রিপোর্ট' গল্পে কড়ি নামক এক বাউরি নারীর জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। কড়ির বিয়ে হয় ভোলা চৌকিদারের সাথে। কড়ির একটা বদ অভ্যাস ছিল। সে ছোট-খাটো জিনিস দেখলে চুরি করত। এর জন্য সে অনেকবার অনেকের হাতে মার খেয়েছে। তবুও ভোলা বেঁচে থাকা সময়ে সে চুরি ছাড়তে পারেনি। ভোলা মারা গেলে সে চুরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু একথা গ্রামের কেউ বিশ্বাস করেনি। অবশেষে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। বাউরি মেয়েদের জীবন সম্পর্কে গল্পকার লিখেছেন–

কড়ি বাউরির মেয়ে। বাউরীদের সাঙা আছে, মানে মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিয়ের রেওয়াজ আছে; সে স্বামী বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়েই অন্যজনকে বিয়ে করতে পারে, স্বামী মরে গেলে তো কথাই নাই। (২/৪৫২)

রাঢ় বাংলার প্রান্তিক বাউরি সম্প্রদায় সম্ভ্রান্ত সমাজের সীমান্তে বসবাস করত। এরা পরিশ্রমজীবী জাতি হিসেবে বেশি পরিচিত। কৃষিকাজের পাশাপাশি এরা সমাজে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের বাড়িতে নানা ধরনের ফরমায়েশির কাজ করত। বীরভূম অঞ্চলে এইসব অন্ত্যজ শ্রেণির ব্যাপক পদচারণা লক্ষ করা যায়।

তারাশঙ্করের গল্পের বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে প্রান্তিক চরিত্রের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চিরায়ত ছবি। তিনি রাঢ়ের ঐতিহ্যে লালিত পালিত। তাই সেখানকার প্রান্ত সমাজের জনচরিত্র তাঁর সাহিত্যকর্মে ভিড় করে এসেছে। রাঢ় বাংলায় হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরিদের পাশাপাশি বেশ কিছু উপজাতির বাস লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে রাজবংশী, কাহার, লোহার, ভুঁইমালী, যদুপতি, সাঁওতাল অন্যতম। 'বীরভূমের সাঁওতালরা মূল সাঁওতাল উপজাতিরই এক শাখা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাদের আনা হয়েছিল জঙ্গল পরিষ্কার আর বুনো জন্তু-জানোয়ার তাড়াবার জন্য। সাঁওতালরা কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। চাষ করে, মাটি কাটে। কাজের সময় প্রায়ই দেখা যায় একখানি কাপড় দিয়ে মায়ের পিঠে তার শিশু বাঁধা আছে। মনের দিক থেকে এরা অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সরল। পরিচ্ছন্ন তাদের জীবনযাত্রা। প্রগল্‌ভ সাজসজ্জা। সমস্ত দিন কাজের পর সন্ধ্যেবেলায় ওরা একসঙ্গে মদ খায়, মাদল বাজিয়ে নাচগান করে. সাঁওতালরা ওস্তাদ তীরন্দাজ, তাদের দলপতির নাম মাঝি।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর 'ঘাসের ফুল', 'শিলাসন', 'কমল মাঝির গল্প', 'একটি প্রেমের গল্প' প্রভৃতি গল্পে প্রান্তিক সাঁওতাল শ্রেণির জীবনযাত্রা চিত্রিত করেছেন।

'ঘাসের ফুল' গল্পে চুড়কী নামের এক সাঁওতাল নারীর কথা এসেছে, যে কয়লাখনিতে কাজ করে। সে কয়লাখনির কুলি কামিনী, পছন্দ করে বিনোদ নামের একজন কর্মচারীকে, যে কয়লাখনিতেই থাকে এবং গান করে। খনিতে এক সময় আগুন লাগে। চুড়কী খনির নিচে চাপা পড়ে কিন্তু বিনোদ কৌশলে ভূ-গর্ভ থেকে বের হয়ে আসে। আগুনের লেলিহান শিখায় চুড়কী মারা যায়। চুড়কীসহ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লাভবান হয় ধনিক শ্রেণি।

রাঢ়ের বিভিন্ন জেলায় সঁওতালদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণির জীবনাচারে রয়েছে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ছাপ। রাঢ়ের সাঁওতালদের জীবনকে তারাশঙ্কর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসগুলিতে সাঁওতালদের জীবন চরিত্রের স্বরূপ নানা মাত্রায় প্রতিঅঙ্কিত হয়ে উঠেছে। 'একটি প্রেমের গল্প'-এ গল্পকার এক সাঁওতাল নারীর জীবনের রূপ ও রূপান্তর তুলে ধরেছেন। এই সাঁওতাল নারীর নাম ফুলমণি। সে গল্পকথকের বাগানে কাজ করত। লেখকের বর্ণনায় এ গল্পে সাঁওতালদের জীবনচিত্রের বিচিত্র দিক ফুটে উঠেছে–

> এখানকার সাঁওতাল পাড়াটি খুব বড়। একশো সওয়াশো ঘর সাঁওতালের বাস। এবং অনেককাল অন্তত ষাট বছর ধরে এখানে তারা বাস করছে। আগে একজন সর্দারের অধীনে তারা বাস করতো। বুড়ো মেঘলাল সর্দার ছিল প্রায় ছফুট লম্বা হিলহিলে রোগা। কিন্তু দুর্ধর্ষ সর্দার। এখন একশো সওয়াশো ঘরে তিন-চারটে পাড়ায় তিন চারজন সর্দার। এখানে এখন চারটে রাইস মিল, তাছাড়া দেশের স্বাধীনতার পর অনেক কাজ হচ্ছে। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ক্যানেল–তার জন্যে সাঁওতাল পাড়াটা জমে উঠেছে। (৩/৪৬২)

এই সাঁওতাল পল্লিতে ফুলমণি বসবাস করে। বুধন নামে এক সাঁওতাল যুবককে ভালবেসে বিয়ে করে সে। বুধন এক সময় অন্য নারীতে আসক্ত হয়। ফুলমণি তখন আত্মহত্যা করতে গিয়ে আত্মসংবরণ করে। বিচারক ফুলমণিকে সংশোধনের জন্য সংশোধানাগার পাঠায়। সেখানে সে নার্সিং ট্রেনিং গ্রহণ করে। অতঃপর

---

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* ১ম খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮

Dhaka University Institutional Repository

সে নার্সিং পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে নার্স হয়ে ওঠে। গল্পটিতে ফুলমণির চরিত্র চিত্রণে গল্পকার অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বীরভূমের সাঁওতালরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী জাতি। এই জনগোষ্ঠী সমাজের সীমান্তে বসবাস করলেও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তারা সর্বদা নিজস্ব সংস্কৃতিরই অনুসারী ছিল। প্রান্তিক এই বিশাল জনচরিত্রকে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে অসাধারণ বাস্তবতায় অঙ্কন করেছেন। ছোটগল্পে তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার প্রান্তিক চরিত্রের জীবনকে কেবল জীবন্তই করে তোলেননি; সেই সাথে এই সমস্ত চরিত্রের উত্তরাধিকারজাত রীতি-নীতি, সংস্কার ও স্বভাবের এক বিমিশ্র বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

রাঢ়ের কেন্দ্রস্থিত সমাজের সীমান্তবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রান্তিক জনচরিত্রের মধ্যে পটুয়া একটি বিশেষ সম্প্রদায়। এই সৌখিন অন্ত্যজ সম্প্রদায়টি রাঢ়ের প্রান্তিক জাতি-গোষ্ঠীতে ব্যতিক্রমধর্মী আচার-আচরণ, জীবন ও সংস্কৃতি সংযুক্ত করেছে। পটুয়াদের নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের গল্পগুলির মধ্যে 'রাঙাদিদি', 'কামধেনু' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'রাঙাদিদি' গল্পে গণপতি পটুয়া এবং তার স্ত্রী সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে। গণপতি পটুয়ার জীবনস্বরূপ বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন–

তাহার (গণপতির) হাতের আঁকা পট সাহেব-সুবায় কিনিয়া লইয়া যায়; এমন নিখুঁত পটলচেরা চোখ, ঠিক তিলক ফুলটির মত নাক, এমন মুঠিতে ধরা কোমর, এমন সুডৌল কলসীর মত বুক– এ আর কাহারও তুলিতে ফুটিয়া উঠে না। গণপতি শুধু তুলির টানে পট আঁকিতে বা হাতের কৌশলে পুতুল-প্রতিমা গড়িতে-ই ওস্তাদ নয়, তাহার রচনা করা পটমাহাত্ম্যগান, দেব-দেবীর নানা লীলার গানও বিখ্যাত। গণপতির গান গেজেটে ছাপা হয়েছে। 'দুর্গা ঠাকুরণের শাঁখা পরা', 'শিবের মাছ ধরা' 'শিবের চাষ', 'শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ' প্রভৃতি অনেক পালাগান-ই সে রচনা করিয়াছে। এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনে-মানে গুণে গণপতি শ্রেষ্ঠ লোক। (২/২৫৪)

পটুয়া নারীদের জীবন পটুয়া পুরুষদের চেয়ে খানিকটা স্বতন্ত্র। পটোনীরা রঙ বেরঙের জিনিস গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ফেরি করে বিক্রয় করতে যায়। তাদের সে জীবনের বর্ণনায় গল্পকার লিখেছেন–

রঙিন ছিটের খাটো কাঁচুলি ধরনের জামার উপর মুসলমানী ঢঙের ফেরতা দিয়ে কাপড় পরিয়া মাথায় ডালাটি তুলিয়া লয়। অভ্যাস এমন-ই হইয়া গিয়াছে যে, ডালাটা ধরিবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না; দুখানি হাতই দিব্য দুলাইয়া, হেলিয়া দুলিয়া অতি

Dhaka University Institutional Repository

সংকীর্ণ পথেও তাহারা চলিয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া বেশ এক বিচিত্র সুরে হাঁকে–চাই রে -শমী চুড়ি-! সোহা-গি-নি! নী-ল মা-নিক! গুল্-বা-হা-র! (২/২৫৪)

রাঢ় বাংলায় পটুয়া শ্রেণির সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে এদের জীবনাচার অনন্য সার্থকতায় তুলে ধরেছেন। 'বীরভূম, মেদিনীপুর ও কলকাতার পটশিল্পীরা তাদের প্রবণতা, পদ্ধতি ও সাফল্যের বিচারে পৃথক পৃথক সমাজরূপে পরিচিত। বীরভূমের পটুয়াদের সামাজিক আচারবিধি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেউ কেউ মনে করেন আদিতে এরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী নিষাদ জাতির কোন শাখা ছিল, পরে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে স্থান পায় এবং কালক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।'[১] 'কামধেনু' গল্পে নাথু পটুয়ার শ্রেণিচরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে মাধুকরী বৃত্তি করে দিন কাটালেও নাথু পটুয়ার ছেলে। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত নাথু চিত্রকর; জাতিতে পটুয়া, ধর্মে ইসলাম। পটুয়া সম্প্রদায়ের জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে গল্পকার তাদের ঐতিহ্যগত আচার ও রীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে এ গল্পে লিখেছেন–

সাঁকো পেরিয়ে ছোট একখানি গ্রাম, কুড়ি-পঁচিশ ঘর পটুয়ার বাস। লোকে সকালে 'দুর্গা দুর্গা' 'হরি হরি' বলে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মুখ হাতে জল দিয়ে আল্লাতায়ালাকে ডাকে, রাসুল আল্লাকে স্মরণ করে। কেউ গৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করে খঞ্জনি পট নিয়ে গ্রামান্তরে বার হয়, কেউ শুধু খঞ্জনি নিয়ে শিব দুর্গার নাম নিয়ে বার হয়, কেউ গোমাতা সুরভির নাম নিয়ে বার হয়। (৩/০২)

'কামধেনু' গল্পটিতে নাথু পটুয়ার জীবনের করুণ পরিণতি ফুটে উঠছে। নাথুর চরিত্রের স্খলন ঘটলে সে কামধেনু (যে গাভী বাচ্চা প্রসব না করেই দুধ দিয়েছে) কে বিক্রয় করে দেয়। সে ফুলমণিকে বিয়ে করে চামড়ার ব্যবসা শুরু করে। তার সামনে একজন গো হত্যাকারী এলে নাথু তাকে গলা টিপে হত্যা করে। তার ফাঁসির আদেশ হয় এবং সে গল্প শেষে বলেছে তার ফাঁসির দড়িটি যেন গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি হয়।

তারাশঙ্করের গল্পে প্রান্তিক পটুয়া চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রায়ণ ঘটেছে সহজাত ভঙ্গিতে। রাঢ়ের এই শ্রেণির জীবনচর্চায় নবীকরণ লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে। পটুয়া শ্রেণির জীবনের রূপাঙ্কনে গল্পগুলিতে তাঁর শৈল্পিক স্বাধীনতার প্রতিফলনও বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯২

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ় বাংলায় বহু প্রান্তিক শ্রেণি চরিত্রের মধ্যে যাদুকরীরা এক বিচিত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে সুপরিচিত। তারাশঙ্করের 'বেদেনী', 'পিঞ্জর', 'যাদুকরী', 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী' প্রভৃতি গল্পে যাদুকরী সম্প্রদায়ের জীবনচরিত দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু বাজিকরের জীবনের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে :

লোকে বলে বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে 'ভোজবাজি-ছারকাছ'; ছোট তাঁবুটার প্রবেশ-পথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি ছারকাছ' লেখাটার একপাশে একটা বাঘের ছবি, অপরদিকে একটা মানুষ, তাহার একহাতে একটি ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশ মূল্য দুইটি পয়সা। (২/২৩৪)

'পিঞ্জর' গল্পটিতে বাজিকর শ্রেণির জীবনচিত্র উঠে এসেছে। এই গল্পটিতে একজন পাহাড়ি নারী এবং পাহাড়ি পুরুষের কথা বলা হয়েছে। ম্যাজিক দেখায় এ রকম একটি চরিত্রও রয়েছে। এরা তিনজন মিলে একটা বাজিকরের দল। পাহাড়ি নারীর একটি বাঘ ও দুইটি বাঘের বাচ্চা আছে। পাহাড়ি পুরুষটি সার্কাসে নররাক্ষস সাজে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

পাখায় বাঁধা হাঁস অথবা মুর্গী-লোকটা টপ করিয়া লুফিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই গলায় দাঁত বসাইয়া কণ্ঠ নালিটা ছিঁড়িয়া দেয়– ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হয়; সেই রক্তে সে আপনার পীতাভ মুখ ও শরীর রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ দর্শন হইয়া উঠে। ... রাক্ষসের মত বন্য। (২/২৯৫)

'যাদুকরী' গল্পটিতে বাজিকর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিকাশ, জীবন ও জীবিকার ক্রমবিকাশ নান্দনিক উপস্থাপনায় বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র অনুযায়ী গল্পে উল্লেখিত হয়েছে যে –

রাঢ়ের সিদ্ধেল রাজ ভবদেবভট্ট গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি নিয়ে গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ–উভয় শ্রেণিই গুপ্তচরের কাজ করিত। এদের ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ-দেশান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। (২/৩৭৪)

এরাই কালক্রমে বাজিকর নামে এক বিচিত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। বীরভূমের সীথল গ্রাম এবং তাদের আশেপাশেই এদের বসতি।

রাঢ় বাংলায় প্রান্তিক বাজিকর শ্রেণির স্বতন্ত্র উপস্থিতি যেমন তারাশঙ্করের গল্পে উঠে এসেছে, তেমনি তাদের জীবনের সুগভীর রূপায়ণ গল্পকার নিখুঁত সার্থকতার সাথে চিত্ররূপময় করে তুলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

বাজিকরের পুরুষেরা ঢোলক নিয়ে গান করে, যাদুবিদ্যার বাজি দেখায়। নিরীহ শান্ত প্রকৃতির মানুষ এরা। মেয়েরা কিন্তু স্বভাবধর্মে স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। পরণে সৌখিন পাড় শাড়ি, সুবিন্যস্ত কেশদাম, হাতে একহাত করে কাঁচের রেশমী অথবা গিলটির চুড়ি, গলায় গিলটির হার, উপর হাতে বাজুবন্ধ, শুধু নাকে নাকছাবি, কানে আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। ... বাজিকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয়, ভূমিহীন নয়–ঘর আছে। প্রাচীন কাল হতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবুও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয়। (২/৩৬৬-৬৮)

তারাশঙ্কর তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জনচরিত্রকে কাছ থেকে দেখেছেন; মন দিয়ে গভীর অনুসন্ধান করেছেন এবং কলমের নান্দনিক ছোঁয়ায় কাগজের বর্ণিল পাতায় তাদের জীবনের নানা রূপ এঁকেছেন। নিজের অনুভব, অনুভূতি দিয়ে এই শ্রেণিচরিত্রকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

ভল্লা নামক প্রান্তিক শ্রেণিচরিত্রের বর্ণনা উঠে এসেছে তারাশঙ্করের গল্পে। ভল্লারা বাগদিদের একটা শাখা-জাতি হিসেবেই বেশি পরিচিত। দেহবল ও লাঠি চালানো বিদ্যায় পারদর্শী এ-জাতি বাগদিদের মত দুর্ধর্ষ ছিল। মারপিট হতে শুরু করে খুন, জখম ও ডাকাতির মত ভয়ঙ্কর কাজ এরা নির্দ্বিধায় করতে পারত। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে 'তাদের (ভল্লাদের) মোট সংখ্যা ছিল ৪৬১৯ জন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কয়েকটি গ্রামেই তাদের বাস। বীরভূমের লাভপুর ও ময়ূরেশ্বর থানার কিছু গ্রামে ভল্লাদের বসতি ছিল।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর 'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে এই শ্রেণির জীবনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন বিচিত্র ঢঙে–

প্রহ্লাদ ভল্লা। বাপ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। দীর্ঘজীবী অক্ষয় ভল্লার অনেক কীর্তি। সে ছিল দাঙ্গাবাজ। প্রহ্লাদ তরুণ বয়স থেকেই ডাকাতি ধরেছে। এত বড় লাঠিয়াল নাকি এ অঞ্চলে নেই। এমন কোন পাপ নেই যা সে করেনি। প্রথম বার তিনেক সে ধরা পড়েছে, মেয়াদ খেটেছে, কিন্তু তারপর আর পুলিশের সাধ্য হয়নি তাকে স্পর্শ করতে। (৩/১৫৯)

প্রহ্লাদ এককালের দুর্ধর্ষ ডাকাত। যৌবনে সাতজন নারীর সঙ্গে সে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে সে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে। অন্যদের সঙ্গে সে চোখের নেশায় খেলা করেছে। প্রহ্লাদের রক্তে ছিল ডাকাতির নেশা। দস্যুবৃত্তি তার কুলধর্ম। তার পিতামহ এ কাজ করেছে, পিতা করেছে, সেও করেছে। এই ভল্লা শ্রেণির চরিত্র-চিত্রণে তারাশঙ্করের পারঙ্গমতা তুলনারহিত।

---

[১] *Census Report of India*, 1901, Vol. vi, Chap. xi, P.403

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে চণ্ডাল শ্রেণি চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। শ্মশানে চণ্ডালরা শবদাহ করে। তাদের বসবাস শ্মশান ঘাটে। তারাশঙ্কর এই শ্রেণি চরিত্রকে কাছ থেকে দেখেছেন। সমাজ-অস্পৃশ্য এই অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র তাঁর কয়েকটি গল্পে উঠে এসেছে। 'সন্ধ্যামণি', 'পাটনী', 'আলোকাভিসার' প্রভৃতি গল্পে চণ্ডালশ্রেণির জীবনরূপ উঠে এসেছে।

'সন্ধ্যামণি' গল্পে প্রান্তিক চরিত্র হিসেবে শ্মশান প্রহরী চণ্ডাল পৈরুর কথা এসেছে। পৈরু শ্মশানে একাকী থাকে। মৃতদেহ দাহ করা তার কাজ। এ কাজে তার মধ্যে কোন মায়া মমতা আসে না। এরপরও সন্ধ্যামণির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে তার হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছে। কেনারাম আর কুসুম দম্পতির একমাত্র সন্তান সন্ধ্যামণি। তাই এই দম্পতির জন্যে পৈরু কষ্ট অনুভব করেছে।

'পাটনী' গল্পটিতে সমাজের প্রান্তবর্তী পাটনি অর্থাৎ চণ্ডাল সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্করের অনুভবময়তা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের এক সচিত্র দলিল গল্পটি। 'পাটনী' গল্পে লেখক পাটনি বা চণ্ডাল সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে–

পাটনী পল্লীতে গেলেই দেখতে পাবে-মাটির উঠানে নানা রকমের মাদুর বিছিয়ে তার উপর বসে আছে পাটনী নোংরা ছেলে মেয়ের দল। হরেক রকম দামী ছিটের বালিশও দেখতে পাবে, চারদিকে ছড়ানো দেখবে তুলো, ছেঁড়া তোশকের টুকরো দেখবে গাদা হয়ে আছে একদিকে, একদিকে দেখবে গাদা হয়ে আছে পোড়া কাঠ। ... শিবলোকের যাত্রী যারা আসে, তাদের লাগেজ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। ... সোনা রূপা থাকলে তাও এখানকার ভারপ্রাপ্ত এবং বরপ্রাপ্ত দণ্ডধারী খুলে বাজেয়াপ্ত করে নেবে। সোনা-রূপা নিয়ে কেউ বড় আসে না, তবে বাঁশের মাচা থেকে ছপ্পর খাটে শুয়ে; সামান্য চাদর থেকে কাশ্মীরী শাল পর্যন্ত হরেক রকম সাজে সেজে যাত্রীরা আসে। এ সবের ফোল আনাই পাটনীদের প্রাপ্য। এতে জমিদার গোমস্তা কারুর ভাগ নাই। এর অর্ধেক পায় দণ্ডধারী, অর্ধেক পায় শ্মশানে যার সেদিন পালা সে। (৩/৩১)

গল্পটিতে পাটনী বা চণ্ডাল সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের বর্ণনা সিনেম্যাটিক সেলুলয়েডে ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ দণ্ডধারীর কপিলের দায়িত্ব গ্রহণ করার রীতিটিও অত্যন্ত সুচারু ও দক্ষতার সাথে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। পনের ষোল বৎসরের রূপবান কিশোরের শব দেখে নতুন দণ্ডধারী কপিলের মনের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে লেখক এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় চিত্রিত করেছেন এবং গল্প-শেষে লেখকের উচ্চারণ–

আমিও প্রার্থনা করি, অকাল মৃত্যুর গতি রুদ্ধ হোক। (৩/৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রেরণার উৎসস্থল হল প্রান্তিক জীবন। অভিজাত সমাজের বাইরে এইসব অন্ত্যজ মানুষের জীবনের গহিন ভুবনে অনুপ্রবেশ করে সে জীবনের অখণ্ড রূপ ও রূপান্তর তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। 'বাবুরামের বাবুয়া' ছোটগল্পটিতে তিনি মেথর বা জমাদার শ্রেণির জীবন ও তাদের চরিত্রের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। বাবুরাম মেথর। তার স্ত্রীর নাম সুখীয়া। তাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই। এই দম্পতি একে অন্যকে ভালবাসে। তারা অন্যের সন্তানকে লালন-পালন করে, কিন্তু বড় করে না। তিন-চার বছর বয়স হলে সেই সন্তানকে তার প্রকৃত পিতা-মাতার কাছে ফিরিয়ে দেয়। এর মধ্যে বাবুরাম ও সুখীয়া দম্পতি আনন্দ খুঁজে পায়। তাদের সন্তান-বাৎসল্যের চিত্র এ গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার। গল্প-লেখকের কাছে বাবুরাম নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে–

আমার নাম বাবুরাম জমাদার। ছোট লাইনের জমাদার মেথর আমি বাবু; তোমরা তো শুধু বাবু গো, আমি বাবু-রা-ম। কি বল গো সুখীয়া! কি বলগো সুখীয়া! বলেই সে অট্টহাসি হেসে উঠল। (৩/৩৩৬)

রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জনজীবনে মেথর শ্রেণির আনাগোনা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এরা ভদ্রজনের বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করত।

বীরভূমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে রূপোপজীবিনীদের দেখা পাওয়া যেত বিভিন্ন এলাকায়। এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করত। সমাজের উঁচু তলার মানুষদের মনোরঞ্জন করার জন্য বিভিন্ন মজলিসে এদের ডাক পড়ত। এরা প্রান্ত চরিত্র হলেও অভিজাত পুরুষেরা এদের সংস্পর্শে আসত। সাজ-সজ্জা, কথা-বার্তা, চটুল গানে ও ভঙ্গিতে, হাস্য-পরিহাসে বিলাসিনী এই জাতি বিনোদন পরিবেশন করে সমাজের ভদ্রজনের মন হরণ করত। তারাশঙ্কর 'মেলা' গল্পে কমলি নামে এ রকমই এক রূপোপজীবিনীর জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'মেলা' গল্পটি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা দুই ভাই-বোনের কথা। এর মধ্যে ভাইটি বোনটিকে হারিয়ে ফেলে। বোনটির নাম মণি। মণি কমলি নামে এক পতিতার গৃহে আশ্রয় লাভ করে। মণির ফুটফুটে চেহারা দেখে রূপোজীবিনী কমলীর মধ্যে মাতৃভাব জেগে ওঠে। তার অতৃপ্ত মনে মা হবার বাসনা উপ্ত হয়। পতিতা বা বারবনিতাদের কদর্য জীবনের বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

এটাই আনন্দবাজার অর্থাৎ বেশ্যা পট্টি। প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চার পায়ের উপর এক একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহাদের লেহন করিয়া ফিরিতেছে অন্তত পাঁচশো জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতায় মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইয়া উঠিতেছে। (১/২৩৯)

এই কদর্য জীবনপরিবেশ পরিত্যাগ করে গল্পশেষে কমলি ছোট্ট মণিকে নিয়ে রাত্রির কালো অন্ধকারে পতিতালয় ত্যাগ করেছে। তারাশঙ্কর 'নারী', 'একটি মুহূর্ত', 'রূপসী বিহঙ্গিনী' প্রভৃতি গল্পেও এই বারবনিতাদের জীবনাচার ফুটিয়ে তুলেছেন। এরা রাঢ়ের আদিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জনচরিত্রকে শুধুমাত্র তার শিল্পের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেননি; এই জীবন সম্পর্কে তার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তাই সমাজের সুধীজনদের একজন হিসেবে কিংবা স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসেবে নয়; বরং এই প্রান্তজনের একজন হয়ে, তাদের সাথে একান্তভাবে মিশে, চলাফেরা করে, বিনিদ্র রজনী জেগে, এইসব অপাঙক্তেয় মানুষের ডেরায় অবস্থান করে তিনি তার সাহিত্যে তুলে এনেছেন শৈবাল থেকে পদ্মফুল। রাঢ়ের ব্রাত্যজনের অপ্রকাশিত জীবনকে তাঁর গল্পে তুলে এনে সেখানে ফুটিয়েছেন শিল্পের শতদল।

'মালাকার' গল্পে রাঢ়ের এই শ্রেণি চরিত্রের মধ্যে অন্যতম মালাকারের জীবনরূপ বর্ণিত হয়েছে। রজনী মালাকার বংশানুক্রমে ডাক-সাজ ও আতশবাজির কারিগর। সে শারদীয় পূজার উৎসবে প্রতিমার সাজ-সজ্জা করে থাকে। সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। রাঢ় বাংলার বীরভূম অঞ্চলে এই শ্রেণির পেশাজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা যা টাকা আয় করে তা মদ গাঁজা আর নারীর পেছনে ব্যয় করে। এই জাতি সঞ্চয় কী সেটা জানে না। গল্পকারের ভাষায়–

দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে–কারিগরের পাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আছে, নাই কেবল ভাত। অর্থাৎ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনেই তাহাদের সর্বস্ব ব্যয়িত হইয়া গিয়া অন্নের বেলাতেই অভাব ঘটিয়া যায়। অপব্যয়টা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ... রজনীর পিতামহ পিতা সকলেই ছিল নেশায় এবং নারীতে আসক্ত, রজনীরও তাই। তাহার উপর নিতান্ত অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া অবাধ জীবনে সে এই ধারাতেই চলিয়াছে, বিবাহ করে নাই, সে প্রবৃত্তিও নাই। (২/১৮)

রজনী মালাকার জীবনটাকে দেখেছে আতসবাজির রঙিন ফানুসের মত। তাই সে কোন বন্ধনে বাঁধা পড়েনি। সে তার পূর্বপুরুষদের মত অনেক নারীতে আসক্ত হলেও গল্প-শেষে তার জীবনের রূপান্তর ঘটেছে। সে পিতা হয়ে উঠতে চেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃণ-সংলগ্ন কৌম মানুষের জীবন-জীবিকা ও মৃত্যুধূসরতার চিত্র সুস্পষ্ট রূপে বাঙময় হয়ে উঠেছে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে। কোন আদর্শিক চিন্তা-চেতনা কিংবা গভীর জীবনজিজ্ঞাসা বা স্বার্থবোধ তাঁর গল্প-অন্তর্গত প্রান্তিক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা এইসব প্রান্ত জনচরিত্রকে পরিচালিত করেছে। 'তারিনী মাঝি' গল্পে মাঝি জীবনের এ রকম স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

তারিণী ময়ূরাক্ষী গুণটিয়া ঘাটের পারাপারের মাঝি। স্ত্রী সুখীকে নিয়ে তার সংসার। বছরের অধিকাংশ সময় ময়ূরাক্ষী মরুভূমির মত থাকলেও বর্ষায় এই নদীর রূপ হয় ভয়ঙ্কর। সুখীকে তারিণী অনেক ভালবাসে। কিন্তু অবশেষে আসে সেই ভালবাসার অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত। ময়ূরাক্ষীতে বন্যা আসে। এই সর্বনাশের মুখে সুখী স্বামীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্য। জলের ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে দুজন তলিয়ে যেতে থাকে। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে তারিণী সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সুখীকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সুখী পরম নির্ভরতায় তারিণীকেই বাহুপাশে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। প্লাবনের সেই প্রলয় অন্ধকারে গল্পকার তারাশঙ্কর নিরপেক্ষ স্রষ্টার তৃতীয় নয়ন দিয়ে স্বচ্ছ দর্পণের মত প্রত্যক্ষ করেছেন নির্মম জীবনসত্য–

সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। ... দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আঃ আঃ বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে কামনা করিল আলো ও মাটি। (১/৪৬৭)

এ গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির ভালবাসার প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে পরম নিষ্ঠুর জীবনসত্যের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রেমনির্ভরতার চরম পরাভবের ট্রাজেডিই এ গল্পের উপজীব্য।

তারাশঙ্কর জন্ম-সাহিত্যিক। তাঁর চিন্তা-চেতনায়, আদর্শ আর অনুপ্রেরণায় সাহিত্য সব সময় আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখিয়েছে। শত ঝড়-ঝঞ্ঝায় বীণাপাণির আশীর্বাদে তিনি সিক্ত হয়েছেন। বন্ধুর পথে হেঁটেছেন; হোঁচট খেয়েছেন কিন্তু সাধনমার্গ থেকে এক বিন্দু সরে আসেননি। রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষকে তিনি আপনজন ভেবেছেন; দেখেছেন তাদের জীবনের রূপ-রূপান্তর।

Dhaka University Institutional Repository

'প্রত্যাবর্তন' গল্পটিতে জেলে গোষ্ঠীর জীবনাচার বর্ণিত হয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র পশুপতি। সে ধীবর সন্তান। পোষ্য বাপ বিপিনের অত্যাচারে সে গ্রাম ছেড়ে ছেলেবেলায় জাহাজে করে বিদেশে পাড়ি জমায়। দশ বছর পরে সে গ্রামে ফিরে আসে। জেলে পাড়ার এইসব প্রান্তিক শ্রেণিচরিত্রের জীবনযাত্রার চিত্র গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

সন্ধ্যায় জেলে পাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অপরাধ যাহাই হউক মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্মরাজ তলা জমিয়াছে। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল। (২/৩৭৮)

পশুপতি নবীন জেলের মেয়ে রমাকে ভালবাসে। রমা ভ্রষ্টা মেয়ে। তার দৃষ্টি যে মানুষের ওপর পড়ে সে মানুষ বাঁচে না। এটা গ্রামের মানুষের বিশ্বাসবোধ। পশুপতি রমাকে বিয়ে করার জন্য বাজার করতে কলকাতায় গিয়ে ফিরে আসে না। রমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

বৈষ্ণব চরিত্র নিয়ে তারাশঙ্কর বেশকিছু হৃদয়গ্রাহী ছোটগল্প রচনা করেছেন। এসব গল্পে বৈষ্ণবদের জীবন বিচিত্র বর্ণে ও গন্ধে, রূপে ও রসে ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। 'বীরভূমের সদগাপ প্রধান গ্রামে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব খুব বেশি। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা অন্য বর্ণের গ্রামেও এই প্রভাব সামান্য নয়। ব্রাহ্মণ শাক্ত তান্ত্রিকরাও এখানে বৈষ্ণবদের প্রতি কোন বিদ্বেষ রাখেন না। বৈষ্ণব পদাবলী শুনে অন্তর শুদ্ধ করার ও শান্তি লাভের একটা তৃষ্ণা এদিকে সকলেরই আছে। প্রতি পাঁচটি গ্রামে অন্তত একটি করে আখড়া আছে।'[১] প্রান্তিক বৈষ্ণব চরিত্র নিয়ে তাঁর লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'রসকলি', 'রাইকমল', 'মালাচন্দন', 'রাধারাণী', 'বাঞ্ছাপূরণ' ইত্যাদি অন্যতম।

'রসকলি' গল্পের নায়ক পুলিন দাস। মঞ্জরী এই গল্পের নায়িকা। দুজন ছোটবেলা থেকে এক সাথে বড় হয়েছে। রমাদাস পুলিনের খুড়ো। পুলিন একটু বাউণ্ডেলে ধরনের। পুলিনের সাথে মঞ্জরীর বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু রমাদাস হঠাৎ পুলিনকে গোপিনী নামক এক নারীর সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের পরেও পুলিন মঞ্জরীর বাড়িতে যায়। মঞ্জরী পুলিনের সাথে রসকলি পাতায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার একটা শাশ্বত রূপ গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে। বৈষ্ণবদের ঘর-দুয়ারের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার মঞ্জরীর গৃহের বর্ণনায় লিখেছেন–

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তকতকে ঘরখানি লালমাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেয়ালে খান কয়েক পট– সেই পুরানো গোরাচাঁদ জগন্নাথ, যুগল-মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তপোষ, একদিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো। (১/৪১)

গল্প-শেষে পুলিন ও গোপিনীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে মঞ্জরী নিজে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। যাবার পূর্বে সে জমিদারকে খুশি করে যায়। পুলিন ও গোপিনীর ভালোর জন্য সে জমিদারের কাছে নিজেকে তুলে দেয়।

রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সরব উপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। হাতে একতারা কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মাধুকরীর মত এরা গৃহস্থ বাড়ির দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে। বেলা শেষে আবার নিজ আখড়ার দিকে যাত্রা করে। জীবনযাপনের বৈচিত্র্যে এরা রাঢ়ের অন্যান্য প্রান্তজন থেকে স্বতন্ত্র। এরা অনেক সময় বৈষ্ণবী নারীকে জীবনসঙ্গী কিংবা সাধনসঙ্গী হিসেবে পথচলার সাথী রূপে বেছে নেয়। নিজ আখড়ায় একত্রে বসবাস করে। এই আখড়াগুলিও বেশ পরিপাটি। তারাশঙ্কর 'রাইকমল' গল্পে বৈষ্ণব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আখড়ার বর্ণনায় লিখেছেন–

ছোট আখড়াটি রাংচিতের বেড়া দিয়া ঘেরা, ফাঁকে ফাঁকে কয়টি আম, পেয়ারা নিম, সজিনার গাছ; পিছন পানে কয় ঝাড় বাঁশ; দূর হইতে মনে হয় ছোট বাগিচা একটি। তারই মাঝে দু-পাশে দু-খানি ঘর, আর রাঙামাটি দিয়া নিকানো তকতকে ছোট আঙিনা একটি– লোকে বলে সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়; মাঝ আঙিনায় একটি চারায় জড়াজড়ি করিয়া মালতী ও মাধবীর লতা দুটি শক্ত বাঁশের মাচার পরে লতাইয়া বেড়ায়, আর পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায় প্রায় গোটা বছর। (১/১০৪)

গল্পে রঞ্জন ভালবাসে কামিনী বৈষ্ণবীর মেয়ে কমলিনীকে। কিন্তু রঞ্জনের পিতা হরি মোড়ল এই ভালবাসাকে মেনে নিতে পারেনি। বৃদ্ধ রসিকদাস বৈষ্ণব কমলিনীর রূপে মুগ্ধ। কমলিনী রসিকদাসের গলায় মালা পরিয়ে দেয়।

রাঢ়ের এই প্রান্ত জনচরিত্র সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলায় বিশ্বাসী হয়ে তাদের জীবনটাকে উৎসর্গ করেছে। একতারা করতাল নিয়ে রাঢ়ের এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সুখে দুঃখে রাধা-কৃষ্ণের নাম-ই জপ করেছে। সাধনসঙ্গিনীকে নিয়ে ভবঘুরের মত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরেছে। কখনো কখনো রূপের মাঝে অরূপের সন্ধান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তিক চরিত্রের জীবন রূপায়ণে তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার চাষী পরিবারের জীবনচিত্রও তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন। 'স্রোতের কুটো', 'হারানো সুর', 'কালাপাহাড়', 'পৌষ– লক্ষ্মী', 'বরমলাগের মাঠ' প্রভৃতি গল্পে কৃষক পরিবারের জীবনাচার উঠে এসেছে।

'কালাপাহাড়' গল্পে রংলালের পরিবার ভূমিকেন্দ্রিক কৃষক পরিবার। রংলাল একটি মহিষ ক্রয় করে। কৃষক পরিবারের আচার অনুযায়ী রংলালের স্ত্রী যশোদা মহিষটিকে সিঁদুর, তেল, দুর্বা, হলুদ দিয়ে বরণ করে নেয়।

'পৌষ–লক্ষ্মী' গল্পে কৃষিভিত্তিক প্রান্তজনের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। মুকুন্দ পাল নিজে কৃষক। কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে তার জীবন আবর্তিত। গল্পটিতে এই কৃষক চরিত্রের জীবন-যাপনের চিত্র রূঢ় বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে। গল্পকার এ জীবনের বর্ণনায় লিখেছেন–

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। মাথায় গামছা বাঁধে কম্ফর্টারের মত। নাক দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠায় কোনমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধরে ডান হাতের কাস্তে টানে। (২/৪৯৬)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রান্তিক সদগোপের জীবনের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। 'বিশেষজ্ঞের মতে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাঢ়ভূমিতে গোপদের বাস। তারা এখানে কৃষি ও পশুপালন প্রবর্তন করেছে। তাদের স্বাধীন রাজ্য 'গোপভূমি' দামোদর ও অজয় নদের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে অবস্থিত ছিল। গোপদের মধ্যে যারা পশুপালনকে জীবিকা করেছিল তারা একটি শাখায় পরিণত হয়; সমাজে এরা কিছুটা অবজ্ঞাত। আর যারা নিজস্বতা অক্ষুণ্ন রেখে কৃষির উন্নতি সাধন করেছে কালক্রমে তারাই সদগোপ নামে পরিচিত হয়।'[১] সদগোপদের অনেকেরই পদবী মণ্ডল বা মোড়ল। সদগোপদের জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর তাদের গ্রামের চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন 'কামধেনু' গল্পে–

মেটে রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ো বাড়ি। বাঁশবন, ডোবা আম-কাঁঠাল-শিরিষ গাছের বাগন-ঘেরা মরা দিঘি,মধ্যে মধ্যে আকাশ ছোঁয়া অশ্বত্থ গাছ,বিরাট ছাতার মত বটগাছ,সারিবন্দি তালগাছ, পড়ো ভিটাতে খেজুর গাছ, বড় বড় গাছের

[১] উদ্ধৃত, রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

তলায় চাপ বেঁধে বাবুরি, মানে–বনতুলসীর জঙ্গল, নয়নতারা ফুলের গাছ,কালুকাঁটার বন,ম্যালেরিয়া গাছের জঙ্গল চ'লে গিয়েছে গ্রামের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত।মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছগুলোর এক-একটার মাথায় আলোকলতা, তলায় ছোট গাছের জঙ্গলের মধ্যে লাতিয়ে বেড়ায় বিছুতিলতা। এসব হ'ল চাষী-সদ্‌গোপের গ্রাম। (৩/০২)

সদ্‌গোপ শান্তি প্রিয় সম্প্রদায়। ছায়া সুনিবিড় গ্রামীণ পরিবেশে এরা বসবাস করে। রাঢ় বাংলায় সদ্‌গোপ শ্রেণির বিশেষ উপস্থিতি তারাশঙ্কর লক্ষ করেছিলেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনাচার তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে এনেছেন। চাষাবাদ এবং পশুপালনের মাধ্যমে এই শ্রেণি ও পেশাজীবী প্রান্ত সম্প্রদায় তাদের জীবন নির্বাহ করত।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পের নান্দনিক প্রাঙ্গণে অসংখ্য প্রান্তিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এদের মধ্যে বীরভূমের ঝুমুর দল একটা বিশেষ আবেদন নিয়ে তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন–'ঝুমুর দল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে এরা বংশানুক্রমিকভাবে বাস করছে। ...মল্লারপুরে ঝুমুর দলের একটি পাড়ায় আছে।'[১] রাঢ়ের ঝুমুর দলের নীচজাতীয়া স্ত্রী ও পুরুষেরা একত্রে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়। হাট বাজারে, রেল স্টেশনে তারা জনতাকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করত। এই দলের প্রান্তিক নারীদের দেহভঙ্গি ও অশ্লীল গানের কথায় অশিক্ষিত স্থূলবুদ্ধির জনতারা আকর্ষণ বোধ করত। তারাশঙ্কর 'তমসা', 'প্রহ্লাদের কালী' প্রভৃতি গল্পে প্রান্তিক ঝুমুর শ্রেণির জীবনরূপের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। 'তমসা' গল্পে এই শ্রেণির জীবনচিত্রের বর্ণনায় গল্পকার লিখেছেন–

যাত্রীর মধ্যে একটা খেমটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ি ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেন বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, সে সেখানেই বসে চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়াম–বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশন দুরস্ত ছোকরা, সিগারেট মুখে সে প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে। (২/৫৮২)

রাঢ় অঞ্চলে যে ঝুমুর দল দেখা যেত তারা নারী পুরুষ মিলে প্রশ্ন ও জবাবের ভঙ্গিতে খেউড়, খেমটা, টপ্পা প্রভৃতি গান পরিবেশন করত। এরা ছিল ভ্রাম্যমাণ গানের দল। এই দলের মেয়েরা দেহ পসারিণীও বটে।

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৪, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৯

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তিক বাউল সম্প্রদায়ের জীবনকথা ফুটিয়ে তুলেছেন। রাঢ়ের এই প্রান্তশ্রেণি যাযাবরজীবন যাপন করত। কখনো কখনো কোন স্থান ভাল লাগলে সেখানে তারা ডেরা বা আখড়া তৈরি করত। জীবনের তাগিদে এরা অনেক সময় নানা ধরনের সামাজিক পেশা গ্রহণ করত। 'টহলদার' গল্পে তারাশঙ্কর এ রকম একজন বাউল চরিত্রের জীবন অঙ্কন করেছেন।

রামদাস বাউল একজন সৎ টহলদার। সে জীবনে কখনো কারো ক্ষতি করেনি। কারো কাছ থেকে এক আনা পয়সাও সে ঘুষ নেয়নি। গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাউলের জীবন বৃত্তান্তের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

রামদাস নিজে অকৃতদার বাউল। তাহার অন্তে তাহার পদ পাইবে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। এই টহলদারিতে রামদাসের চলিয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে মাসিক একটা করিয়া সিধার বন্দোবস্ত আছে। পাঁচ পাই অর্থাৎ আড়াই সের চাল, পোয়াটাক ডাল, কিছু তরকারি, কিছু মসলা- ইহাই অকৃতদার বাউলের পক্ষে যথেষ্ট। সমস্ত দিন সে ঘরে বসিয়া আখড়াটির পরিচর্যা করে – বেড়া বাঁধে, ফুলের গাছের গোড়ায় মাটি খোঁড়ে, জল দেয়। (১/৪০৭)

কিন্তু রামদাস বাউলের মধ্যে লোভ বাসা বাঁধে। শশী ডোমের একতারাটি সে গ্রহণ করে। বাড়ুজ্জেদের বাড়ি থেকে রাতে সে বেহালা চুরি করে। কিন্তু বাউলের বিবেক গল্পে ছায়া হয়ে তাকে সর্বদা অনুসরণ করেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ জীবনের নানা স্তরে বিচরণশীল মানুষের যাপিত জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন সে জীবনের বর্ণময় সংস্কার ও সংস্কৃতি। শিল্পের ক্ষুধা আর স্বীয় মানসিক তাড়না তাঁকে গৃহবিমুখ করেছে; অন্তহীন পথিক সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর মানসভুবন। তিনি প্রান্তজনের একজন হয়ে কখনো বা তাদের যাপিত জীবনের মধ্যে অবস্থান করেছেন; তাদের মুখের ভাষাকে উপলব্ধি করে, তাদের ব্যথা-বেদনা, প্রবঞ্চনার ইতিহাসকে গল্পে বাণীরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পে হাড়ি, বাগদি, ডোম, বাউরি, চণ্ডাল, বাজিকর, বেদেনী, সাঁওতাল, বৈষ্ণব, কৃষক, বাউল, পটুয়া, বারবনিতা, জেলে, মাঝি, জমাদার, মালাকার হতে শুরু করে তাঁতি, সদ্‌গোপ, ঝুমুর, যাযাবর, ভল্লা প্রভৃতি প্রান্ত জনচরিত্রের মিছিল এক জনসমুদ্রের মতো ফেনিল হয়ে উঠেছে। রাঢ়ের মৃত্তিকায় আশ্রিত, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত প্রপালিত প্রান্তিক জনমানুষ– এই বৈচিত্র্যময় ভূ-ভাগের সঙ্গে আত্তীকৃত হয়ে জীবনের পাথুরে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত জনপদে পরিণত হয়েছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্প এই প্রান্তিক শ্রেণিচরিত্রের কণ্ঠস্বরে মুখরিত, কল্লোলিত এবং উদ্ভাসিত।

Dhaka University Institutional Repository

খ. জীবিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রাঢ়ের যে অভ্যস্ত জীবনে বেড়ে উঠেছেন, যে ভূ-পরিমণ্ডলের আবহাওয়ায় তাঁর চিন্তা-চেতনা ক্রমপ্রসারিত হয়েছে সেখানকার বিভিন্ন প্রান্তশ্রেণির শ্রমজীবী পেশাজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার 'স্রোত-প্রতিস্রোত' নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। 'সাহিত্যের বজরা' বীরভূমের ঘাটে ঘাটে নোঙর করে তিনি তুলে এনেছেন শিল্পের কাঁচামাল। প্রান্তিক শ্রেণিচরিত্রের প্রতি তাঁর সংরাগ ও মমত্ববোধ ছিল আন্তরিক ও নিখাদ। তিনি তাঁর 'আগলছাড়া' জীবনের সাহিত্য-সাধনায় এইসব ব্রাত্য মানুষের সাথে কেবল পরিচিতই হননি, গড়ে তুলেছেন তাদের সঙ্গে হার্দিক বন্ধন। বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রান্তজনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার সাতকাহন তাঁর গল্পে ছায়াছত্রের মতো সুবিন্যস্ত ও বর্ণশোভিত হয়েছে। 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতির রূপান্তরের ফলে নিম্নবর্গের জীবন জীবিকার পরিবর্তন উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্পে। সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে নিম্নস্তরের প্রান্তিক ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর জীবনের মানবিক চিত্র রূপাঙ্কনে লেখক বিংশ শতাব্দের আর্থসামাজিক সঙ্কটের বাস্তবতাকেও চিহ্নিত করেছেন। জমি, জমিদার, কৃষকের সঙ্গে কলিয়ারি শ্রমিক যেমন তাঁর গল্পে বিশেষ দেশকালের মানুষ হিসেবে রূপায়িত; তেমনি অন্ত্যজ, ব্রাত্য, অস্পৃশ্য, লোকায়ত, যাযাবর, ক্ষুদে চাকরিজীবী ও অপরাধী জনগোষ্ঠীর সমাজ অর্থনীতি সমকালীন বাস্তবতায় চিরন্তন সাহিত্যকীর্তিতে উচ্চকিত হয়েছে।'[১] তারাশঙ্কর কখনো স্ব স্বভাবের ভেতরে থেকে কখনো বা বাইরে গিয়ে রাঢ় সমাজের নিম্নতর স্তরে আশ্রিত প্রান্ত শ্রেণি-গোষ্ঠীর জীবিকার স্বরূপ বাস্তবানুগ করে তাঁর কথাসাহিত্যে রূপান্বিত করে তুলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর নানামাত্রিক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত বীরভূমের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবিকায় একটা পালাবদলের সূচনা করে। 'ভারতের তথা বাঙলার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ব্যাপকতা, সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীজীর জাতপাত বা হরিজন আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বা বিপর্যয়, রুশ-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় সাম্যবাদী আন্দোলন ও কমিউনিস্টদের ঈশ্বর-

---

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, ১ম প্রকাশ , ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতা ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত ভূমিকা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া তথা যুদ্ধজনিত জীবনের রূপ ও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, মন্বন্তর এবং কৃষক– শ্রমিক আদিবাসী বিক্ষোভ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে গণচেতনা বা জীবনবোধ রূপলাভ করে, তা আর্থ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে সূচনা করল এক নতুন যুগ বা অধ্যায়। ...সাহিত্যে এতদিন যারা অপাঙক্তেয় ছিল, বিশ শতকে সেই অবজ্ঞাত নিম্নবর্গ ব্রাত্য সম্প্রদায় সাহিত্যের আসরে ভিড় করে এলো।'[১] রাঢ়ের গণমানুষের জীবনে বিশেষত প্রান্তিক জনসমাজের জীবন ও জীবিকায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা যেমন প্রকটিত হয়েছে; তেমনি কালিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই সব কৌমবদ্ধ সমাজে পেশা বা বৃত্তি বদল বা গ্রহণের ঢেউ ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছে। তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে প্রান্ত মানুষের জীবিকার ধরন ও প্রকৃতি নিজস্ব কালসীমায় রেখাঙ্কিত হয়েছে। সেখানে তাঁর আপনত্ব স্বকালকে আত্তীকৃত করে স্বীয় গরিমায় আভাসিত হয়েছে।'রাঢ়ের পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতায় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সূত্রে শিল্পের অনুপ্রবেশে রাঢ়ের জীবনধারার রূপান্তর, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের অস্তিত্বসংগ্রাম ও সংরাগের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির চিত্রমালা তারাশঙ্করের গল্পের বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত।'[২] তারাশঙ্কর শিল্পের 'গজদন্তমিনারে' অবস্থান করেননি, নেমে এসেছেন গৈরিক মৃত্তিকার কোলে।

রাঢ়ের মৃত্তিকায় আজন্ম যাদের বসতি, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে যাদের জীবিকা আচার-আচরণ, প্রথা-সংস্কার স্থানান্তরিত হয়েছে তারাশঙ্কর তাদের জীবনালেখ্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর সাহিত্যে চিরকালীন করে তুলেছেন। 'কৃষিভিত্তিক হলেও বীরভূমে গ্রামীণ শিল্প পুরুষানুক্রমিক আচরিত বৃত্তি নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। কৃষি সমাজের প্রয়োজন মেটাতে তাঁতি কামার, কুমোর, ছুতোর, পটুয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প সৃষ্টি করত।'[৩] বীরভূমের প্রান্তিক শ্রেণির জীবিকায় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প যেমন একটা ভূমিকা রেখেছিল; তেমনি তৎকালীন কলিয়ারির ব্যবসা এই শ্রেণির পেশায় এক ধরনের বৈচিত্র্য আনয়ন করে। তারাশঙ্কর নিজেও এই কলিয়ারি শিল্পে কাজ করেছেন। তাঁর শ্বশুরকুল সেকালে কলিয়ারির মালিক ছিলেন। উত্তরকালে তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন- 'শ্বশুরকুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদার ঘরের অর্ধ-শিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার অফিসে কখনও কয়লাকুঠিতে

---

[১] সুবোধ দেবসেন, *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ*, ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৪

[২] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৮

[৩] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯

Dhaka University Institutional Repository

পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশি লেগে থাকতে পারিনি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হইনি- তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।'[১] তারাশঙ্কর রাঢ়ের যে সমস্ত ব্রাত্য জনসমষ্টির জীবিকার স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন তার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষের জীবন ইতিহাস ভিড় করে এসেছে। এসব বৃত্তিজীবী মানুষের মধ্যে ডোম, হাড়ি, বাগদি, বাউরি, বাজিকর, বারবনিতা, কামার, মুচি, জমাদার, ডাক-হরকরা, জেলে, তাঁতি, চাষি, সদগোপ, চৌকিদার যেমন আছে; তেমনি বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বাউল, শাক্ত, তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সরব উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। জীবনধারনের তাগিদে, কখনো বা বৈচিত্র্যের সন্ধানে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় এইসব অন্ত্যজ শ্রেণি তাদের বৃত্তি বা পেশাকে পরিবর্তন করেছে। তবে সর্বক্ষেত্রে ঢালাওভাবে এই পরিবর্তন রাঢ় সমাজের প্রান্ত-শ্রেণিতে পরিলক্ষিত হয়নি। 'ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অন্ত্যজ নিম্নশ্রেণি আপনবৃত্তি ও গোষ্ঠীগত জীবন-সংহতি ত্যাগ করে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছে– এই চিত্র অন্তর্ভেদিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। নিম্নবর্গের বৃত্তি বদলের ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের সঙ্গে সমঝোতা, সামঞ্জস্য ও স্বীকরণ গুরুত্ব পেয়েছে। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে, কখনো বৈচিত্র্যের আকর্ষণে নিম্নবর্গ পূর্বপুরুষের বৃত্তি ছেড়েছে আবার মূলবৃত্তির কেন্দ্রে থেকেও পার্শ্ববৃত্তির টানে জীবনের গতিবদল হয়েছে তাদের।'[২] রাঢ়ের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জীবনে জীবিকার এ রকম গ্রহণ ও বর্জন চলেছে অবিরত। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পেশা বা বৃত্তির এই পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে প্রান্ত জনজীবনে অস্তিত্বরক্ষার সুকঠিন সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে।

'ডাক-হরকরা' গল্পের দীনু জাতিতে ডোম। ডোমরা সাধারণত চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি কাজকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু গল্পে দীনু ডোম তার পূর্ব পুরুষদের পেশা থেকে সরে এসেছে। সে হয়ে উঠেছে সরকারি মেল রানার। জাতিতে সে নিচুশ্রেণির হলেও পুরুষানুক্রমে চলে আসা পেশাকে নিজের জীবিকা করে তোলেনি গল্পে তার মানসিক রূপান্তর লক্ষণীয়। কর্তব্য পালনে সে একনিষ্ঠ। তাই পুত্র নিতাই ডাক চুরি করতে এলে সে নিতাইকে চিনতে পারে এবং বিচারকের কাছে সে তার সন্তান নিতাই-এর নাম

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন*, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০,বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা , পৃষ্ঠা-৫১

[২] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository

বলে দেয়। চৌর্যবৃত্তি বা ডাকাতির চেয়ে দীনু ডোমের কাছে দায়িত্ব পালন করাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে হয়েছে। গল্পকারের উচ্চারণ-

দীনু কিন্তু সমান বেগে চলিতেছিল। এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম করিবার সময় নাই– হুকুম নাই। গতি পর্যন্ত শিথিল করিতে পাইবে না। (১/৫৭৯)

রাঢ়ের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে ডোমেরা চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন করেই জীবিকা নির্বাহ করত। '১৯৫১-র জনগণনার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মোট এক লক্ষাধিক ডোমের তিন ভাগের দুভাগ বাস করে বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায়। এই বাঙালি ডোমরা তাদের সামাজিক সংহতি ও পরাক্রমের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। মধ্যযুগে পাল ও সেন রাজাদের সময় থেকে বাংলার বিভিন্ন রাজ্যে এরা সৈন্যরূপে সমাদৃত হত।'[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একাধিক গল্পে বিখ্যাত শশী ডোমের কথা উল্লেখ করেছেন। ধান চুরি করেই ডোমেরা জীবিকা নির্বাহ করে। শশী ডোমও এর ব্যতিক্রম নয়। গল্পকারের ভাষায়–

চুরির নেশা এই ডোম বংশটির রক্তের কণায় কণায় যেন জলের সঙ্গে মহামারীর বীজাণুর মত মিশিয়া আছে। আর তাহা পুরুষে পুরুষে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই ব্যবসায় তাহারা নিয়মিত ভাবে করিয়া আসিতেছে। টাকা নয়, তৈজসপত্র নয়, শুধু ধান। ধানের মরাই হইতে সুকৌশলে ধান বাহির করিয়া লয়, ধানের গোলায় দুয়ারে যেমনই তালা দেওয়া থাকুক না তালা তাহারা খুলিয়া ফেলিবেই, এবং সুকৌশলে আবার বন্ধও করিয়া দিয়া যাইবে। শশী ডোম এখন দলের নেতা, দীঘল ছিপছিপে শরীর, গতি যেন বায়ুর মত, একহাত ব্যবধান হইতেও তাহার পিছনে ছুটিয়া আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। পুলিশের লোক মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে–'বেটা যদি সিঁদ দিতে আরম্ভ করত তবে আর রক্ষে থাকত না। (২/২১৪)

'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্পে ডোম-পুরুষদের পাশাপাশি ডোম-নারীদের জীবিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। ডোম নারীরা বাঁশ দিয়ে ধুনুচি, ডালা, কুলা তৈরি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ফেরি করে বেড়ায়। ওদের পুরুষেরা যখন চুরি করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তখন ওরা এভাবেই জীবিকা নির্বাহ করে; তবুও তারা ভিক্ষে করে না বা কারো বাড়িতে কাজ করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে না। গল্পকারের ভাষায়–

ওরা চোর কিন্তু ওরা ভিক্ষে করে না, খেটে খায় না; ওদের মেয়েরা কখনও কারুর বাসনমাজা, কি পাটকামের কাজ করে না। ...ফটিকের বড় দাদা হোঁৎকার বউ– তার তো ফরসা রঙ, ভদ্র ঘরের মেয়ের মতো দেখতে। কিন্তু ঘাড় নাড়লে ছকু চাটুজ্জে; তারপর আবার বললে– বাঘিনী। ...অবিশ্যি তার বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল। তারাও এই কম্ম করে, কিন্তু জমি জিরাত আছে। তাছাড়া ডালা কুলো চাটাই জাফরির কারবারটা ওদের বাড়ির মেয়েরা বারোমাস চালায়। (৩/৪৮৯)

---

[১] রঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা*, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭,নবার্ক, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বীরভূমের প্রান্তিক জন চরিত্র ডোমদের জীবিকার রূপ ও রূপান্তর তারাশঙ্করের গল্পে সামগ্রিক বাস্তবতায় উঠে এসেছে। এই শ্রেণিচরিত্রের চিত্র-চরিত্র তাদের দুঃসাহসিক জীবিকার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি তাঁর গল্পগুলিতে পরিবেশন করেছেন। তারাশঙ্কর এই ডোম সম্পর্কে বলেছেন–

এদের কাহিনী বিচিত্র। এদের নিয়ে আমি অনেক গল্প লিখেছি। একটি বিস্ময়কর অপরাধ প্রবণতা এই বংশটির মধ্যে আছে। ব্যালো ডোম থেকে শুরু করে তার পৌত্র হাবল ডোম পর্যন্ত সকলেই ধান চোর। বার বার ধরা পড়ে জেল খাটে আবার ফেরে, আবার জেল খাটে।[১]

রাঢ় বাংলার এই প্রান্তশ্রেণির জীবন ও জীবিকা তাঁর কলমের স্পর্শেই সাহিত্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

প্রান্তিক বাগদি শ্রেণিচরিত্রের জীবন ও জীবিকার বর্ণনা তারাশঙ্কর তাঁর একাধিক ছোটগল্পে উৎকীর্ণ করেছেন। 'বাগদিরা বীরভূমের প্রাচীন আদিবাসী হিসেবে ভূস্বামীদের লাঠিয়াল ও চুরি ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করত।'[২] ভূমিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভুরা বাগদি সম্প্রদায়কে নিজস্ব শক্তির বাহকরূপে মনে করত। বাগদি জনগোষ্ঠী খুন, মারামারি, বাহুবল প্রদর্শনে ছিল দক্ষ। লাঠি চালানোয় পারদর্শী এই ঠ্যাঙাড়ে জাতি পুরুষানুক্রমে হত্যা, লুণ্ঠনকে তাদের জীবিকারূপে গ্রহণ করেছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক বাগদি জনগোষ্ঠীর জীবিকার হিংস্র রূপ অঙ্কিত হয়েছে।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে বাগদি শ্রেণির জীবিকার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পে কালী বাগদি বিচারকের কাছে তার জীবন ও জীবিকার কথা বলেছে–

আজও আমাদের কুলের গরব– লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে আমাদের পল্টনের কাজ যখন গেল তখন থেকে এই আমাদের ব্যবসা। ...জমিদার লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হত। কিন্তু কোম্পানির রাজত্বে থানা-পুলিশের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিকে থাকল তারা শিং ভেঙে ভেড়া ভালো মানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এমন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতা ঘুরিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধরে আমরা এই ব্যবসা (মানুষ খুন করা) চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগদীগিরি লোক দেখানো পেশা ছিল আমাদের। (১/২৯২)

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই কালী বাগদিদের চার পুরুষের জীবিকা অর্জনের পথ।

কখনো জীবনের প্রয়োজনে প্রান্তিক এই জনচরিত্র বৃত্তি বদল করেছে।'চৌকিদার' গল্পে বনোয়ারী বাগদি খুন ডাকাতি ছেড়ে অবলম্বন করেছে স্বতন্ত্র পেশা। পুরুষানুক্রমে চলে আসা বাগদি সম্প্রদায়ের

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *গ্রামের চিঠি*, ১৯৮৬, সারাস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭৬

[২] ত্রিলোচন জানা, *তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রান্তিক সমাজ*, ২০০৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

নরহত্যা জখম, রক্তপাতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে বনোয়ারী বাগদি হয়ে উঠেছে চৌকিদার। বনোয়ারীর হাত ও বুকের পেশী সুপুষ্ট। তার প্রত্যেকটি পেশী দৃঢ় মোটা দড়ির মত; চামড়ার অন্তরালে সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাগদির সন্তান সে। শরীরে শক্তি ও তেজ সুপ্রচুর। লাঠি চালনা বিদ্যায় সে পারদর্শী। তাই প্রেসিডেন্ট বাবু তাকে অধিক প্রশ্ন না করে চৌকিদারের চাকুরিতে নিযুক্ত করেন। লেখকের বর্ণনায়–

প্রেসিডেন্ট বাবু আর প্রশ্ন করিলেন না, নীল রঙের কোর্তা, নীল রঙের পাগড়ি, ঝুলি ও পিতলের তকমা-আঁটা চামড়ার পেটি বানোয়ারীকে দিয়া তাহার হাতের টিপ লইয়া তাহাকে চিতুরা গ্রামের চৌকিদার নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন। (২/১০৩)

'তমসা' গল্পে কৃত্তিবাস বাগদির ছেলে পঙ্কী ভিক্ষে করাকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেছে। অন্ধ পঙ্কী বাগদি প্রান্ত-চরিত্র হলেও বংশানুক্রমিক ধরে চলে আসা খুন লুণ্ঠন ডাকাতিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তার চেহারা কুৎসিত। সবকিছু মিলিয়ে সে যেন বীভৎসতার সচল ভাস্কর্য। ব্রাঞ্চ লাইনের রেল স্টেশনে লাল-কাঁকর বিছানো মাটির সঙ্গে সমতল প্লাটফর্মে বসে সে আপন মনে গান গেয়ে ভিক্ষে করে। দিন রাত সে স্টেশনেই পড়ে থাকে। এভাবেই ভিক্ষে করার মাধ্যমে সে তার জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে।

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে প্রান্তিক বাগদি চরিত্রের জীবিকার পালাবদল দেখিয়েছেন। কখনো এই সম্প্রদায় তাদের পূর্ব পুরুষদের হিংস্র বর্বর নরহত্যা, ডাকাতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আবার কখনো বা জীবনের বিচিত্র টানে বৃত্তি বদল করে স্বতন্ত্র জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বাগদি গোষ্ঠীর মতো তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে প্রান্তিক হাড়ি সম্প্রদায়ের চিত্র-চরিত্র তুলে ধরেছেন। বাগদি, ভল্লা, ডাকাত প্রভৃতি অপরাধপ্রবণ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মতো হাড়ি শ্রেণিও জাতিতে অপরাধী ছিল। হাড়িরা রাঢ়ের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী। বীরভূমের নানা প্রান্তে হাড়ি সম্প্রদায়ের বসতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 'হাড়িদের মধ্যে যারা চাষ–আবাদ করে তাদের নাম ভুঁইমালী। যারা ধাই এর কাজ করে তাদের বলে ফুলহাড়ি, যারা পাল্‌কীবাহক তারা কাহার। ঝাড়ুদারেরা মেথর। বাগদীদের মত হাড়িরাও চুরি ডাকাতিতে অভ্যস্ত।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর বেশকিছু ছোটগল্পে এই হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবিকার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

হাড়িরাও ভূ-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় জমিদারদের বাহুবল বলে বিবেচিত হত। জমিদারেরা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখতে সমাজের এইসব প্রান্ত জনচরিত্রকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত "ব্র্যাঘ্রচর্ম" গল্পটিতে রতন হাড়ি জমিদার হেমাঙ্গবাবুর আশ্রয় লাভ করে। রতন নিজেকে হাড়ি

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খণ্ড), ৭ম মুদ্রণ, ২০০৪,সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭

Dhaka University Institutional Repository

বংশের এক দুধর্ষ লাঠিয়াল হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে কিন্তু এ পরিচয় তার প্রতারণামূলক। জীবিকা নির্বাহের জন্য সে এই মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় অবলম্বন করেছে। গল্পে রতন হাড়ি বলেছে–

গোলামের নাম রতন হাড়ি। হুজুরের গোলাম আমি। এ চাকলায় সকলেই আমাকে চেনে। (১/৬২৭)

রতন হাড়ি সম্পর্কে গল্পকার স্বয়ং বলেছেন–

রতনহাড়ি, এ চাকলার বড় লাঠিয়াল একজন। জমিদারের কাজকর্ম পড়লে কাজটাজ করে। (১/৬২৭)

রতনহাড়ি জমিদার হেমাঙ্গবাবুর কাছে নিজেকে এলাকার একজন সেরা লাঠিয়াল হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। দশ বছর পূর্বে সে তার নিজের গ্রাম ত্যাগ করেছিল। শরীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকায় সে ভিক্ষে পায়নি কিংবা কারো বাড়িতে কাজ করতে পারেনি। সে কী কাজ করতে পারে তা জমিদার জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে সে খুন, জখম, ঘরে আগুন দেওয়ার মতো ভয়ংকর সব কাজের কথা বলেছে। রতন হাড়ি নিজের কথা বলতে গিয়ে হেমাঙ্গবাবুকে বলেছে–

'ছেলেটা মরে গেল সেই অসুখেই, আমি কিন্তু ফন্দিটা শিখে নিলাম। যেখানে যা খুন জখম হত বলতাম আমি করেছি। লোকে ভয় করত, যার দোরে দাঁড়াতাম সেই আঁচলটা ভরে দিত, খাতিরও করত।' (১/৬৩২)

জীবনের প্রয়োজনে এবং অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে রতন হাড়ি জীবিকা নির্বাহের জন্য মিথ্যা ভাষণকেই একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। জীবনসম্পর্কিত বিরূপ অভিজ্ঞতা তাকে এ ধরনের কাজে প্রণোদিত করেছে। দাঙ্গা, খুন, জখম বা অগ্নিসংযোগের মতো লোমহর্ষক কাহিনী বলেই সে জমিদারের পাইক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু দাঙ্গার দায়িত্ব দেয়া হলে সে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র জীবিকার জন্যে সমাজের এই প্রান্তচরিত্রটি সাহসিকতার মিথ্যা গল্প প্রচার করেছে।

'কবি' গল্পে হাড়ি বংশের সন্তান নিতাইচরণ পূর্বপুরুষদের ভয়ংকর কদর্য বৃত্তি থেকে বের হয়ে ভিন্ন পেশাকে অবলম্বন করেছে। জাতিতে হাড়ি হলেও নিতাই স্বীয় জীবনাচারণে ও পেশায় হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমধর্মী। হাড়িত্বের আভরণ খুলে সে নিতাই থেকে হয়ে উঠেছে কবিয়াল নিতাইচরণ। কবিগানকে সে জীবনের নেশা এবং পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। কবিয়াল হয়ে ওঠার পূর্বে প্রথম জীবনে সে রেল স্টেশনে যাত্রীদের মোট বহন করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেছে। নিতাইয়ের জীবিকা সম্পর্কে গল্পকার তারাশঙ্করের ভাষ্য-

দিনে সে (নিতাই) স্টেশনে থাকিত– ভদ্রলোকজনের মোট গাড়িতে তুলিয়া দিত, নামাইত, গ্রামে গ্রামান্তরেও মাথায় করিয়া দিয়া আসিত। রোজগার মন্দ হইত না, স্টেশনে নামাইতে চড়াইতে দু পয়সা, গ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে চার পয়সা, গ্রামান্তরের রেট দূরত্ব হিসাবে এবং গরজ অনুযায়ী দুই আনা চার আনা, বর্ষায় বা সন্ধ্যায় হইলে ছ-আনা বাঁধা। (২/৩১৮)

Dhaka University Institutional Repository

নিতাইয়ের কাছে এক পর্যায়ে জীবিকার চেয়ে সম্মান বড় হয়ে উঠেছে তাই সে স্টেশনে কুলিগিরির কাজে ইস্তফা দিয়েছে। কবিয়াল হয়ে ওঠার স্বপ্নই তার জীবনে আরাধ্য হয়ে উঠেছে। নিতাইয়ের মামা গৌরহাড়ি দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। তার প্রমাতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে এবং পিতা ছিল সিঁদেল চোর। কিন্তু নিতাই প্রচলিত এই হীন বৃত্তি বদল করেছে। সে জাতিতে হাড়ি হয়েও কবিগানকেই বংশপরম্পরা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

'সনাতন' গল্পে সনাতন হাড়ির ছেলে । সে শিবনাথের প্রপিতামহের সময় থেকে তাদের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করে। শিবনাথের বাড়ির চার পুরুষের চাকর সে। হাড়ির সন্তান হয়েও সে ভৃত্যের কাজকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। লেখক সনাতনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন–

শিবনাথের প্রপিতামহের আমলে এ বাড়িতে বহাল হইয়াছিল। দশ বছর বয়সের হাড়ির ছেলে, মোটাসোটা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একমাথা কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল বলিষ্ঠ গঠন; গরুর রাখালি করিবার জন্য বাহাল হইয়াছিল। নাম সনাতন। (২/৩৮৩)

প্রান্তিক হাড়ি সম্প্রদায় রাঢ়ের আদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা চিরদিন দুঃসাহসিক নানা ধরনের অপকর্মকে জীবিকারূপে গ্রহণ করলেও সময় ও কালের প্রেক্ষাপটে এবং স্বীয় প্রয়োজনে কখনো কখনো এরা ঐতিহ্যগত বৃত্তি পরিবর্তন করে বৃহত্তর জীবনস্রোতে অবগাহন করে ভিন্নতর জীবিকার অনুসন্ধান করেছে।

হাড়ির পাশাপাশি তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে প্রান্তিক ভল্লা জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচীন রাঢ়ের গোষ্ঠীবদ্ধ ডোম সমাজ যেমন একদিন লাঠিয়াল, বাহুবল, সৈন্যবৃত্তি ত্যাগ করে ইংরেজ শাসনে অপরাধী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে তেমনি ১৯০১ সালের সেন্সাসে ভল্লাদের (যাদের বাগদিদের নতুন শাখা বলা হয়েছে) ঠ্যাঙাড়ে, ডাকাত ও লাঠিয়ালরূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।'[১]

ভল্লারা বাগদিদের মতো ডাকাতিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই অন্ত্যজ জাতি লাঠি চালনা বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিল। তারাশঙ্কর তাঁর 'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে প্রহ্লাদ ভল্লা নামক একটি চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রহ্লাদ ভল্লার পেশা হল ডাকাতি এবং তরুণ বয়স থেকে এই ডাকাতিকে সে বৃত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে। গল্পকার প্রহ্লাদের জীবিকার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন–

সে প্রহ্লাদ ভল্লা। গ্রামের গোয়ালারা তাহাদের মহিষগুলি ডাকাতের দিকে আগাইয়া দিয়াছিল, তাহারা চমকিয়া উঠিয়া ডাকাতদের ঘাঁটির দিকে শিঙ বাঁকাইয়া খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছিল; কিন্তু একজন লাঠিয়াল অকুতোভয়ে মোহড়া লইয়া লাঠি

[১] *Census Report of India*, 1901, Vol Vi, Chap-xi, P.403 X & Appendix vi, P.xxxviii.

Dhaka University Institutional Repository

মারিয়া মহিষগুলিকে হটাইয়া দিয়াছে। তিনটি মহিষের একটি করিয়া শিঙ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সকলেই বলিতেছে এই লোকই প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ ছাড়া ইহা কেহ পারে না। (৩/১৬০)

ডোম, বাগদি, হাড়ি, ভল্লাদের মতো প্রান্তিক জনচরিত্র রাঢ়ের সমাজে চিরকাল অপরাধী হিসেবেই পরিচিত। এইসব অন্ত্যজ দুর্ধর্ষ জনশ্রেণি জীবনের তাগিদে ডাক হরকরা, চৌকিদারি, ভিক্ষাবৃত্তি, কবিগান থেকে শুরু করে চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি, খুন জখমকে জীবিকার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে। এইসব 'অপরাধ প্রবণ জনগোষ্ঠী সমাজে দরিদ্র ও বিপর্যস্ত, আচার অনুষ্ঠানে অশুচি। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষি জীবিকার সংস্কৃতিতে মিশে যেতে পারেনি আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্রাচারের বাইরে থেকেছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ যুগে তাদের অবস্থা অনেকাংশে অপরিবর্তিত থাকে, তারা বিকল্প জীবিকার পথ খুঁজে পায় অসৎ কর্মে।'[১] বীরভূমের আদি অধিবাসী হিসেবে এইসব অন্ত্যজ চরিত্রের জীবিকার বৈচিত্র্য এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) স্বাধিষ্ঠান ক্ষেত্র ছিল রাঢ়ভূমি। রাঢ় ছিল তার কাছে তীর্থস্থানের মতো। তাঁর ছোটগল্পে বীরভূমকেন্দ্রিক রাঢ়ের বিচিত্র জনগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য জীবন ও জীবিকার স্বরূপ বহুবিস্তৃত হয়ে স্ব গরিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর গল্পে রাঢ়ের সাঁওতাল উপজাতি এই জনগোষ্ঠীর আদিমতম স্তরেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। 'তারাশঙ্করের উপন্যাস সমূহে রাঢ়ের সাঁওতালদের কৃষিকার্য, শিকার ও আনন্দ উৎসবাদির বিবরণ আছে। সেখানে দেখি স্থানীয় বাঙালিদের চেয়ে সবল স্বাস্থ্য, কর্মনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু হওয়ায় কৃষি ও শিল্প শ্রমিক হিসাবে এইসব সাঁওতালদের চাহিদা বেশি।'[২] তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বিচিত্র পেশার পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। 'ঘাসের ফুল' গল্পে সাঁওতাল নারী চুড়কীর প্রসঙ্গ এসেছে। চুড়কী কয়লা খনিতে কুলির কাজ করে। কারখানার অন্য শ্রমিকদের সাথে সে ভূ-গর্ভ হতে কয়লা উত্তোলন করে। চুড়কীর সাথে আরো কয়েকজন সাঁওতাল নারী কয়লাখনিতে কাজ করে। চুড়কী খনির কর্মচারী বিনোদকে ভালোবাসে। গল্পের শেষে কয়লা খনিতে আগুন লাগলে বিনোদ চুড়কীকে রক্ষা করতে চাইলে খনি বিজ্ঞানী হয়ে ওঠা অতুল বাধা দেয়। খনির আগুনে পুড়ে চুকড়ী মৃত্যুবরণ করে। অতুল বিনোদকে খনি থেকে সরিয়ে দেয়।

---

[১] **রণজিৎ গুহ,** একটি অসুরের কাহিনী, *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯১

Dhaka University Institutional Repository

চুড়কীর মতো প্রান্তিক শ্রেণির আত্মদানের মধ্যে দিয়ে অতুলের মতো সুবিধাভোগী খনি কর্মকর্তাদের ভাগ্য ও জীবিকার উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু চুড়কীর মতো প্রান্তনারী চরিত্রের জীবন ও জীবিকার মান একই রূপ থেকেছে। অতুলের মতো লোভী চরিত্র চুড়কীর মতো প্রান্তিক সাঁওতাল নারীদেরকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। মূলত শিল্প বিপ্লবের পর সাঁওতাল নারী পুরুষদের অনেকে কালিয়ারিতে যে কয়লা শ্রমিকরূপে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে তারই চিত্র পাওয়া যায় এ গল্পে।

'শিলাসন' গল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের একটি গ্রামের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রামে বসবাসরত সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত। এদের কেউ কুম্ভকার, কেউ সূত্রধর। এদের রয়েছে একজন মোড়ল। সে গল্পের অন্যতম চরিত্র সাঁওতাল পুরুষ কাঁদনের বাবা। গল্পটিতে রাঢ়ের প্রান্তিক জনচরিত্র সাঁওতালদের বিচিত্র সংস্কার সংস্কৃতি এবং বৃত্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই আদিবাসী সাঁওতালদের পেশা মাটির পাত্র ও পুতুল তৈরি করা এবং কাঠের কাজ করা। কেউ কেউ অবশ্য চাষ-আবাদ করে। তবে এটি শিল্পীর গ্রাম। সেই দেবতার কাল থেকে এরা শিল্পী। গল্পে অতিথি অমল চৌধুরীকে মোড়ল বলেছে–

আমরা মাটির পুতুল গড়ি, কাঠের কাজ করি, নকশা আঁকি, কিন্তু দেবতাকে তো আমরা জানি না। (৩/১৪৪)

বর্ণিল আচার-ধর্মে বিশ্বাসী নারী পুরুষের আচার আচরণ, ব্রত-সংস্কার, জীবন ও জীবিকার আকর্ষণীয় চিত্র সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়েছে গল্পটিতে।

'একটি প্রেমের গল্প' নামক ছোটগল্পে সাঁওতাল নারী ফুলমণির জীবন ও জীবিকার স্বতন্ত্র চিত্র রেখায়িত হয়ে উঠেছে। জীবনের বহুধা প্রয়োজনে এই সব অন্ত্যজ সাঁওতাল নারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশাকে জীবিকার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করেছে। সাঁওতাল নারী-পুরুষ কর্মঠ জাতি রূপে পরিচিত। পুরুষের চেয়ে নারীরা কাজে-কর্মে বেশি পারদর্শী। তারাশঙ্কর তাঁর রাঢ়দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এ সব প্রান্ত মানুষকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। এইসব আদিবাসী সাঁওতালদের জীবিকার প্রসঙ্গ তিনি তাঁর গল্পে মাটির শিল্পী হিসেবে জীবন্তপ্রায় করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর দায়বদ্ধতা তুলনাহীন। উক্ত গল্পে ফুলমণি সাঁওতাল কর্মজীবী নারী। গল্পকার তার জীবিকার বর্ণনায় লিখেছেন–

এখন খাটনি খেটে জীবিকা উপার্জন। কিছুদিন কলে খাটতে গিয়েছিল কিন্তু ফুলমণি পালিয়ে এসেছে। কলের মানুষগুলো– মিস্ত্রী, ফিটার থেকে খাজাঞ্চী সব উত্ত্যক্ত করত তাকে। বেশী উত্ত্যক্ত করত যে সব গরুর গাড়িওয়ালারা ধান চাল বয়ে আনে, নিয়ে যায় ইস্টিশনে, তারা। সে মাকে বলেছিল–তু কলে খাট। আমি ছুটো খেটে খাব। ঝুমনীকে নিয়ে খাটব। ফুলমণি মাটি বয়, চাষের সময় ধান পোঁতে, পৌষ মাসে ধান কাটে। (৩/৪৬২)

Dhaka University Institutional Repository

বীরভূম অঞ্চলে সাঁওতালদের বিচরণ ছিল অবাধ ও স্বাধীন। সাঁওতালরা পরিশ্রমী এবং কর্মঠ জাতি। বেঁটে-খাটো চেহারা এবং সবল দেহের অধিকারী এই অন্ত্যজ উপজাতি শ্রেণি রাঢ়ের অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণির মতো স্বতন্ত্র জীবন ও জীবিকায় অভ্যস্ত। 'প্রকৃতই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বীরভূম জেলায় রেল বাধাঁ ও রাস্তা তৈরি এবং চাষের প্রয়োজনে সাঁওতাল আগমনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ঐ সকল কাজে নিযুক্ত সাঁওতালদের অর্থনৈতিক উন্নতাবস্থা অন্যান্য স্থানের সাঁওতালদের আকৃষ্ট করেছিল বলে হান্টার জানিয়েছেন।'[১] তারাশঙ্করের গল্পে প্রান্তিক সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আনুভূমিক জীবন ও জীবিকার চিত্র শিল্পের সীমানাকে ছাড়িয়ে বাস্তবতার প্রান্তকে স্পর্শ করেছে।

রাঢ়ের প্রান্ত জন-চরিত্রের প্রতিদিনের জীবনের যে রঙ-রূপ তা মহৎ শিল্পী তারাশঙ্করের সাহিত্যিক কলমে দুরন্ত ভাষায় শঙ্কাহীন বর্ণনায় বেগবান স্রোতধারার মতো উৎসারিত হয়েছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাঢ়ের প্রান্ত জনজাতির যে জীবনকে তিনি এঁকেছেন তা বাস্তবতার মহৎ সত্যকে স্বীকরণ করে সর্বজনীন সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষ, সেই মানুষের জীবন এবং সে জীবনের ভেতর ও বাইরের বিচিত্র অনুষঙ্গ তাঁর গল্পের ভুবনকে করেছে পরিপ্লুত। ব্যক্তি তারাশঙ্কর ছোটগল্পে অন্ত্যজ জনসমষ্টির জীবন ও জীবিকার নান্দনিক রূপাঙ্কন করে সামষ্টিক চেতনার প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন। তাঁর গল্পে রাঢ়ের প্রান্তিক বেদে সম্প্রদোয়র পূর্ণাঙ্গ জীবন ও জীবিকার অভিন্ন অমার্জিত চিত্র বাণীরূপ লাভ করেছে। 'অন্ত্যজ মানুষের কথা তারাশঙ্করের সাহিত্যে সুপ্রচুর, তবু এর মধ্যে বেদিয়া- সম্প্রদায়, বিশেষত বেদেকন্যা বা বেদেনীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব যেন কিছু বেশি। ... সাপধরা, সর্পদংশনের ওষুধ বিক্রি, সাপ, বাঁদর, ছাগল প্রভৃতির খেলা দেখানো এদের জীবিকা।'[২] 'বেদেনী' ছোটগল্পে রাধিকা বেদেনী প্রান্তিক কৌম সমাজের শ্রেণিপ্রতিনিধি। বেদের মেয়ে রাধিকা শিবপদকে ছেড়ে শম্ভু বাজিকরকে গ্রহণ করে। গল্প শেষে সে শম্ভু বাজিকরকে ত্যাগ করে কিষ্টো বাজিকরের হাত ধরে রাতের অন্ধকারে অনিশ্চিত লোভনীয় জীবনের আকর্ষণে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাড়ি জমায়। অন্ত্যজ রাধিকার রূপ-যৌবনের মতো তার জীবিকার বৈচিত্র্যময় চিত্র তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর এ গল্পে:

এছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলাও আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটি বাঁদর আর গোটা কয়েক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে। (২/২৩৪)

---

[১] W. W. Hunter, *The Annails of Rural Bengal*, 1975, P.234.

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্ত্যজ বেদে জনচরিত্র সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতূহল ছিল সীমাহীন। 'সাপুড়িয়ারা বেদেদের একটি শ্রেণিরূপে পরিচিত। ... 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটিতে চার প্রকার বেদের বর্ণনা আছে–মেটেল, মাল, মাঝি ও বিষ বেদে। এর মধ্যে মাল বেদেরা সুপরিচিত। অন্যদের সংবাদ অপর কোন সূত্রে আমরা পাইনি। বিষবেদেরা সাপের বিষ নির্গত করে বৈদ্যের কাছে বিক্রি করে; গাছের শিকড়, লতা-পাতা প্রভৃতির সাহায্যে সর্পদংশিত ব্যক্তির চিকিৎসাও করে।'[১] তারাশঙ্করের গল্পে এই বেদিয়া দলের জীবিকার নানারূপ কৌশলের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। 'আমার কালের কথা'য় তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন- 'বেদিয়ারা আসত। দেশি বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে কাল কেউটে ধরত- গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদর নাচাত।'[২]

তারাশঙ্কর তাঁর 'সাপুড়ের গল্পে' বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার অপরিবর্তিত রূপ স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে দীপ্তিমান করে তুলেছেন–

সাপ নিয়ে যারা কারবার করে তারাই সাপুড়ে। সাপ নিয়ে কারবার অনেকেই করে–বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ প্রভৃতি।...খাঁটি এবং খাস সাপুড়ে যারা তাদের তো আর কথাই নাই। খাল বিলের কাছে পতিত প্রান্তরে সেই আরণ্যযুগের ঘর দুয়ারে বাস করে। ...গ্রামে আসে, ভিক্ষে করে, সাপ নাচায়–মানুষের সঙ্গে হাসি-খুশিতে বাঁশির সুরে সাপের হেলে দুলে নাচার মত মনোরম ভঙ্গিতে মন রেখে কথা বলে। আবার খোঁচা খেলেই ছপ করে ছোবল মারতে চেষ্টা করে এবং দিনের বেলা ক্ষুধার জ্বালায় বেরিয়ে পড়ে সাপের মতো। যত শিগগির পারে ভিক্ষের ঝুলি বোঝায় করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে চলে যায় ডেরার দিকে। ডেরা ওরা ঘরের ভেতরে কিছুতেই বাঁধবেনা। বাঁধবে বাইরে হয় আমবাগানে নয় বটতলায়। (৩/৩৬০)

বেদেদের জীবিকা তাদের স্বভাবেরই অনুরূপ। বেদেরা যাযাবর জাতি। কোন নির্দিষ্ট স্থানে তারা আজন্ম শেকড় ছড়িয়ে বসবাস করে না। 'সত্যকার বেদের দলে থাকত তাঁবু, গরুর গাড়ি, মোষ, ঘোড়া, কুকুর। নারী পুরুষ মিলে ৫০/৬০ থেকে ৪/৫ শো লোক এদের। বর্বর বেদেরা একফালি নেংটি পরা, কালো দেহ, পায়ে হেঁটে বীরভূমে আসত গরু মহিষ হিংস্র কুকুরসহ, গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত। শিকার করত বিভিন্ন পশু–সজারু, খরগোশ, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল। এদের মেয়েরা গ্রামে দুপুরে ভিক্ষা করত।

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮

[২] সনৎ কুমার গুপ্ত (সম্পা), *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা* (১ম খণ্ড), আমার কালের কথা, ১৩৮৭, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

Dhaka University Institutional Repository

মাটির ঝুমঝুমি ও খেজুরপাতায় বোনা থলে বিক্রি করত।'[১] রাঢ়ের মৃত্তিকা আশ্রিত প্রান্তিক বেদে জনজাতির জীবিকার নির্মেদ বর্ণনা তাঁর ছোটগল্পে ছড়িয়ে দিয়েছে ভিন্নতার সুবাতাস।

কালোত্তীর্ণ শিল্পী তারাশঙ্কর নিজেকে রাঢ় ভূমির একজন সেবক বলে মনে করতেন। তাঁর স্বপ্ন ও বাস্তবের পৃথিবীতে রাঢ়ের মানুষের বিশেষত এই প্রান্ত মানুষের আনাগোনা ছিল নিত্য। তিনি সামন্তকুলগর্বের উত্তরাধিকার হলেও রাঢ়ের প্রান্তিক চরিত্র তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। এদের জীবন-জীবিকা স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতিকেই তিনি তাঁর লেখনীর মূল উপাদান বিবেচনা করেছেন। তাঁর গল্পে প্রান্তিক মানুষ তাই সহচরিত্র হিসেবে নয়, কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে গল্পের মূল কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে প্রান্তিক সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণিজীবী মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। বাউরি সম্প্রদায় এদের মধ্যে একটা বিশেষস্থান অধিকার করে রয়েছে। বাউরিরা বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং বিশেষত পুরুলিয়ার আদিবাসী হিসেবে পরিচিত হলেও রাঢ়ের প্রান্তিক সমাজে তাদের সরব উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। জীবিকার দিক থেকে কৃষিকাজের সাথে অন্ত্যজ বাউরিদের একটা নিবিড় যোগসূত্র ছিল। 'বাউরীরা সাধারণত জমি ক্ষেত-খামারের কাজ করে। শীর্ণ, ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ অপটু শরীর। বাউরীদের মেয়েরা গৃহস্থবাড়িতে কাজকর্ম করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে।'[২]

'ট্যারা' গল্পে বাউরি সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রসঙ্গ এসেছে। নয়ান বাউরির সন্তান। তার ছেলে ট্যারা বাউরিকে নিয়ে এই গল্পের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। বাউরিদের জীবিকার কথা উল্লেখ করে লেখক এ গল্পে লিখেছেন-

নয়ান খাটে দিনমজুর। নয়ানের বউ, সেও গৃহস্থ বাড়িতে খাটে–বাসন মাজে, ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাচে, ঢেঁকিতে ধান ভানে। ছোট্ট ট্যারা অদূরস্থ গাঁজা-আফিমের দোকানের সম্মুখে সারাটা দিনমান গুলিদাঁড় খেলে।' (১/৩১৫)

ট্যারা এক পর্যায়ে স্থানীয় দেবীর পীঠস্থানে গরু দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত হয়। সেখান থেকে চুরির অভিযোগে সে নিরুদ্দিষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে সে সন্ন্যাসব্রত ধারণ করে স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন করে। জীবনের নির্মম প্রয়োজনে বাউরি সন্তান ট্যারা এ গল্পে ভিন্নতর জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৪

[২] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-০৩

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতীক্ষা' গল্পে বাউরি নারী পরীর কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণবর্ণের এই পরী বাউরি-কন্যা হলেও সে বিলাসিনী নারী। জীবিকার জন্যে সে অন্যের মুখাপেক্ষী নয়। দিনমজুরি করে সে প্রতিদিন ছয় থেকে আট আনা উপার্জন করে। লেখক তার বিলাসিনী জীবন ও জীবিকার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন–

পরী গালে টপ করিয়া আলগোছে একটা পান ফেলিয়া চওড়া লাল পেড়ে মিহি শাড়িখানি পরিয়া ঝুড়ি-কাঁখে রাজমিস্ত্রি গণি মিঞার কাছে রোজ খাটিতে যায়। থাকবন্দী ইট মাথায় অবলীলাক্রমে মই বাহিয়া উঠিতে উঠিতে গান গায়। (১/৫৭১)

রাঢ়ের বাউরি সম্প্রদায় সুনির্দিষ্ট কোন পেশাকে জীবিকা হিসেবে অবলম্বন করেনি। জীবনের তাগিদে তারা নানা রকমের কাজকে জীবিকারূপে বেছে নিয়েছে। এমনিতেই বাউরিদের নির্দিষ্ট কোন জীবিকার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে পশুপালন ও কৃষিকাজকেই তারা বিভিন্ন সময়ে জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করেছে।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে যে সমস্ত পেশা বা বৃত্তিকে অন্ত্যজ মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমরূপে সুচিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে কৃষিকাজ অন্যতম। শাসন ও শোষণের শিকার রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণির অনেকেই কৃষিকাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সদগোপ, বাগদি হতে শুরু করে ডোম, বাউরি, সাঁওতালদের উত্তরপুরুষের অনেকেই তাদের স্বীয় বৃত্তি পরিবর্তন করে কৃষিকাজকেই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে। সমাজে পেশা হিসেবে কৃষিকে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা কিছুটা শিথিল থাকায় রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় জনজাতির কাছে এই বৃত্তি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে তাই এ পেশায় নানা প্রান্তিক শ্রেণিচরিত্রের অনুপ্রবেশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কৃষিকাজকে অবলম্বন করে রাঢ়ের প্রান্ত জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ জীবিকা নির্বাহ করত।'অন্যদিকে ১৯৫১ সালের পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাসে বীরভূমের তপশিলি জাতির কৃষিজীবিতার পরিসংখ্যানে দেখা যায়: ভূমি মালিক কৃষক ৪৬,৬৫৮, ভূমিহীন ও তাদের নির্ভরশীল ৫১০২২ এবং ভূমিহীন শ্রমিক ও তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ১,৫৬,৭২৬ জন। কৃষিভিত্তিক ভাড়া কাজে নিযুক্ত অন্যান্য ৫৪৪ জন।'[১] এই রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষিকাজে কৃষক ছাড়াও নানা শ্রেণির প্রান্তিক মানুষের সম্পৃক্ততার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'অর্থাৎ বাগদি, বাউরি, বেদে, ভুঁইমালী, চামার; ধোবা, ডোমা, হাড়ি, জেলে, কৈবর্ত, মালো, কোচ, মুচি, মেথর, নমশূদ্র, পাটনি, শুঁড়ি প্রভৃতি তপশিলি জাতির এক বৃহৎ অংশ যে কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড যথা কৃষক, কৃষিমজুর ও অন্যান্য শ্রমিকবৃত্তিতে নিযুক্ত এ সত্য উন্মোচিত হয় এ তথ্য থেকে।'[২] কৃষি জীবিকা নির্বাহের সহজ মাধ্যম হওয়াতে রাঢ়ের বিভিন্ন

---

[১] State Table Vi, Census 1951, West Bengal, *The Tribes and Castes of West Bengal*, 1953, P.119

[২] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবনের তাগিদে সংকটময় মুহূর্তে কৃষিকেই জীবিকার অন্যতম উৎস রূপে গ্রহণ করেছে।

কৃষিকাজ বীরভূমের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আদিম পেশা। একাজে রাঢ়ের বিভিন্ন প্রান্তিক শ্রেণির সহাবস্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাউরি-বাগদি সদগোপ, সাঁওতাল পরগণা থেকে আসা আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জনজাতি বিভিন্ন সময়ে কৃষিকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে। বীরভূমে কৃষিতে শ্রম দিয়ে মজুরির বিনিময়ে যারা কাজ করত তারা কৃষিমজুর বলে বিবেচিত হত। এদের মধ্যে দুটি শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়: মহিন্দার ও কৃষাণ। বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যবিত্তের গৃহে সারা বছরের কৃষিকাজের জন্য নিযুক্ত ভৃত্যকে বলা হত মাহিন্দার। আর যারা চাষাবাদের সময়ে নিজের শ্রমের বিনিময়ে ফসল উৎপাদনে জমির মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হত তাদেরকে বলা হত কৃষাণ। এদের নিজস্ব কোন ভূমি ছিল না। এরা ভূমি শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। এবং শ্রমের বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী এরা উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের একভাগ মজুরি হিসেবে পেত। 'স্রোতের কুটো' গল্পে কৃষিকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহের চিত্র ফুটে উঠেছে। কৃষক হরি কোনাইয়ের দুই সন্তান রাখাল কোনাই ও গোপাল কোনাই। পিতার মতো কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল কোনাই কৃষিকেই জীবিকার বাহন হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু পিতা হরি কোনাইয়ের মতো তাকেও জমিদারের কূটকৌশলের কাছে পরাজিত হতে হয়েছে। কৃষক হরি কোনাইয়ের জীবন ও জীবিকার বর্ণনায় গল্পকার বলেছেন–

হরি কোনাই যে ফসলটা ঘরে তুলত, তার ষোল আনাই মহাজনের সুদের টানে, আর জমিদারের বাকী খাজনা দিতে চলে যেত...ফসল উঠাবার মাসখানেক আগে থেকেই মহাজন নালিশের একটা খসড়া-আর্জির মুসাবিদা তাকে ডেকে শুনিয়ে দিতেন; আর জমিদার মাঠের 'কয়াল' ডেকে মায় সুদ খাজনার মত ফসল বিক্রি করাতে বাধ্য করতেন। (১/০১)

তারাশঙ্কর 'কালাপাহাড়' ছোট গল্পে গ্রামীণ কৃষি নির্ভর জীবন ও জীবিকার এক ভিন্নতর রূপ অঙ্কন করেছেন। তারাশঙ্করের বেশকিছু ছোটগল্পে ভূ-কেন্দ্রিক কৃষিব্যবস্থায় সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের উল্লেখ রয়েছে। তবে এরা অর্থনৈতিক শ্রেণিবিচারে সমাজের অভিজাত শ্রেণি নয়। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা ভূমি-মালিক শ্রেণি হিসেবে বিবেচ্য। 'কালা পাহাড়' গল্পে রংলাল এ রকমই একজন অবস্থাপন্ন কৃষক। কৃষিই তার জীবিকার উৎস। তার পরিবার কৃষক পরিবার। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে সে সরাসরি সম্পৃক্ত। গল্পকার তার বর্ণনায় লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণির। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম। যেমন বলশালী প্রকাণ্ড তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত- কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখন অবশিষ্ট রাখে না। (১/৮৫)

চাষী রংলালের গরু কেনার প্রতি একটা প্রচণ্ড শখ লক্ষ করা যায়। চাষের জন্য এই গরু ক্রয় করা নিয়ে পুত্র যশোদার সাথে তার এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে। এরপরেও রংলাল হাটে যায় গরু ক্রয় করতে। কিন্তু গরু ক্রয়ের বদলে সে একজোড়া মহিষ ক্রয় করে আনে। যার একটির নাম কুম্ভকর্ণ এবং অন্যটির নাম কালাপাহাড়। বছর তিনেক পরে নদীতীরে একদিন বাঘের আক্রমণে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু ঘটে। এরপর রংলাল কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দেয়। গল্পের শেষের দিকে কালাপাহাড় পিচঢালা রাস্তায় শহুরে এক বাবুর বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে। রংলাল মহিষ দুটোকে তার কৃষি জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত করেছে। এই মহিষ দুটিকে সে তার জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছে।

রাঢ়ের কৃষিসমাজব্যবস্থায় জীবন ও জীবিকার এক ভিন্নতর রূপ এ গল্পে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনে মহিষ যেখানে জীবিকার উৎসরূপে বিবেচ্য হয়, সেখানে এ গল্পের পরিণতিতে এই প্রাণীর মধ্যে মানবিকতা আরোপিত হয়েছে। 'কালাপাহাড়' গল্পটি বাংলাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। প্রান্তিক কৃষি জীবন ব্যবস্থায় জীবিকা নির্বাহের এক ভিন্নতর চিত্র প্রতিস্থাপিত হয়েছে উক্ত গল্পে।

'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে মুকুন্দপাল অবস্থাশালী কৃষক। তার নিজস্ব জমা-জমি রয়েছে। কৃষিকাজই তার জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। তবে সে বর্ণবৈশিষ্ট্যের বিচারে বা পেশাগত দিক বিবেচনায় উচ্চবর্ণের মধ্যে পড়ে না। কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভূমিহীন দিনমজুরকে নিযুক্ত করে। এ গল্পে ভূমিহীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ মানুষগুলির কৃষিজমিতে দিনমজুরি পেশায় সম্পৃক্ত থাকার ব্যাপারটি ফুটে উঠেছে। গল্পকার এই ভূমি শ্রমিকদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

গাঁয়ের বাগদী কাহার মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতিবছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আঁকাড়া হলে সেবার দল বেঁধে চ'লে যায়, অজন্মা না হলেও দু-ঘর এক-ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউ বা ফেরে এক পুরুষ পর। (২/৪৯৫)

কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার সাথে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তিক জাতি–বর্ণের মানুষের সংযোগের চিত্র এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্রও ফুটে উঠেছে এ গল্পে। অভাবের তাড়নায় গ্রামের অন্ত্যজ সম্প্রদায় শহরে পাড়ি জমিয়েছে। পৌষ মাসে জমি থেকে ফসল কেটে মাড়াই করে ঘরে তোলার কাজে

Dhaka University Institutional Repository

এইসব অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভূমি শ্রমিকরূপে কাজে নিযুক্ত হয়। দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রামে এদের অনুপস্থিতি মুকুন্দপালকে চিন্তিত করে তোলে–

গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরণ রঙ ধ'রে এসেছে। ওই ধানই জীয়নকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে, নইলে মরণ–অবধারিত মরণ, তাতে আর কারও কোন সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগদী কাহার মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে দুমকা থেকে সাঁওতালের দল। (২/৪৯৫)

রাঢ়ের অবিসংবাদী কথাকার তারাশঙ্কর তাঁর 'মাটি' গল্পে কৃষক জীওনলালের জীবন ও জীবিকার উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। জীওনলালের পিতা রতনলাল পাটনা জেলার গঙ্গাতীরের কাছে একটা গ্রামের কৃষক ছিলেন। তারই সন্তান জীওনলাল ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এক সময় নানা চড়াই উৎরায়ের মধ্য দিয়ে নাগরিক কলকাতার মাটিওয়ালা হয়ে যায়। ভাগ্যের নির্মম বিড়ম্বনা এবং জীবিকার দুঃসহ তাগাদা তাকে কলকাতার মাটিওয়ালা করে তোলে। জীওনলালের পিতা রতনলালের জমিতে কিষাণমজুর হিসেবে কাজ করত অকলু মুসহর। তার কন্যা লছমনিয়াকে ভালবেসেছে জীওনলাল। জীওনলাল তার জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছে–

মুসহরের বেটি লছমনিয়ার যে গাঁয়ে বাড়ি–ওই একই গাঁয়ে রতনলাল নামে একজন খুব ভাল লোক ছিল। ... গরীব গৃহস্থী; ঘরে দু'তিনটে গাই ছিল–একটা ভাঁইসা ছিল, একজোড়া বয়েল ছিল, আর গঙ্গাজীর কিনারায় পাঁচ বিঘা ক্ষেত। তারই ছেলে আমি–আমার নাম 'জীওনলাল'; অই অকলু মুসহরকে বিটীয়া–লছমনিয়া আমার নাম দিয়েছিল–মেওয়ালাল। অকলু মুসহর আমার বাপের ক্ষেতিতে কাম করত–কিষাণ মজদুর ছিল। গাই, মহিষ, বয়েলের সেবা করত ওর বেটী। ... পাটকাম করত, ঝুঁটাবর্তন মলাই করত। (৩/৭২)

পিতার মৃত্যুর পরে জমি জীওনলালের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। তার জমি জাহাজ কোম্পানি বন্দোবস্ত করে নেয়। এবং সেখানে স্টেশন তৈরির কাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে জীওনলাল জেলে যায়। জেল হতে মুক্ত হয়ে সে লছমনিয়াকে খুঁজে পায়। কিন্তু লাছমনিয়া তখন সন্তান পাওয়ার সুখে বিভোর। জীওনলাল জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে আসে এবং মা গঙ্গার বুকে সে তার হারানো মাটিকে আবার খুঁজে পায়–

ঠিক আমার ক্ষেতির মাটি। কি মনে হল–তুলে নিলাম খানিকটা মাটি, দু'হাতে ঘাঁটলাম পিষলাম, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুকলাম। মনে হল অবিকল সেই মাটি। দু'হাত ভরে মাটি আমি তাল বেঁধে তুলে নিলাম। (৩/৮৫)

সেই থেকে জীওনলাল হয়ে যায় কলকাতার মাটিওয়ালা মেওয়ালাল। জীওনলাল তার জীবন ও জীবিকার কথা গল্পকারের কাছে বলছে-

Dhaka University Institutional Repository

বাবুজী এই শুরু হয়ে গেল আমার ব্যবসা। গঙ্গাজী আমার গচ্ছিত ধন আমাকে দিয়েই চলেছেন। আমি তাই নিয়ে বেচি আর খাই। খেয়ে-দেয়েও বাঁচে বাবুজী। তাই থেকে দশটি করে টাকা আমি লছমনিয়াকে ভেজে দিই। লছমনিয়া–পেয়েছে তার ছেলেকে–আমার তো মুসহরের বেটীই সব। ওকে পাঠিয়েও আমার থাকে। যা থাকছে–তাও সব মরবার আগে মুসহরের বিটীয়াকে পাঠিয়ে দেব। (৩/৮৫)

জীওনলাল জীবনের কাছে পরাজিত হয়নি, না পাওয়ার কষ্টকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জীবিকা নির্বাহের জন্য উদ্ভাবন করেছে ভিন্নতর এক পন্থা। আর এ কারণেই কৃষক জীওনলাল নবতর পরিচয়ে হয়ে উঠেছে নগর কলকাতার মাটি বিক্রেতা প্রান্তিক চরিত্র মেওয়ালাল। 'মাটি' গল্পের নায়ক জীওনলাল মাট্টিওলা শিল্পী তারাশঙ্করের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ... জীওনলালের দেহই শুধু নয়, তার জীবনও গঙ্গা মৃত্তিকায় গড়া। জীওনলাল গঙ্গার সন্তান–গাঙ্গেয়।.. ভারতের মাটিতে সে জীবন পেয়েছে। ভারতের মাটিতেই পেয়েছে তার প্রেমকে। ভারতের প্রাণপ্রবাহিনী গঙ্গাধারা থেকে সে মাটির উদ্ভব।'[১] মৃত্তিকার সন্তান জীওনলাল যে মাটিকে হারিয়েছিল সেই মাটিই আবার তার জীবনে জীবিকার উৎস হয়ে ফিরে এসেছে। কৃষকপুত্র জীওনলালের বৃত্তির রূপান্তর ঘটলেও কৃষির মূল উপাদান মাটিকে কেন্দ্র করেই তার জীবিকা আবর্তিত হয়েছে।

বীরভূমকেন্দ্রিক রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকেই কৃষিকে তাদের জীবিকার মৌল উৎসরূপে গ্রহণ করেছে এবং রাঢ় সমাজকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামোতে কৃষি-অর্থনীতির একটা ব্যাপক প্রভাব এ অঞ্চলে বিস্তৃত । তবে এ অর্থনীতিচক্রে বেশি লাভবান হয়েছে জমিদার, পাওনাদার, মহাজন দরপত্তনীদারদের মতো মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ় বাংলায় প্রান্তিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকার বহুমুখী চিত্র প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয় নিংড়ানো আবেগে প্রতিস্থাপিত করেছেন। 'হিন্দু তান্ত্রিক সাধনা ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন-পদ্ধতি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার রাধাকৃষ্ণভিত্তিক বৈষ্ণব ধর্মের মর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। মর্ত্যমানব–মানবীতে রাধা ও কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব আরোপ করে দেহমনের দ্বারা সহজানন্দ লাভ তাঁদের লক্ষ্য। ... সহজ ধর্মবোধের জন্য তারা সকলেই ক্রমে সহজিয়া বৈষ্ণব পরিচয় লাভ করে।'[২] রাঢ়ের প্রান্তজনদের কীর্তন, ভজন, রাধা-কৃষ্ণের স্তুতিমূলক বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। রাঢ়ের এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে

---

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারত শিল্পী তারাশঙ্কর, *শনিবারের চিঠি*, (তারাশঙ্কর সংখ্যা), রঞ্জনকুমার দাস (সম্পা), ১ম সংস্করণ জুলাই, ১৯৯৮, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 'এদের মধ্যে বাউল, জগন্মোহনী, কর্তাভজা, কিশোরিভজন, সাহেবধনি এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা অধিকতর বেশি শোনা যায়. বিশেষ করে কর্তাভজা সম্প্রদায় তার সর্বধর্ম সমন্বয়বাদিতার জন্য উনিশ শতকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আর বিংশ শতাব্দীতে ফেস্টিভাল অব ইন্ডিয়ার দৌলতে বাউল সম্প্রদায় তো সাংস্কৃতিক আশীর্বাদ-ধন্য হয়ে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই ধরনের বেশিরভাগ সম্প্রদায়গুলিকে মোটামুটিভাবে বৈষ্ণব বা আধা বৈষ্ণব শ্রেণিভুক্ত করা হয়, তবে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাই এগুলিকে 'অপ্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের' মর্যাদা দান করে। সাধারণভাবে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছাড়াও পর্যবেক্ষকেরা এগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া চিন্তাধারা, বাম, তান্ত্রিক প্রথা, নাথপন্থী ধর্মমত, সুফি মতবাদ এবং নিম্ন বর্ণের ধর্ম সম্প্রদায়ের উপদেশগত ও রীতিনীতিগত প্রভাব লক্ষ করেছেন।[১] রাঢ় হচ্ছে বৈষ্ণবের দেশ। এখানকার প্রকৃতির রুক্ষতা মানুষকে যেমন কঠোর করে তেমনি বৈষ্ণব সঙ্গীত ভজন, দর্শন অজয়, দামোদর প্লাবিত রাঢ়ের মানুষের মনকে ভাবাবেগে আপ্লুত করে। এখানে প্রান্তিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় কখনো আশ্রম দেখাশোনা করার কাজ করে আবার কখনো বা গেরুয়া পাগড়ি মাথায় পেঁচিয়ে দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে ভিক্ষে মেগে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

'রসকলি' গল্পটিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। এ গল্পে পুলিন ভালোবাসে মঞ্জরীকে, কিন্তু পুলিনের খুড়ো রমাদাস পুলিনকে বিয়ে দেয় গোপিনী নামক এক বৈষ্ণবীর সঙ্গে। এরপর পুলিন ও মঞ্জরীর প্রেম আরো বেগবান হয়। মঞ্জরী নিজেকে রাধা এবং পুলিনকে ভাবে কৃষ্ণ। তাই মঞ্জরীর লোক-লজ্জার ভয় নেই। সে রসোচ্ছলা নারী। তার আবেদনময় চেহারা দেখে গাঁয়ের জমিদারেরও চোখে নেশা ধরে যায়। মঞ্জরী রাত বিরাতের ভয় করে না। একাকী নির্ভীকভাবে সে চলাফেরা করে। তার মা সৌরভী ধোপার মেয়ে ছিল, পরে ভেক ধরে বৈষ্ণবী হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলে দুই ধরনের বৈষ্ণবের দেখা পাওয়া যায়। জাত বৈষ্ণব এবং ভেকধারী বৈষ্ণব। 'জাত বোষ্টমি' পুরুষানুক্রমিক বৈষ্ণব, গৃহস্থের মতো ঘর বেঁধে সৎজাতি গৃহস্থের আচার মেনে চলে। ... ভেকধারী বৈষ্ণবেরা বিচ্ছেদ কিংবা বিধবা হলেই নতুন বৈষ্ণবের গলায় মালা, ললাটে চন্দন পরিয়ে মালাচন্দন করে।'[২] মঞ্জরীকে নিয়ে গ্রামে নানাজন নানা কথা বলেছে। কিন্তু

---

[১] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০

[২] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্জরী রাধার প্রেমে গরবিনী নারী। তাই সে কণ্ঠে গান নিয়ে গ্রাম ছেড়ে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে। গান তার জীবিকারই বাহন। সে গান গেয়ে বলেছে-

লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
সখি সেই গরবে আমি গরবিনী-গো,
আমি গরবিনী। (১/৪১)

এ গল্পে বৈষ্ণবজীবনে মাধুকরী বৃত্তিকেই বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রমাদাস মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেই অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং পুলিনও এই বৃত্তি গ্রহণ করেই জীবিকা নির্বাহ করতে চেয়েছে, যখন তার স্ত্রী গোপিনীকে রমাদাস সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। গল্প শেষে মঞ্জরীও গানকে জীবিকার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে একাকী পথে বের হয়েছে।

'রাইকমল' গল্পে বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব পটত হয়েছে। গল্পটিতে কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হরি মোড়লের পুত্র রঞ্জন ভালবেসেছে বৈষ্ণবী কামিনীর কন্যা কমলিনীকে। রাঢ়ের বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীরা খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ গল্পে কামিনী গান গেয়ে মাধুকরী বৃত্তির মাধ্যমে জীবন ধারণ করেছে। গল্পটিতে রসিকদাস নামক এক বৈষ্ণবের কথা বলা হয়েছে। সে আখড়ার মহন্ত। আখড়া দেখাশোনা করে, ভক্তদের সেবা করে, ভক্তদের দেয়া উপঢৌকনের মাধ্যমে কখনো বা মাধুকরীবৃত্তি করে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। গল্পটিতে অবস্থানের বৈষম্যের কারণে হরি মোড়ল তার ছেলে রঞ্জনকে বৈষ্ণবীর মেয়ে কমলিনীর সাথে বিবাহ দিতে সম্মত হয়নি। এই গল্পটিতে কামিনী বৈষ্ণবী ভিক্ষাবৃত্তি করেই জীবিকার সংস্থান করেছে।

'রাধারাণী' গল্পটি বৈষ্ণবীয় ভাবলীলাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবরা অনেক সময় গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করত। রাঢ়-বাংলার প্রান্তস্পর্শী এই সমস্ত অন্ত্যজ গোষ্ঠীর জীবিকা ছিল বৈচিত্র্যময়। গল্পটিতে কৃষ্ণযাত্রার প্রসঙ্গ এসেছে। এ গল্পে গৌরদাস নামক একটি ছেলের কথা বলা হয়েছে। সে কৃষ্ণযাত্রায় রাধার ভূমিকায় অভিনয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। ছেলেটির মা ছিল বারাঙ্গনা। গৌরদাস যাত্রাদলের অধিকারীর কাছে মানুষ। অধিকারী তাকে বৈষ্ণব করে নিতে চেয়েছে। গৌরদাস বাবাজীর মেয়ে রাধারাণীকে ভালবাসে, কিন্তু রাধুর বাবা জাত বৈষ্ণব। এজন্যে সে এই ভালবাসাকে মেনে নেয়নি। সে বলেছে-

আমরা জাত বৈষ্ণব ভেকধারী নই। (২/১৬৮)

রাঢ়ের জাত বৈষ্ণবরা ভেকধারী বৈষ্ণবদের চেয়ে শ্রেণিগত অবস্থার দিক থেকে সর্বদা উপরে অবস্থান করত। ভেকধারী বৈষ্ণবরা জাতিতে বৈষ্ণব নয়। বৈষ্ণব ধর্মে তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে দীক্ষা লাভ করে। আর এ

Dhaka University Institutional Repository

কারণে গৌরদাসের শ্রেণি অবস্থান বিবেচনা করে বাবাজী তার কন্যাকে গৌরদাসের সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হননি।

রাঢ় বাংলায় বৈষ্ণবরা সুদীর্ঘকাল ধরে খোল করতাল খঞ্জনি বাজিয়ে গান করে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা আহরণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। বৈষ্ণবরা রাঢ়ের প্রান্তিক শ্রেণি বলে বিবেচ্য। এরা সমাজে কারো অধীনতাকে পছন্দ করেনি। তাই অনেক সময় এরা কেন্দ্রাশ্রিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো গান গেয়ে, কখনো মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। এরা জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে সকল মানুষকে সমানভাবে ভালবাসত। এদের জীবনে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক এবং বৈধ। এরা সব শ্রেণি–পেশার মানুষের হাতে অন্ন-জল খেত। অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী এইসব বৈষ্ণবের জীবনের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাও ছিল সীমিত।

রাঢ়ের জনসমাজের প্রান্তিক স্তরে রয়েছে বিবিধ শ্রেণি ও পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। সুপ্রাচীনকাল থেকে অন্ত্যজ এই জাতিগোষ্ঠী মূল সমাজব্যবস্থা থেকে পৃথক থেকেছে এবং সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষগুলোর কাছে তারা অস্পৃশ্য জনজাতি বলে পরিগণিত হয়েছে। রাঢ়ের এই প্রান্ত সমাজে চণ্ডাল শ্রেণি অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণির সঙ্গে সহাবস্থান করত। বর্ণবৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের পেশাও সুনির্দিষ্ট ছিল। 'গৌতম ধর্মসূত্র (৪/১৫,৪/২০)অনুযায়ী শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারী প্রতিলোম সংকর চণ্ডাল বলে গণ্য হয়। ... এরা অতি নিম্ন পর্যায়ের জাতি যাদের সম্পর্কে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (২/১/২/৮–৯) বলা হয়েছে যে তাদের স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে, কথা বললে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলে শুদ্ধ হতে হবে এবং চোখে দেখলে সূর্য, চন্দ্র অথবা তারকাদের দেখে চোখ পবিত্র করতে হবে। মনু (১০/৩৬,১০/৫১) অন্ধ্র, মেদ, চণ্ডাল ও স্বপচদের বাসস্থান গ্রামের বাইরে নির্দিষ্ট করেছেন, এবং অন্ত্যাবসায়ীদের (১০/৩৯) বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছেন শ্মশানের কাছাকাছি।'[১] চণ্ডালরা শ্মশানে শবদাহ করার মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে সময়ের প্রয়োজনে ও জীবিকার তাগিদে তারা কখনো কখনো ভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়ের অন্ত্যজ চণ্ডালদের প্রসঙ্গ এনেছেন। 'সন্ধ্যামণি' গল্পটিতে পৈরু জাতিতে চণ্ডাল। সে মৃতদেহ সৎকার করে। বংশানুক্রমিকভাবে এই কাজকেই সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। গল্পে কেনারাম চাটুজ্জে আর কুসম দম্পত্তির তিন চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণিকে সে পুড়িয়েছে। কোনারাম চাটুজ্জে যখন শ্মশানে মৃতদেহ

[১] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা*, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

সৎকারের কাজে পৈরুকে সাহায্য করতে চেয়েছে তখন সে নিজ বৃত্তির কথা উল্লেখ করে কেনারাম চাটুজ্জকে বলেছে–

নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম।

হামার পাপ হোবে দেওতা। (১/২২২)

পৈরু মৃতদেহ সৎকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। সে অন্ত্যজ চণ্ডাল শ্রেণিভুক্ত, মৃতদেহ সৎকারের কাজকেই সে তার পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই ব্রাহ্মণ কেনারাম চাটুজ্জে এ কাজ করতে চাইলে সে বলেছে তার পাপ হবে।

'পাটনী' গল্পে চণ্ডাল শ্রেণির প্রসঙ্গ এসেছে। শিল্প বিপ্লব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধানকল, পাটকল, চিনিকলসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা গড়ে ওঠে। এই সমস্ত কলকারখানাতে বিভিন্ন প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান হয়েছে। 'পাটনী' গল্পে চণ্ডাল জাতিগোষ্ঠীর অনেকেই স্থানীয় ধানের কলে মজুর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। এই গল্পে লেখক যে চণ্ডাল শ্রেণির পল্লির কথা বলেছেন এরাই পাটনি বলে বিবেচিত। গঙ্গার ধারে শ্মশানভূমির কাছাকাছি এই সম্প্রদায় বাস করে। এদের সর্দার মৃতদেহ সৎকার করে এবং এরা অনেকেই ধানকলের শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণিও এদের সাথে ধানকলে শ্রমিকরূপে কাজ করে। লেখকের বর্ণনায় পাটনিদের জীবিকার স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে এভাবে–

মজুরদের মধ্যে ওই পাটনীরাই প্রধান। আদিকালে মা-গঙ্গা যে পাটনীকে বাঁচিয়েছিলেন, তার বংশাবলীতে এখন বেশ একটি গ্রাম গড়ে উঠেছে। ঘর পঞ্চাশেক পাটনী পরিবারের পুরুষের সংখ্যা একশো'র বেশি মেয়েদের সংখ্যা আরো বেশি, অল্প বয়সী অর্থাৎ দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলে মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়; এরাও খাটতে যায় কলে। পাটনীদের ছাড়া আরও বাউরী মজুর আছে, কিছু সাঁওতাল, কিছু রাঢ়ের বাউরী, হাড়ী। (৩/২৮)

পাটনিরা সৎকার করে এবং মৃতদের আত্মীয়ের কাছ থেকে দক্ষিণা গ্রহণ করে। পাটনিদের বিভিন্ন কলকারখানায় মজুরের কাজ করতে দেখে লেখক বিস্মিত হয়েছেন। প্রয়োজনের তাগিদে পাটনিরা তাদের স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করে ভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছে। আর এ কারণেই তারা কলকারখানায় মজুরের কাজকে বেছে নিয়েছে। পাটনিদের সর্দার কপিল তাদের জীবিকা উপার্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখককে বলেছেন-

জমিদারের জমি, তার দরুন আধা বখরা তাঁর। তাঁর আবার গোমস্তা আছে, হিসেব রাখে, কোথাকার পারের যাত্রী, কি বৃত্তান্ত তার দরুণ দু আনা সে বেটার। বাকী ছ আনা থাকে, তার আদ্ধেক পাবে শ্মশানের দণ্ডধারী, আর আদ্ধেক পাবে যার যেদিন পালা সে। বাকী লোকের হবে কি ? খাবে কি? তোমরা বাবুলোকেরা এমনই বটে। পাটনী মজুর খাটে। (৩/২৯)

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের প্রান্তিক শ্রেণির অধিকাংশই তাদের পূর্বপুরুষদের পেশা বা বৃত্তিকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে জীবনের নিষ্ঠুর প্রয়োজনে, সময়ের পরিক্রমায় অন্ত্যজ শ্রেণি পেশাবদল করেছে। শিল্পায়নের ফলে এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকেই জীবন ও জীবিকার তাগিদে বৃত্তি পরিবর্তন করেছে। অন্ত্যজ চণ্ডাল শ্রেণির মধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

বীরভূম গল্পকার তারাশঙ্করকে দিয়েছিল নবতর জীবনের স্বাদ; আর রাঢ়ের মৃত্তিকা ভূ-প্রকৃতি, অন্তে বাসী মানুষের কৌতূহলোদ্দীপক জীবনাচার, তাদের জন্মাশ্রিত আচার, রীতি-নীতি, তাদের বোহেমিয়ান সংস্কৃতি তাকে দান করেছিল সাহিত্যিক উপলব্ধি। রাঢ়-ই তাঁর অনুবিশ্ব। রাঢ়ের সন্তান তারাশঙ্কর রাঢ়কে দেখেছেন সৃষ্টিকর্মার মতো সর্বজ্ঞ দৃষ্টির পরিসীমায়। রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতি এই দৃষ্টির মূলবিন্দু হয়ে ধরা দিয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পগুলিতে রাঢ়ের যাযাবর ও বাজিকর সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'বীরভূমের আদিম কৌম সমাজ চূড়ান্ত গ্রামীণতাকে ধারণ করে যাযাবর সমাজের জনগোষ্ঠীকে লালন করছে। জাতিভেদের কারণে গ্রামীণ সমাজের একপ্রান্তে যেমন ব্রাহ্মণ ও শুচিতা আর অন্য প্রান্তে অচ্ছুৎ ও অশুচিতা অবস্থান করে তেমনি গ্রামীণ বসতিতে যাযাবর সমাজের মানুষের পদচারণা আর্থ–সামাজিক কারণেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতায় ছিল যাযাবর মানুষের নিবিড় হৃদ্যতা।'[১] 'মরুর মায়া' গল্পে সমাজের প্রান্তে অবস্থানরত ভবঘুরে যাযাবর সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এরা হা–ঘরের দল। তাঁবু করে গ্রামের জনবিরল প্রান্তরে এরা বসবাস করে। গ্রামের মধ্যে এরা তাঁবু বা বসতি স্থাপন করে না। এদের জীবিকা রুক্ষ ও অমসৃণ জীবনেরই পরিচয়বাহী। গল্পকারের বর্ণনায় এই জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের অনুপম চিত্র গল্পে রূপায়িত হয়েছে:

সংগ্রহ, সঞ্চয়; ওরা সব দলে দলে গ্রামের পানে ছুটে; কেহ সন্ন্যাসী সাজে, মাথায় নামাবলী, কপালে তিলক, পরনে গেরুয়া, হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে ঝুলি, মুখে আশীর্বাদের বুলি-'সী-ত্তা-রাম',-সী-ত্তা-রাম, সাধু সে-বা করো-রাম,-বাড়ির মঙ্গল হোবে রাম, ধন-দৌলত দিবেন রাম। কেহ কেহ যায় বাঁশবাজি; দড়িবাজি করিতে, কসরত দেখাইতে, কপালের উপর লম্বা বাঁশ খাড়া করিয়া দেয়, তার উপরে শুইয়া থাকে হা ঘরের ছেলে, সে আবার সেথায় হাততালি দেয়...। কেহ ভোজ বাজি দেখায়; বস্তায় ছেলে পুরিয়া ধারাল ছুরি দিয়া খুঁচিয়া খুঁচিয়া মারে–আবার তাহাকে বাঁচায়। নারী ফেরে মাদুলি, বাতের তেল, ধনেস পাখির হাড়, ঝুমঝুমি বিক্রয় করিয়া–আয় গো বহুড়ী, আয়গো বিটীয়া, লে-লে-গে মাদলী লে–গে। নিরসন্তানীকে সো-না-চাঁদ-খোকা হোবে, সোয়ামী-না-পায়-সোয়ামী পাবে। –লে –লে–গে–। (১/১২৩)

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের বাজিকর সম্প্রদায় যাযাবর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদে, সাপুড়ে নারী-পুরুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু বাজিকর ও তার স্ত্রী রাধিকা সাপুড়ে বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। সাপখেলা, বাঁদর নাচ, হিংস্র বাঘের মত পশু নিয়েই এদের জীবন। শম্ভু বাজিকর বাজি খেলা দেখায়। এই খেলা দেখিয়ে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে।

বাজিকর সম্প্রদায়ের জীবিকার এক স্বতন্ত্ররূপ ফুট উঠেছে 'যাদুকরী' গল্পে। এই সম্প্রদায় সাপখেলা, ভোজবাজি প্রদর্শন, মাদুলি বিক্রি, নাচ-গান দেখিয়ে ও মাধুকরী বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। লেখক এ গল্পে এদের বিচিত্র পেশা ও জীবিকার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

কাঁকালে একটা গোবরমাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র গঠন ঝুড়ি, তার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র; সেগুলিকে ঢেকে থাকে ভিক্ষালব্ধ পুরনো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর, নাচও তাই– বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রূপা দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। (২/৩৬৬)

'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি' গল্পে বাজিকর শ্রেণির জীবন ও জীবিকার অনবদ্য বর্ণনা উঠে এসেছে। এ গল্পে আফজল সমাজের প্রান্তবর্তী এক চরিত্র। সবাই তাকে আফজল খেলোয়াড়ী বলে চেনে। সে পেশায় একজন বাজিকর। বাজিকর হওয়ার পূর্বে সে মাধুকরীবৃত্তি করে জীবিকার সংস্থান করত। গল্পকার তারাশঙ্কর তার পেশার বর্ণনা দিতে লিখেছেন–

পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, মাঝারি একটা তাঁবু খাটিয়ে বসত মেলার দক্ষিণ দিকে। একটা জয়ঢাক বাজত। ছারকাছ! ছারকাছ! ছারকাছ! (৩/২৭৪)

রাঢ়ের লোকজ জনসমাজে আদিকাল থেকে যাযাবর ও বাজিকর সম্প্রদায় ও তাদের পূর্বপুরুষদের আনাগোনা ও বসবাস বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শিল্পী তারাশঙ্কর এদের সংস্পর্শে এসেছেন এবং রাঢ়ের এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর জীবিকার নানাপ্রান্ত তাঁর গল্পে অকৃত্রিমভাবে এঁকেছেন।

বিচিত্র রঙ ও রূপের দেশ বীরভূম। বীরভূমের ভৌগোলিক চেহারায় আছে আদিমতার প্রলেপ; সংস্কৃতিতে রয়েছে দেশজ ঝাঁজ। রাঢ়ের প্রান্তসমাজে রূপজীবিনী ও ঝুমুর দলের বিলাসিনী সম্প্রদায়ের বসতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এসব প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীরা জীবিকার জন্য অশ্লীল নৃত্য সহযোগে গান পরিবেশন করত। টাকার জন্যে এরা পরপুরুষের সাথে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করত। শুধুমাত্র অভাবের তাড়নায় কিংবা জীবিকার তাগিদে অভিজাত সমাজ কর্তৃক অবহেলিত এই জনজাতির নারীরা নিজের শরীরকে পণ্য করে অন্য পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করত। সমাজের মান, মর্যাদা, মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে বেঁচে থাকার অনড় স্পৃহায় এরা এই কদর্য পেশাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করত। 'মেলা' গল্পে তারাশঙ্কর গ্রামীণ মেলায় প্রান্তিক বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রেণিজীবী মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে ময়রা, মুচি, জুয়াড়ি, মনোহরী ব্যবসায়ী ও রূপোজীবিনীদের কথা বলেছেন। গল্পে লেখক পতিতাপল্লির একটা অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পে রূপোজীবিনীদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি কমলি নামক এক রূপোজীবিনী নারীর কথা বলেছেন। রাতের অন্ধকারে এরা গৃহে সাজ-সজ্জা করে পর পুরুষের জন্যে অপেক্ষা করে। যার গৃহে পরপুরুষের আনাগোনা যত বেশি তার উপার্জন তত বেশি। গল্পকার এই পেশার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন–

কোন বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্বরতার পায়ে বীভৎতার নূপুর বাজিতেছিল। (১/২৪০)

ঝুমুর সম্প্রদায় রাঢ়ের আদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের জীবন–জীবিকায় রয়েছে রাঢ়ের সংস্কৃতির অমার্জনীয় ছাপ। 'মহাপ্রভুর আর্বিভাবের পরবর্তীকালে রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে বহু কীর্তনীয়ার দল গড়ে ওঠে। ছোটদলগুলি আর্থিক পসারের জন্য ক্রমে আদিরসাশ্রিত গান ও নাচের আশ্রয় নেয়। তার ফলেই নিছক নাচ-গানের অনুষ্ঠানরূপে এই ঝুমুরের উৎপত্তি।'[১] ঝুমুর নাচ ও গান রাঢ়ের সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যময়ধারা হিসেবে যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত। 'ঝুমুর কবিগানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আদিরসাশ্রয়ী লঘু সংগীত। রাঢ়ের গ্রামে অনুষ্ঠিত ঝুমুর প্রধানত নারী ও পুরুষ শিল্পীর মধ্যে প্রশ্ন ও জবাবের ভঙ্গিতে গাওয়া গান। ... ঝুমুর ভ্রাম্যমাণ দলের নাচ-গান। দলগুলি মালদা, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানেও যায়। দলের মেয়েরা পদাবলী, খেউড়, খেমটা-টপ্পা প্রভৃতি সংগীতে পটীয়সী, আবার দেহ–পসারিণীও বটে।'[২] 'তমসা' গল্পটিতে ঝুমুর দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্টেশনে যে মেয়েটির সঙ্গে পঙ্ক্ষীর পরিচয় ঘটে সে মেয়েটি ঝুমুর দলের নাচনেওয়ালী। সে গানও করে। এরই মধ্যে দিয়ে ঝুমুর দল তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ঝুমুর দলের গানে অনেক সময় ধর্মসংগীত বা পৌরাণিক সংগীতের সুর ও বিষয় বর্ণিত হত। রাঢ় অঞ্চলে প্রান্তিক ঝুমুর শ্রেণি মূলত গান গেয়ে এবং নাচ দেখিয়ে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত পল্লিবাসীর মন জয় করে অর্থ উপার্জন করত।

---

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন* (২য় খণ্ড), ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৫

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে পটুয়া এবং মালাকার সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার বর্ণময় চিত্র ঋজু ভাষায় ও সুস্পষ্ট বর্ণনায় রূপায়িত হয়েছে। 'উনিশশো ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বীরভূমের অনেক গ্রামে গড়ে বিশ ঘর মতো পটুয়া বাস করত। এখনও বীরভূমের পানুড়ে, ইটাগড়িয়া, পাকুড়হাঁস ও সিউড়ির আশপাশে কিছু পটুয়া পরিবার আছেন'[১] প্রান্তিক পটুয়া শ্রেণি সৌখিন জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাদের জীবিকার ধরন অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের থেকে স্বতন্ত্র। পটুয়া নারীর জীবিকার চিত্র উঠে এসেছে 'রাঙাদিদি' গল্পে–

বেলা দশটা বাজিতেই রাঁধা-বাড়া শেষ করিয়া পটুয়াদের মেয়েরা ব্যবসায়ে বাহির হয়। কাচের চুড়ি, মাটির পুতুল, পুঁতির মালা, কারঘুনসী, কাচপোকা, সোনাপোকা ডালায় সাজাইয়া তাহারা গ্রামে গ্রামান্তরে ফিরি সাজাইয়া তাহারা গ্রামে গ্রামান্তরে ফিরি করিয়া বেচিতে যায়। ... আরো একটি ব্যবসা আছে পটুয়ার মেয়েদের। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ির মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তুলিবার জন্য। ছোট বড় তিন-চার রকমের সূচ হাতে করিয়া ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নক্সাগুলিও তাহাদের মুখস্থ। লতাপাতা, পাখি, ফুল, খেজুরছড়ি, বরফিকাটা, বৃন্দাবনী, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। (২/২৫৪-৫৫)

'কামধেনু' গল্পে নাথু পটুয়ার সন্তান। কামধেনু তার জীবনে অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয়েছে। জীবিকার জন্যে সে কামধেনুর উপর নির্ভরশীল। কামধেনুর দুধ বিক্রি এবং বাড়ি বাড়ি মাধুকরীবৃত্তি করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। গল্পকার তারাশঙ্কর তার জীবিকার স্বরূপ তুলে ধরেছেন এভাবে–

কামধেনু সমস্ত দিনে দুধ দেয় এক সের, প্রচুর সেবা করেও পাঁচ পোয়ার বেশি দুধ উঠল না। তখন চার আনাকে সে (নাথু) তুললে আট আনায়। লোক তাতেও আপত্তি করলে না। দৈনিক দশ আনা পয়সা কামধেনুর আশীর্বাদ। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে আয় ও উপার্জন হয় আকস্মিকভাবে। নাথু যায় ভিক্ষায়। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, এক হাতে মন্দিরা, এক হাতে সরু বাঁশের তেলে পাকানো লাল রঙের দেড় হাত লম্বা লাঠি, মাথায় গামছার পাগড়ি, গায়ে ঢিলেঢালা বেমানান রকমের একটা ভিক্ষেয় পাওয়া জামা। সুরভিমঙ্গল গান ক'রে ভিক্ষে পায় চাল। গো-চিকিৎসা করে দু'আনা-চার আনা বকশিশ। (৩/০৩)

তারাশঙ্করের 'রাঙাদিদি', 'কামধেনু' গল্পগুলি ভারতীয় আদি কৃষি সভ্যতার সমৃদ্ধতারই প্রতীক।

সময়ের বিবর্তনের দরুন রাঢ়ের এই প্রান্ত জনজাতির জীবিকায় লেগেছে পরিবর্তনের দোলা। কালের পরিক্রমায় সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাপালা প্রভৃতি আনন্দোপকরণের প্রভাব প্রচার ও প্রসারের কারণে এবং রুচির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে পসার কমে যাওয়ায় পটুয়া সম্প্রদায়ের অনেকে ভিন্ন পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। তারাশঙ্করের 'রাঙাদিদি' গল্পে জীবিকা পরিবর্তনের এই চিত্রটি ফুটে উঠেছে–

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯২

Dhaka University Institutional Repository

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে গোটাকয়েক নূতন কাজ পটুয়াদের পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে। আগে তাহারা পট আঁকিত–পট দেখাইয়া গান করিত, বিনা পটেও মন্দিরা বাজাইয়া পুরাণের পালাগান করিত, প্রতিমা গড়িত, রাজমিস্ত্রির কাজ করিত, যাহারা সূক্ষ্ম কাজ পারিত না তাহারা মাটির ঘর তৈয়ার করিত। এখন তাহারা দেওয়ালে তেল-রঙ দিয়া লতাপাতা ফুল আঁকে–কাঠের উপর রঙ ও বর্নিশের কাজও করে। কেহ কেহ তাঁতের কাজও করে। (২/২৫৮)

'মালাকার' গল্পে ডাকসাজ ও আতসবাজির শিল্পী রজনী মালাকারের জীবিকার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। রাঢ়ের প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পটুয়াদের মতো এই শ্রেণির চরিত্রের জীবন ও জীবিকায় সৌখিনতার ছাপ সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। মালাকার গল্পটিতে রজনী মালাকারের জীবিকা উপার্জনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে-

রজনীরাও বংশানুক্রমে ডাকসাজ ও আতসবাজির কারিগর।... উপার্জন আছে, সঞ্চয় নাই; পৈতৃক সম্পত্তি গুলিও একে একে নামমাত্র ঋণ বা খাজনা বাকির দায়ে নিঃশেষিত হইতে বসিয়াছে। রজনীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। হাতে অর্থ আসিলেই উন্মুক্ত অভিসারে বাহির হইয়া পড়ে। সে অর্থ নিঃশেষিত করিয়া নিঃসম্বল হইয়া ফিরিয়া সে আবার কাজে লাগে। তবে কাজ তাহার খুব ভাল। তাহার হাতের ডাকসাজের মত এমন ডাকসাজ কাহারও হাতে বাহির হয় না। আতসবাজিতেও সে অপরাজেয়। তাহার ফানুস আজও জ্বলিয়া যাইতে কেহ দেখে নাই, রাত্রির আকাশের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে সেগুলি মিলাইয়া যায়। (২/১৮২)

'প্রতিমা' গল্পে বৃদ্ধ মিস্ত্রী কুমারীশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে প্রতিমা নির্মাণ করে। এই প্রতিমা নির্মাণ করেই সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। রাঢ় সমাজে এইসব সম্প্রদায়ের লোকেরা শিল্পী বা কারিগর বলে সর্বাধিক পরিচিত। রাঢ়ের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে, লোকজ অনুষ্ঠানে এইসব শিল্পী নানা ধরনের মৃৎশিল্প ও কুটির শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রী তৈরি করত। এই কারিগর সম্প্রদায় রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে এসব পণ্যের চাহিদা মেটাত।

রাঢ় বাংলার প্রান্ত জনসমাজে মুচি জনজাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' গল্পে এই পেশাজীবী মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সময়ের বিবর্তনে প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই তাদের বৃত্তি বদল করেছে। 'কবি' গল্পে কবিয়াল নিতাইয়ের বন্ধু রাজা মুচির কথা বলা হযেছে। রাজা জাতিতে মুচি। কিন্তু বর্তমানে সে স্টেশনের পয়েন্টস্-ম্যানের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। গল্পকার তারাশঙ্কর তার বর্ণনায় লিখেছেন–

স্টেশনের পয়েন্টস্-ম্যান রাজা মুচি তাহার (নিতাইয়ের) বন্ধু লোক–সেই তাহাকে আশ্রয় দিল। রাজাও অদ্ভুত লোক–আঠারো বৎসর বয়সে সে বিগত মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়া গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া লাইট রেলওয়ের এই স্টেশনটিতে পয়েন্টস্-ম্যানের কাজ করিতেছে। (২/৩১৮)

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রয়োজনে, সময়ের পরিবর্তনে রাজা মুচি তার পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে ভিন্নতর পেশাকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। 'চর্মকারের বৃত্তি বৈদিক সাহিত্যেও উল্লেখিত। মনু দুই ধরনের চর্মকারের উল্লেখ করেছেন–করাবর এবং বিগবন। প্রথমটি সম্ভবত সেই পেশার মানুষ যারা পশুদেহ থেকে চামড়া কর্তন করে এবং চামড়া তৈরি করে। দ্বিতীয়টি, যারা চামড়ার কাজ করে, যেমন মুচি।'[১] স্টেশনের পয়েন্টস্-ম্যান রাজা মুচি এই দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতির মধ্যে একটি শ্রেণি লোহা পিটিয়ে দা, বটি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি নানা ধরনের লৌহজাত পণ্য-সামগ্রী তৈরি করত। প্রান্ত সমাজে এই পেশাজীবী গোষ্ঠী কামার বা কর্মকার বলে সর্বাধিক পরিচিত। কামারবৃত্তি অবলম্বন করে এই শ্রেণির লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করত। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে এই শ্রেণির পেশাজীবী মানুষের চিত্র তুলে এনেছেন। এই সম্প্রদায় কখনো পূর্বপুরুষের পেশাকে অবলম্বন করে জীবিকা উপার্জন করেছে আবার কখনো বা ভিন্নতর পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। 'খড়গ' গল্পটিতে একজন কর্মকারের ছেলের কথা বলা হয়েছ। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেও কর্মকার-বৃত্তিকেই জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। গ্রামের প্রান্তে একটি কুটিরে সে কর্মকারের কাজ করে। গ্রামের রাজাবাবু রায় তাকে একটি খড়গ দেখিয়ে খড়গটিকে পূর্বের রূপে মেরামত করে দিতে বলে। এইজন্য রাজাবাবু তাকে জমিদার বাড়িতে নিয়ে যায়। যেখানে এই খড়গ দিয়ে পশুবলি দেওয়া হত। সেখানে গিয়ে কর্মকারের ছেলে কল্পনায় রাজবাড়ির অতীত জীবনে চলে যায়। তার বাবা কর্মকার ছিল। সে রাজমন্দিরে পশুবলি দিত। পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার পুত্র পশুবলির জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু এই পশুবলি প্রথায় (ছেত্তা) যুক্ত হতে চায়নি পুত্র:

আমার পিতৃবৃত্তির মধ্যে এই ছেত্তার কর্মও একটা বৃত্তি ছিল। কিন্তু সেইটি আমি গ্রহণ করি নাই। (১/২৭৫)

গল্পটিতে কর্মকারের সন্তান শিক্ষিত হয়েও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কর্মকার বৃত্তিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

'জটায়ু' গল্পে জটে পাগলা শিবু কর্মকারের ছেলে। মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে সে পিতৃপুরুষের পেশাকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সে পিতার সাথে কামারশালায় লোহা পিটিয়েছে। গল্পকার তারাশঙ্করের বর্ণনায় তার জীবিকা উপার্জনের চিত্র গল্পটিতে উঠে এসেছে-

---

[১] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাড়িতে থেকেছে, সে সময় পর্যন্ত বাপের সঙ্গে কামারশালায় খেটেছে। বড় সাঁড়াশি দিয়ে বাপ ধরত জ্বলন্ত লোহা, সে পিটত তার উপর হাতুড়ি। বড় হাতুড়ি। (৩/২৫৭)

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে এক শ্রেণির পেশাজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। যারা গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে। এরা ড্রাইভার নামে পরিচিত। ড্রাইভিংকে এরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। 'ইস্কাপন' গল্পে ইস্কাপন গাড়ি চালানোর কাজ পেয়েছে। তার পূর্বে সে ছিল চোর। তার সম্পর্কে গল্পকার লিখেছেন–

–'ইস্কাপন'। পিতা অজ্ঞাত, জাতি অজ্ঞাত, নিবাস অজ্ঞাত, ভীষণ প্রকৃতির লোক। কথায় কথায় মারপিট করে, দুর্দ্দান্ত মাতাল; বেশ্যাসক্ত; চোর। (১/৫৬১)

ইস্কাপন স্ত্রী পটলির জন্য চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং তার ছয় মাসের জেল হয়। জেল থেকে বের হলে শুরু হয় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। সে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে। সে গাড়ির ড্রাইভিং–এর কাজ পায়। এই ড্রাইভিং–এর কাজ করেই সে তার জীবিকা উপার্জন করেছে। 'বিস্ফোরণ' গল্পেও রামতরণ ড্রাইভিংকেই জীবিকা উপার্জনের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

'অ্যাকসিডেন্ট' গল্পে ভূপেন চ্যাটার্জী লরির ড্রাইভার। সে উচ্চবর্ণের হলেও ড্রাইভিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। ভূপতের বাবা ভেবেছিল ভূপত মেকানিজম শিখবে। কিন্তু ভূপত গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট না করে হয়ে ওঠে গাড়ির ড্রাইভার।

রাঢ়ের প্রান্তিক সমাজে প্রান্তিক চরিত্রের কেউ কেউ রাজমিস্ত্রি পেশাকে জীবিকার বাহন রূপে গ্রহণ করেছ। 'রাঙাদিদি' গল্পে ঘনশ্যাম পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। 'ইমারত' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জনাব আলি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। আলি এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর। গল্পকার তার চেহারার বর্ণনায় জীবিকার স্বরূপকেই যেন তুলে ধরেছেন।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সূতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরি-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কর্ণি দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চকচক করছে। ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিসের বিটের মত, সবচেয়ে পাতলা কর্ণি দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন। (২/৫৪৯)

জনাব আলি এ গল্পে প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। সে জীবিকা হিসেবে রাজমিস্ত্রি বৃত্তিকে গ্রহণ করে অনেকের পাকা ইমারত তৈরি করে দিলেও তার নিজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ় বাংলার নান্দনিক কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রাঢ়ের গণ-মানুষের রুক্ষ, ধূসর, অমসৃণ, আদি-অকৃত্রিম জীবনের শিল্পিত ভাষ্যকার। জীবনের বাঁকে বাঁকে পলি মাটির মতো সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই যার সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ; সেই পোড় খাওয়া কৃষ্ণবর্ণের শুদ্ধ মানুষটি একদা হয়ে ওঠেন রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতির মুখপাত্র। সামন্ত আদর্শ ও আধুনিক শিক্ষার ধারক এই মানুষটির অন্তর ও বাইরে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীল সত্তার দ্বন্দ্ব সর্বদা সক্রিয় থেকেছে। সামন্ত জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও লেখনিকেই তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 'তিনি কলম না ধরলে প্রান্ত-বাঙালি-জীবনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যেত। তাঁর মতো বস্তুজ্ঞান ও বিষয়বোধসম্পন্ন কথাকার বাংলা সাহিত্যে আর কেউ নেই। দীর্ঘ সাহিত্যজীবন এবং তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকীর্তিতে তারাশঙ্কর বিশিষ্ট।'[১] তাঁর গল্পের সুবৃহৎ ক্যানভাসে রাঢ়ের প্রান্তস্পর্শী জনপদের বহুবর্ণিল পেশা ও জীবিকার কথা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বীরভূমকে কেন্দ্র করে রাঢ় জনপদ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের নিজস্ব 'জগৎ'। এখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ ও জনজীবনের সান্নিধ্যে আহরিত উপলব্ধিই তাঁর রাঢ়ভিত্তিক সাহিত্যের মাধ্যমে বিম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। জীবনবোধের উৎস রূপে অঞ্চল ও তার আমূর্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর সাহিত্যের ঐশ্বর্য। অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাঢ়ের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যময় জনজীবন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অপরিহার্য উপকরণ।'[২] রাঢ়ের প্রান্তিক জনচরিত্রের জীবিকার স্বরূপ বিশ্লেষণে এ অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছে সঞ্জীবনী সুধা। সে অমৃত সুধা পান করে তিনি হয়ে উঠেছেন অখণ্ড রাঢ়ের বিস্ময়কর কথাকোবিদ।

---

[১] তপন রুদ্র (সম্পা), *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, ২০০৯, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, পৃষ্ঠা-০১

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪

Dhaka University Institutional Repository

গ. সংস্কার ও সংস্কৃতি

সংস্কার

রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তবর্গীয় জনজাতির আচরিত জীবনবিন্যাস, জীবিকার ধরন, বিশ্বাস-সংস্কার, বোধ-উপলব্ধি, মিথ-পুরাণ, লোক সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য প্রাচুর্য তারাশঙ্করকে প্রাণিত করেছিল সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞে। আদিবাসী-অধ্যুষিত রাঢ়ের তথা বীরভূমের জনজীবনে প্রান্তিক জনসমষ্টির আচার-আচরণ, সংস্কার ও সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে রাঢ়ের কেন্দ্রস্থ সমাজপ্যাটার্নকে। বর্ণাশ্রিত সমাজব্যবস্থার উচ্চকোটিতে অবস্থান করেও তারাশঙ্কর নিম্নবর্ণের ব্রাত্য মানুষের জীবনভূমিকেই তাঁর সাহিত্যের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ অঞ্চলে বসবাসরত বাগদি, বাউরি, ডোম, বেদে, সাঁওতাল, কাহার, লোহার, কর্মকার, ছুতার, ভুঁইমালি, ফুলহাড়ি, মালোপাহাড়ি, হাড়ি, জমাদার, পটুয়া, মালাকার, ভল্লা, চণ্ডাল, বাজিকর, যাযাবর, বাউল, বৈষ্ণব, চর্মকার, ঝাড়ুদার, রাজমিস্ত্রি, জেলে, মাঝি, চৌকিদার, কৃষক, সদগোপ, ক্যারিকেচার, তাঁতি, বারবনিতা, বাঁশফোড়, লেটরা, যদুপতি, কোডা, কোরা, রাজবংশ, ঝুমুর প্রভৃতি জন-জাতির রয়েছে সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আবহমানকাল ধরে রাঢ়ভূমির লালচে মৃত্তিকার স্তরে স্তরে সভ্যতাবিমুখ প্রান্ত জন-চরিত্রের সুদীর্ঘ সংস্কার ও সংস্কৃতির যে প্রত্ন ইতিহাস তা সুগ্রন্থিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। জীবনসন্ধানী শিল্পী তারাশঙ্কর রাঢ়ের অন্ত্যজ মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে যেমন তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন করেছেন; তেমনি তাঁর সাহিত্যভুবন পরিপ্লুত হয়েছে এ সব মানুষের বৈচিত্র্যময় সংস্পর্শে। রাঢ় অঞ্চলে বসবাসরত এ জনশ্রেণির সংস্কার ও বিশ্বাসকে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে দীপিত করে তুলেছেন। নিরক্ষর ও আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তারহিত, প্রযুক্তিগত জীবনের বাইরে অবস্থানরত প্রান্তবাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে এবং চিন্তা-চেতনায় অন্ধ-সংস্কারের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। হৃদয়ের গভীরে লালিত অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস এবং সমাজজীবনে প্রচলিত রীতিকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে সংস্কার বিশ্বাসের মৌল ভিত্তিভূমি। বিশ্বাস ও সংস্কার প্রথার মধ্য দিয়ে একটি জনজাতির রুচি, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ, দর্শন, চেতনা সর্বোপরি জীবনবোধ ব্যক্ত হয়ে ওঠে। অন্ধ আচার সংস্কারে আবদ্ধ ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর বিচিত্র বিশ্বাস যুক্তিবুদ্ধিহীন অলৌকিকতায় সমাচ্ছন্ন।

আবহমান বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংস্কারের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম অবিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সংস্কার বিশ্বাসের এ স্বরূপ অঙ্কন করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস :

Dhaka University Institutional Repository

'কোণ আসুভ খনে পাঅ রাঢ়ায়িলোঁ ।

হাঁছী জিঠী আয়র ঊঝঁট না মানিলোঁ।।

শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।

বাঁঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।।

বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।

আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ।। ধ্রু

কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।

হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গেএ যোগিনী।।

কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।

সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।'[১]

কৃষ্ণকর্তৃক তিরস্কৃত ক্ষুব্ধ রাধিকার এ বক্তব্য যে সমকালীন সমাজপরিবেশে বসবাসরত মানুষের অকৃত্রিম সংস্কার-বিশ্বাসেরই প্রতিফলন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ সংস্কার জ্ঞানলব্ধ নয়, একান্তই বিশ্বাসলব্ধ। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও ছদ্মনারী দেবী চণ্ডীর অনাকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবে ফুল্লরার মানসিক প্রতিক্রিয়ার ধরন উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে–

'বাম বাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি।'[২]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই সংস্কারের চিত্র প্রতিভাসিত হয়েছে। আধুনিক কালের পুরোধাপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১) এ সংস্কারের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে রামানুজ লক্ষ্মণ। এই পর্যায়ে মাইকেলের যে বর্ণনা তা সংস্কার-বিশ্বাসে আকীর্ণ:

---

[১] বড়ু চন্ডীদাস, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পা), ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৪,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২৫

[২] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা), তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩, সাহিত্য অকাদেমি,কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
মুর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁপিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।'[১]

সপ্তম সর্গে দেখা যায় মেঘনাদের প্রিয়তমা স্ত্রী প্রমীলার ডান চোখ স্ফুরিত ও স্পন্দিত হচ্ছে। এ-পর্যায়ে প্রমীলা তার সখী বাসন্তীকে বলেছে:

'কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, সজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তার কাছে,

[১] ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা) *মধুসূদন রচনাবলী*, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৯,পুনমুর্দ্রণ, ২০০৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে

এ কুদিনে বীরমণি।'[১]

সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বাংলা সাহিত্যে সংস্কারের এই ঐতিহ্যময় ধারাকে রাঢ় মাটির কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটগল্পে বিবিধ ঘটনা ও চরিত্রের জীবনাচারের বর্ণনায় প্রতিফলিত করেছেন। রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আজন্ম প্রতিপালন করেছে তাদের প্রজন্মপরম্পরা আচার ও সংস্কার। এইসব প্রান্ত মানুষের আচরিত জীবনের মধ্য দিয়েই দীপ্যমান হয়ে উঠেছে তাদের নিগূঢ় সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রাচুর্যময় ইতিহাস। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের বর্ণাঢ্য সংস্কারের যে চিত্র প্রতিস্থাপিত হয়েছে তার কিছু পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল:

বৈষ্ণবীয় আচার ও সংস্কার

রাঢ়ের প্রান্ত জনশ্রেণির একটা বড় অংশ বৈষ্ণবীয় জীবনধারায় অভ্যস্ত। 'বীরভূম ও তার সীমান্তে বহু বৈষ্ণব তীর্থস্থান বর্তমান; যেমন, জয়দেব-কেন্দুলি, চণ্ডীদাস-নানুর, বিল্বমঙ্গল-বেলুরিয়া, নিত্যানন্দর জন্মস্থান একচক্রা গ্রাম, গুপ্ত বৃন্দাবন নামে কথিত বীরচন্দ্রপুর ইত্যাদি।'[২] রাঢ় সমাজের অন্তর্গত বৈষ্ণব নর-নারীর জীবনের যে চিত্র তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে এঁকেছেন সেখানে লৌকিক জীবনাচার দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধন ও ভজনের চিত্র গল্পগুলিতে অনুপস্থিত। 'বস্তুত মানবিক প্রেমই ইন্দ্রিয়গত কামনার স্থূলরূপ থেকে আধ্যাত্মিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে দৈব প্রেমের পূর্ণাঙ্গ ও অনন্ত রূপ ধারণ করে এবং একই সঙ্গে তার আদি রূপ গুলিকেও নিজের মধ্যে ধরে রাখে এবং আত্মগত করে। এই সাধন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সাধারণ নর নারীদের পক্ষে কৃষ্ণ ও রাধার স্বরূপ নিজেদের সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।'[৩] বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের এই দর্শন তারাশঙ্করের গল্পসম্ভারে দুর্লক্ষ্য। বৈষ্ণবীয়রা রসকলি ও মালাতিলক তাদের শরীরে অঙ্কন করে। এটা তাদের একটা সংস্কার। 'রসকলি' গল্পে মঞ্জরী ও গোপিনী একে অন্যের নাকে রসকলি অঙ্কনের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সখ্যভাব গড়ে তোলে:

মঞ্জরী বলিল, তা ভাই অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমায় দিই, – যা নিয়ম তা তো করতে হবে। বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলক মাটি ঘষিতে বসিল। (১/৪৫)

---

[১] ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা) *মধুসূদন রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯০-৯১

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭, নর্বাক, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭৪

[৩] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বীরভূম অঞ্চলে বসবাস করে জাত বৈষ্ণব এবং বাউল ভেকধারী বৈষ্ণব। এরা স্ব-স্ব জীবনে নিজস্ব আচার ও সংস্কার মেনে চলে। তারাশঙ্কর তাঁর 'মালাচন্দন' গল্পে লিখেছেন–

বাউল ভেকধারী বৈষ্ণবেরা 'ছিড়ঁলে মালা, নতুন গাঁথে।' অর্থাৎ বৈষ্ণব থাকিতেই মনান্তরে বা এমনি কারণে বৈষ্ণবী নতুন বৈষ্ণবের গলায় মালা, ললাটে চন্দন পরাইয়া মালাচন্দন করে। কিন্তু এরা এই জাত বৈষ্ণবের সৎজাতি গৃহস্থের অনুকরণে বৈষ্ণব থাকিতে মালাচন্দন করা ত দূরের কথা, বিধবা হইয়াও নতুন আশ্রয় গ্রহণ করে না: এ শুধু লজ্জায় নয়, বহুদিন হইতে পালন করিয়া এ আচার তাহাদের সংস্কার; ধর্মের বিধান সত্ত্বেও সংস্কার তাহারা লঙ্ঘন করিতে পারে না। (১/১৬৯)

মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবরা তাদের অহংকে বিসর্জন দেয়; পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে তাদের লোভ অবদমিত হয় এবং এটা তাদের ধর্মসাধনারও অংশরূপে বিবেচিত হয়। 'আত্মপ্রচারণা কিংবা নিন্দা করা এরা পছন্দ করে না। ...সহিষ্ণুতা, সন্ন্যাস জীবন, ত্যাগের আদর্শ পালন করতে হয় ধর্মচর্চায়। ঈশ্বরের পথে পার্থিব সুখত্যাগ এদের আদর্শ। ভোগলিপ্সা থেকে এরা দূরবর্তী। দীন জীবনযাপন এদের বৈশিষ্ট্য। দৈন্য ও বিনম্রভাব, অপরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, অতিথি ও আর্তমানবতার সেবা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অহিংস নীতি এদের আচারে লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে এরা সহিংস প্রতিবাদী নয়, নৈতিক প্রতিবাদে মগ্ন প্রেমের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চায় বৈষ্ণবরা। বৈষ্ণবের সামাজিক প্রেমে বিবাহ হয়, কণ্ঠিবদল হয় আবার বিচ্ছিন্নও হতে পারে এক অপরে। আর প্রেম সাধনা কখনো কখনো চিরবিরহের হয়ে ওঠে।'[১] উচ্চ বর্ণের সমাজের নানা সামাজিক অনুশাসন ও শোষণ পীড়নের ফলে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। রাঢ়ের পল্লি সমাজে প্রান্তিক এই বৈষ্ণব শ্রেণির অবস্থান সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলেছেন 'অধিকাংশ চাষীর গ্রাম। দশ বিশখানা গ্রামের পরে দুই-একখানা ব্রাহ্মণ ও ভদ্রসম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদগোপরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবরা খোল করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়। বাউলেরা একা আসে একতারা লইয়া।'[২] তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ়ের সহজিয়া বৈষ্ণবদের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় উপলব্ধি, দর্শন, চিন্তা-চেতনা ও আখড়ার প্রাত্যহিক আচার অনুষ্ঠানাদির বিবরণ বিস্তৃত আছে। বৈষ্ণবীয় জীবন বা ধর্মের গূঢ় কোন রূপের বহিঃপ্রকাশ তাঁর গল্পে বিশ্লেষিত হয়নি। তারাশঙ্করের গল্পে বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাবের চেয়ে লৌকিক প্রভাব বেশি মাত্রায় ক্রিয়াশীল থেকেছে।

---

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, ১ম প্রকাশ, ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৩৭

[২] জগদীশ ভট্টাচার্য, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের সহজ-সরল শান্তিপ্রিয় অন্ত্যজ জনজাতির অন্তর্গত বৈষ্ণব শ্রেণির জীবনের বিচিত্র সংস্কার ও সংস্কৃতিকেই তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে দৃশ্যমান করে তুলেছেন। বৈষ্ণবধর্মের দর্শন অপেক্ষা আচার-সংস্কারকে তিনি তাঁর গল্পে অধিকতর আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছেন।

বাউল আচার ও সংস্কার

বীরভূমের প্রকৃতির কঠোরতা এবং কোমলতা এ অঞ্চলের মানুষের মানসগঠন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই এ অঞ্চলের মানুষের উপর শাক্ত ও দ্বৈত প্রভাব যেমন ক্রিয়াশীল হয়েছে তেমনি পাশাপাশি বাউল আচার-সংস্কার দ্বারা এ অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে সম্মোহিত হয়েছে। বাউলেরা অন্ত্যজ সমাজভুক্ত হলেও এদের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, দর্শন উচ্চ-মার্গের হয়ে থাকে। বাউলেরা সর্বজনীন মানবধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মীয় আচারসর্বস্বতার চেয়ে মানবধর্ম, মানবপ্রেম ও সেবার মধ্য দিয়ে নিরাকার ঈশ্বরের সন্তুষ্টি ও সন্ধান তারা করে থাকে। 'বাউলেরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে তারা কোনো প্রচলিত রীতি-নীতি মানে না, ব্রাহ্মণ্য অথবা ইসলামি যে কোন ধর্মীয় অনুশাসনই তাদের কাছে বর্জিত এবং তাদের বসতি সমাজের বাইরে, ভিখারির মতো। তারা বলে সকল নরনারীর মধ্যেই প্রেম ও দৈবশক্তি আছে এবং একইভাবে তারা দার্শনিক দিক দিয়ে বৈষ্ণব ও সুফি এই উভয় ধর্মীয় ধারার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়ে ... বাউলেরা শ্রোতৃবর্গকে তাদের অপূর্ব সুরেলা, সূক্ষ্ম ও বুদ্ধিদীপ্ত গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে, যার বিষয়বস্তু কখনও 'হৃদয়ের মানুষ' কখনও বা 'অচিন পাখি' যা মানবদেহ স্বরূপ খাঁচার মধ্যে কখনও বন্দী থাকে, কখনও ছেড়ে উড়ে পালায় কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা মেনে চলে মুর্শিদের উপদেশলব্ধ কঠোর সাধন ও উপাসনা পদ্ধতি।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর রাঢ় বাংলায় বাউলবেশী এই সমস্ত প্রান্তিক চরিত্রের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে তার গল্পে বাউল সম্প্রদায়ের গূঢ় সাধনভজন ও দর্শনতত্ত্বের চেয়ে লৌকিক জীবনাচার ও সংস্কার প্রাধান্য পেয়েছে। 'বাউল' গল্পে লেখকের বর্ণনায় বাউল চরিত্রের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। বাউলের মুখে আগে হাসি পরে কথা। গল্পটিতে প্রৌঢ় বাউল শ্যামসায়রের পাড়ে গ্রামবাসীর অনুরোধে ডেরা স্থাপন করে। একটা শিশুকে সর্প দংশন করলে এই বাউল তার মন্ত্র বলে সাপ হাজির করে বিষ নামিয়ে শিশুর জীবন রক্ষা করে। এই মন্ত্র উচ্চারণে বাউলের সংস্কার ফুটে উঠেছে–

---

[১] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বাউল আসন করিয়া বসিয়া নানা মন্ত্র অদ্ভুত সুরে আওড়াইতে আরম্ভ করিল। সে উচ্চারণ ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে যেন একটা মোহের সৃষ্টি করিতেছিল। দর্শকমণ্ডলীর গুঞ্জনালাপ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। (২/২৪৯)

তারাশঙ্করের গল্পে ব্যবহৃত বাউল গানে কৃষ্ণভাব প্রকাশিত হয়েছে। 'টহলদার' গল্পে রামদাস বাউলের স্বকণ্ঠে সে ভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়-

নিশি হল ভোর

উঠ রে মাখন -চোর

বলাই রতন ডাকে নিশি হ'ল ভো-র।

বাউলেরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অন্নের সংস্থানে বের হয়ে পড়ে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গৃহস্থ বাড়িতেও তারা ভিক্ষা মাগে। গান শুনিয়েও বাউলেরা বংশপরম্পরা সংস্কার অনুযায়ী সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে এবং বকশিশ গ্রহণ করে। 'কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি' গল্পে বুড়ো নিতাই বাউল বড় লাইনের যাত্রীদের গান শুনিয়ে সংস্কার অনুসারে- 'কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে, গৌরচাঁদের দয়া আর রসিক-জনের ভালবাসা। তাঁর কৃপাতেই ভাব, তাঁর দেওয়া গলাতে গাই, রসিক-জনে ভালবাসে, তাই তাঁদের ভাল লাগে আমার মত অভাজনের 'পদ'। তা দেন কিছু ভিক্ষা দেন।' (৩/২১)

তারাশঙ্করের গল্পে প্রান্তিক বাউল সম্প্রদায়ের আচার-সংস্কার বীরভূমের প্রচলিত বিশ্বাস -সংস্কারের প্রেক্ষাপটেই রূপান্বিত হয়েছে।

ডাইনি সংস্কার

রাঢ় বাংলায় অন্ত্যজ সমাজের অশিক্ষিত মানুষগুলির মধ্যে ডাইনি সংস্কার ও বিশ্বাস বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তারাশঙ্কর তাঁর ডাইনি সিরিজের 'ডাইনীর বাঁশী' (১ম খণ্ড), 'ডাইনী' (২য় খণ্ড), এবং 'ডাইনী' (৩য় খণ্ড) গল্প ত্রয়ে ডাইনি সংক্রান্ত রাঢ়ের মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র নিপুণতার সাথে অঙ্কন করেছেন। 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে সমাজের প্রান্তবর্তী এক মেয়ের কথা বলা হয়েছে। যার মাতা ছিল ডাইনি। মেয়েটির নাম স্বর্ণ। সে গ্রামের সব শ্রেণির মানুষের সাথে মিশতে চেয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ তার মার মতো তাকেও ডাইনি বলে আখ্যায়িত করেছে। গল্পে মুখুজ্জে বৌ-এর সন্তান-সম্ভাবনার প্রসঙ্গে মানদা স্বর্ণকে বলেছে-

মাসী কি ডাইনী নাকি ? তাই পোয়াতীর পেটের ভেতর মরা ছেলে সব দেখতে পেলে ? (১/২৩০)

মানদা ডাইনি বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছে-

Dhaka University Institutional Repository

আমার শ্বশুর বাড়িতে এক ডাইনী ছিল–শুনেছি, সে নাকি সব দেখতে পেতো। মানুষের বুকের ভেতর প্রাণ নড়ছে, শিরার মধ্যে রক্ত চলছে, পোয়াতীর পেটের মধ্যে ছেলে, গাছের ফুলের মধ্যে ফল–সব সে দেখতে পেতো। (১/২৩০)

মানদা বিশ্বাস করে ডাইনিদের মতো অনিষ্টকারী পৃথিবীতে নেই। ফলন্ত গাছ, পোয়াতী, শিশুছেলেদের প্রতি ডাইনিদের অনেক লোভ। মানুষের শরীরের রক্ত চুষে খায় ডাইনিরা। মানদার বিশ্বাসের সঙ্গে সমাজের লোকের বিশ্বাস এক পর্যায়ে সত্য হয়ে ওঠে। এবং স্বর্ণ নিজেকে এক সময় ডাইনি ভাবতে শুরু করে। সাধারণ মেয়ে স্বর্ণ যার দিকে তাকায় তারই কোন না কোন অনিষ্ট হয়। তাই সমাজের সকল নারী পুরুষ স্বর্ণকে ডাইনি ভাবতে শুরু করে। স্বর্ণ গ্রামীণ কুসংস্কারের শিকার। লেখকের ভাষায়-

সমস্ত পল্লীখানা থম্ থম্ করিতেছিল। একটা তীব্র অবসন্নতায় স্বর্ণের চেতনা যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মানদার কথাগুলো ক্রমাগত তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল। ডাইনী–সে ডাইনী! শিশু, গর্ভিণী এদের উপর তার বড় লোভ। মায়ের প্রবৃত্তি কখন হয়তো অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিবে। হয়তো বা উঠিয়াছে। ...ডাইনীরা সব দেখিতে পায়। গর্ভিণীর গর্ভের ভ্রূণ, গাছের মুকুলের ফল-দেহের মধ্যে রক্ত, মাংস, হৃৎপিণ্ড, প্রাণস্পন্দন-সব তাহারা দেখিতে পায়! (১/২৩১)

স্বয়ং স্বর্ণও গ্রামীণ মানুষের এই অন্ধ কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। এর ফলে তার জীবনও তার মায়ের মতো বিষময় হয়ে উঠেছে। সে নিজেকে সব ঘটনার জন্য দোষী মনে করেছে। গল্পটিতে ডাইনি সংক্রান্ত গ্রামীণ মানুষের সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে গ্রাম্য নারী স্বর্ণের ডাইনি হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'বেনেদের মেয়ে স্বর্ণ কি করে একদিন সবার দৃষ্টিতে স্বর্ণ ডাইনিতে রূপান্তরিত হল তার কাহিনী আছে ওই গল্পে। 'ডাইনী' গল্পে যেন তারই মর্মান্তিক পরিণতি। অবশ্য দ্বিতীয় গল্পের ডাইনি স্বর্ণ নয়, তার নাম সুরধুনী।'[১]

দ্বিতীয় খণ্ডের 'ডাইনী' গল্পের কলেবরে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজমানসের অন্তর্গত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের রূপ চিত্রিত হয়েছে। গল্পে তারাশঙ্কর তন্ত্র-মন্ত্র, সাধনা, বান, তাগা তাবিজে বিশ্বাসী মানুষের চিত্র-চরিত্র তুলে ধরেছেন; যারা সুরধুনীকে ডাইনি বলে আখ্যায়িত করেছে। তারাশঙ্কর এই গল্পে ডাইনি সংস্কারকে জীবন্ত করে তোলার অভিপ্রায়ে ভয়ঙ্কর ছাতি ফাটার মাঠের প্রসঙ্গটিকে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সাথে চিত্ররূপময় করে তুলেছেন।

ছাতিফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। (২/২৪৩)

---

[১] জগদীশ ভট্টাচার্য, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* (২য় খণ্ড), ৮ম মুদ্রণ, ২০০৫, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

Dhaka University Institutional Repository

ছাতি-ফাটার মাঠটিকে ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট চাষী পল্লি। মাঠটি নিয়ে এইসব চাষী বাউরির রয়েছে নানা সংস্কার। নিরক্ষর চাষীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গল্পকার তারাশঙ্কর লিখেছেন–

সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না– তাহারা বলে, কোন অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমান পতঙ্গ পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রামের মধ্যে। (২/২৪৩)

ছাতি-ফাটার মাঠের বিভীষিকাময় রূপ অঙ্কন করে গল্পকার ডাইনি সংস্কারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ মানুষের কল্পনায় ছাতি-ফাটার মাঠ ও ডাইনি সংস্কারের বীজ তিনি গল্পের গাঁথুনিতে বুনে দিয়েছেন। লেখকের একাগ্র বর্ণনায় এ সংস্কার সচিত্র হয়ে উঠেছে–

সে-নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ! তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষ জর্জরতার উপর আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে 'দলদলির জলা' অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরনা জাতীয় জলা। ঐ জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আম বাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী– ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে– তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর। (২/২৪৩)

ডাইনি সংস্কার সহজ সরল গ্রাম্য নারী সুরধুনীকে ডাইনিতে রূপান্তরিত করেছে। গল্পকার সুরধুনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-

নরুণ দিয়া চেরা ছুরির মত চোখে বিড়ালির মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না! (২/২৪৪)

ডাইনি সুরধুনীর অন্তিম পরিণতির প্রসঙ্গটিকে তারাশঙ্কর ডাইনি সংস্কার ও বিশ্বাসের সূত্রে একত্রে গ্রথিত করেছেন:

পরদিন সকালে ছাতি- ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা কাঁটা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্র প্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে। (২/২৫৩)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডাইনী' সিরিজের গল্পগুলির মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের 'ডাইনী' গল্পটিতে ডাইনি সংস্কার ও বিশ্বাসের চিত্রাঙ্কনে বিরল পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন। পরিসমাপ্তিতেও তিনি এই সংস্কারের রুদ্র ভয়ানক রসকে পাঠক চিত্তে সংক্রামিত করতে সক্ষম হয়েছেন–

Dhaka University Institutional Repository

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে। নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল। (২/২৫৩)

প্রান্ত জনজাতির প্রাত্যহিক জীবনে ডাইনি বিশ্বাস ও সংস্কারকে তারাশঙ্কর অনন্য দক্ষতার সঙ্গে সুসমন্বিত করেছেন। ডাইনি বিশ্বাস ও সংস্কার রাঢ়ের ব্রাত্য শ্রেণির মানস প্রবণতার আদিম দিকটিকেই যেন সুচিহ্নিত করেছে।

ধর্মীয় সংস্কার

ধর্মের মোড়কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক জীবনে লালন করে বিচিত্র সংস্কার। ধর্মীয় সংস্কার, ব্রত, বিশেষ কোন রীতি-নীতি মেনে চলার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক জনজাতি এক ধরনের পরিতুষ্টি লাভ করে থাকে। প্রাকৃতিক শক্তি, আলৌকিক শক্তি বা নিয়তিবাদের কাছে পরাহত রাঢ়ের অশিক্ষিত আদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের হৃদয়ের নৈবেদ্য সমর্পণ করেছে দৃশ্যত কোন দেব-দেবীর পাদমূলে। অশুভ, অদৃশ্য শক্তির কু-প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে জাগ্রত দেবতাকে তারা পরিত্রাতা হিসেবে দেখেছে এবং এসব দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রান্তিক এই জনচরিত্র নানা ধরনের ধর্মীয় আচার সংস্কারের চর্চা করেছে। কখনো বা বিশেষ রীতিনীতি পালন ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংস্কার মেনে চলেছে। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে প্রান্ত চরিত্রের ধর্মীয় সংস্কারের রূপটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। 'কামধেনু' গল্পে পটুয়া শ্রেণির ধর্মীয় সংস্কারের চিত্র ফুটে উঠেছে:

পটুয়াদের পটের শেষ অংশে আছে ধর্মরাজের দরবার। চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখেন পাপ-পুণ্যের। রথে চড়ে পুণ্যাত্মা যায় স্বর্গে। ফুল ফলে ভরা বাগান, কূলে কূলে ভরা নদী, মণি-মাণিক্য সাজানো বাড়িঘর। পাপীরা যায় নরকে। আবছা অন্ধকার। নানা ভয়াবহ দৃশ্য। তার মধ্যে আছে একটি জলভরা কুণ্ড। প্রথমটার জল স্থির। দ্বিতীয়টার সে জলে ঢেউ উঠেছে- নীচ থেকে যেন কিছু ঠেলে উঠেছে! তৃতীয়টার দেখা যায়, জলের উপরে মাথা তুলে উঠেছে সাপ, লিকলিক করছে তার জিভ। (৩/১০)

'পাটনী' গল্পে সমাজের প্রান্তবর্তী পাটনি সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাসের চিত্র আভাসিত হয়েছে। গল্পটিতে দণ্ডধারী নিযুক্ত হওয়ার একটা ধর্মীয় সংস্কার ফুটে উঠেছে:

পাটনী সমাজের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই হয় দণ্ডধারী। পূর্ববর্তী দণ্ডধারীর দেহান্তের দিনে ঘর ছেড়ে ওই শ্মশানের ঘাটে স্নান করে, গলায় মালা পরে, কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা নিয়ে, শ্মশানের দগ্ধাবশিষ্ট কাঠে চিতা সাজিয়ে মৃত দণ্ডধারীকে দাহ করে, সেই চিতার একটা পোড়া বাঁশ হাতে নিয়ে (বৃদ্ধ) হয়েছে নতুন দণ্ডধারী।...দণ্ডধারী চিতা সাজানোর প্রথম কাঠখানি পেতে দেয়;

Dhaka University Institutional Repository

তারপর শব বাহকেরাই চিতা সাজায়, সে উপদেশ দেয়। মুখাগ্নি করে শ্রাদ্ধাধিকারী। তারপর দণ্ডধারী দেয় চিতায় আগুন। বলে সকল পাপের তোমার মোচন হল-আমার আগুনে আর মা গঙ্গার জলের পুণ্যে। শিবলোকে হোক তোমার বাস। চিতা নেভার পর সে খুঁজে বার করে আর্ধ-পোড়া হাড় আর টুকরো টুকরো অর্ধদগ্ধ স্নায়ুপিণ্ড। সেগুলি নিয়ে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, বলে হাঙ্গরে খা, কুমিরে খা। কিছুটা ছিটিয়ে দেয় জঙ্গলের ধারে ধারে, বলে, শেয়ালে খা, কুকুরে খা, শকুনি খা, গৃধিনী খা। (৩/৩২)

গল্পে বর্ণিত দণ্ডধারী বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে কপিল নতুন দণ্ডধারী হয়। কিন্তু এর জন্যে কপিলকে ধর্মীয় সংস্কার বা রীতি পালন করতে হয়েছে। বৃদ্ধ দণ্ডধারীর মৃত্যুর সময় কপিলকে লুকিয়ে কাঁদতে হয়েছে। লেখক গল্পে এ ব্যাপারে একজনকে প্রশ্ন করলে উত্তরে সে বলেছে–

এই নিয়ম। লুকিয়ে এক জায়গায় বসে কাঁদতে হবে। তারপরে শ্মশানে এসে দণ্ড ধরবে। (৩/৩৫)

চণ্ডালের বংশধর পাটনি সম্প্রদায় বংশানুক্রমে এই ধর্মীয় সংস্কার পালন করে আসছে। গল্পটিতে পাটনি সম্প্রদায়ের আচার সংস্কার ও জীবনচিত্রের বর্ণনা যেন সিনেম্যাটিক সেলুলয়েডে ফুটে উঠেছে।

'শিলাসন' গল্পটিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিন্নতর এক ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র স্পষ্ট। ভূতত্ত্ববিদ এবং মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমল চৌধুরী লেখককে এই গল্পটি বর্ণনা করেছে। গল্পটিতে কাঁদন নামক এক সাঁওতাল চরিত্র রয়েছে যে সাদা শিলাপাথরকেন্দ্রিক ধর্মের ব্যাপারটি বিশ্বাস করে না। কিন্তু কাঁদনের বাবা অর্থাৎ মোড়ল, কাঁদনের স্ত্রী ও গ্রামবাসী টিলার উপরের সাদা শিলাপাথরকেন্দ্রিক সংস্কার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে অতিথিকে আঘাত করলে এই শিলাপাথর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে এবং চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হবে। তাই কাঁদন অতিথি অমল চৌধুরীকে আঘাত করলে কাঁদনের বাবা ও তার স্ত্রী অমলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কাঁদন নিজেও ক্ষমা চেয়েছে। মোড়ল তাদের ধর্মীয় সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে অমল চৌধুরীকে বলেছে–

মোড়ল আমাকে বললে, ই দিনটি তোমাকে থাকতে হবেক। অতিথি কাঁদনের ঘরে ক্ষীর আর মধুর পায়েস খেতে হবেক। না খেলে কাঁদনের নরক হবেক। গোটা গাঁয়ের সর্বনাশ হবেক। ওই পাহাড়ের মাথায় ওই যে সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবেক। ওই পাথর কালো হলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে উঠবেক। তারপর বাতাসে উঠবে মড়া পোড়ানোর গন্ধ। ... নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; দুই-চারি-পাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়াপোকা লাগবেক; পাখিগুলান ডাকবে শকুনের ডাক; বাঁশের বাঁশি বোবা হয়ে যাবেক; তারপর সুরুয ঠাকুরের সোনার বরণ হয়ে যাবে সীসার মতন, আঁধার হয়ে যাবে। পৃথিবী-আ–ধা–র– (৩/১৪২)

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষানুক্রমিক আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় এই ধর্মীয় সংস্কার পালন করে আসছে। সাদা শিলাখণ্ডটির মধ্যে তারা দেবত্ব আরোপ করেছে এবং শিলাখণ্ডটিকেই তাদের জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রতিমূর্তিরূপে বিবেচনা করেছে। তাই ভূমিধসের পরও কাঁদনের স্ত্রী ও গ্রামবাসী সেই সাদা পাথর খুঁজে বের করেছে। এ সংস্কার যেন রাঢ়ের অন্ত্যজ আদিম ধর্মীয় সংস্কারের এক প্রাগৈতিহাসিক দলিলরূপে গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে।

'কমল মাঝির গল্পে' আদিবাসী প্রান্তিক সাঁওতাল চরিত্রের ধর্মীয় সংস্কারের এক অনন্য বর্ণনা পুষ্পিত হয়েছে। কমল মাঝি লেখককে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কারের কথা উল্লেখ করে বলেছে–

আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল। জলের নিচে মাটি ছিল। তখন ঠাকুর জীউ অর্থাৎ ভগবান জলজীব কাঁকড়া, হাঙ্গর, কুমির, রাঘব, বোয়াল, শোল, চিংড়ি মাছ, কেঁচো, কচ্ছপ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। তারপর ঠাকুর বললেন- এবার কাদের সৃষ্টি করব? মানুষ সৃষ্টি করবার ইচ্ছা হল তাঁর। তিনি মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেন; মানুষ তৈরী শেষ হলে প্রাণ দেবেন সেই মানুষে, এমন সময় আকাশ থেকে 'সিঞ্ সাদম' অর্থাৎ সূর্যের ঘোড়া নেমে এসে পায়ে দলে মানুষটি ভেঙে দিলে। সৃষ্টি নষ্ট হওয়ায় ঠাকুর খুব দুঃখিত হলেন।

তখন ঠাকুর ঠিক করলেন- আর কোন কিছু মাটি দিয়ে তৈরী করবেন না। তাই পাখি সৃষ্টি করলেন নিজের বুকের ময়লা দিয়ে। তৈরি করলেন হাঁস এবং হাঁসালী পাখি। এ দুটি হাতের ওপরে রেখে দেখতে লাগলেন, খুব সুন্দর লাগায় ঠাকুর ফুঁ দিলেন। পাখিরা ঠাকুরের ফুঁয়ে প্রাণ পেয়ে আকাশে উড়ে গেল। সেই সময় 'সিঞ্ সাদম' 'ওড়ে সুগম' অর্থাৎ সূর্যের ঘোড়া পবিত্র সুতোর সাহায্যে জলখাবার জন্য আকাশ থেকে নেমে এল। জল খাবার সময় 'সিঞ্ সাদম' মুখের ফেনা ফেলে গেল জলের উপরে। ফেনা জলে ভাসতে থাকল এবং এই থেকেই জলের ফেনা সৃষ্টি হল।

ঠাকুর তখন পাখি দুটোকে বললেন-যাও ফেনার উপরে বস। পাখি দুটো ফেনার উপরে বসল এবং জলে জলে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফেনা যেন তাদের নৌকা হল। কিছুদিন পর পাখিরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললে- ঘুরেই তো শুধু বেড়াচ্ছি, খাবার তো কোথাও পাচ্ছি না।

ঠাকুর কুমিরকে ডেকে পাঠালেন। কুমির এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে–ঠাকুর আমাকে ডেকেছেন কেন?

ঠাকুর বললেন কুমির-মাটি তুলে আনতে পারবে জলের তলা থেকে?

কুমির জানাল-ঠাকুর আদেশ পেলেই তুলে আনব। কুমির ঠাকুরের নির্দেশে জলের তলা হতে মাটি আনছিল, কিন্তু সেই সমস্ত মাটি জলেই গলে গেল।

চিংড়ি মাছকে ডাকলেন ঠাকুর। চিংড়ি মাছ এল। চিংড়ি বললে-ঠাকুর আমাকে স্মরন করেছেন?

ঠাকুর তাকেও বললেন–মাটি এনে দিতে পারবে?

চিংড়ি মাছ বললে–আপনার আদেশ পেলে নিশ্চয় পারব। ঠাকুর বললেন নিয়ে এস মাটি।

Dhaka University Institutional Repository

চিংড়ি জলে ডুবে দাঁড়ায় করে মাটি আনতে আনতে দেখলে সব মাটিই গলে যাচ্ছে। সেও পারলে না। এবার রাঘব বোয়ালকে ঠাকুর ডাকলেন। রাঘব বোয়াল এসে প্রশ্ন করলে ঠাকুর আমাকে ডেকেছেন কেন? ঠাকুর বললেন– মাটি এনে দিতে পার?

রাঘব বোয়াল উত্তর দিলে–আপনার আদেশে নিশ্চয় পারি এই বলে সে জলের নীচে নেমে গিয়ে কিছু মাটি মুখে কামড়িয়ে এবং কিছু নিজের পিঠে চাপিয়ে জলের ওপরে উঠতে লাগল কিন্তু উপরে এসে দেখলে সব মাটি জলে ধুয়ে গেছে। সেই সঙ্গে পিঠের আঁশও আর নেই, মাটির সঙ্গে উঠে গেছে। সেই সময় হতে বোয়াল মাছ আঁশশূন্য হল।

তারপর ঠাকুর ডাকলেন পাথুরে কাঁকড়াকে। সে এল এবং বললে–কেন ডেকেছেন ঠাকুর?

ঠাকুর বললেন মাটি তুলতে পারবে?

কাঁকড়া ঠাকুরকে উত্তর দিলে–আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই পারি।

কাঁকড়া জলে নেমে দাঁড়ায় করে মাটি আনবার সময় বুঝলে মাটি গলে যাচ্ছে জলের স্পর্শে। সেও ব্যর্থ হল।(৩/৩১৬–৩১৭)

কমল মাঝি এরপর কেঁচো-কচ্ছপের কথা বলেছে লেখককে। কেঁচো জলের নিচ থেকে মাটি আনতে রাজি হয় তবে কেঁচো ঠাকুরকে বলে জলে যেন কচ্ছপ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এরপর ঠাকুর কচ্ছপের চারটি পা শক্ত করে শেকল দিয়ে চার কোণে টান করে আটকে দিলেন। কেঁচো মুখ দিয়ে মাটি তুলে লেজ দিয়ে সেই মাটি কচ্ছপের পিঠের ওপরে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবী মাটিতে পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেঁচো এই কাজ করে। পৃথিবী পূর্ণ হলে কেঁচো মাটি তোলা বন্ধ করে।

মাটি তোলা শেষ হলে ঠাকুর মাটিতে মই দিতে বললেন। মই দিতে গিয়ে স্থানে স্থানে মাটির স্তূপ সৃষ্টি হওয়ায় মই আটকে গেল। সাঁওতালরা এই ঘটনার পর থেকে বিশ্বাস করে এই মাটির স্তূপ থেকে পরবর্তীতে পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত সৃষ্টি হয়েছে।

যে ফেনাগুলি জলে ভাসছিল সেগুলি মাটিতে আটকে গেল। ঐ ফেনার ওপরে ঠাকুর বেনা বীজ বুনলেন এবং তাতে প্রথম বেনাগাছের জন্ম হল এরপর ঠাকুর দূর্বা ঘাসের বীজ বুনলেন; তার পিছনে করম গাছ, তারপরে সরজম গাছ অর্থাৎ শাল, ক্রমে আসন, মহুয়া এবং আরও নানা রকম গাছের বীজ। ...এদিকে গাছের ঝোপে ঐ পাখি দুটি বাঁসা বেঁধে দুটি ডিম পড়লে। স্ত্রী পাখিটি তা দেয় আর পুরুষটি খাদ্য সংগ্রহ করে। ক্রমে ডিম দুটি ফেটে বাচ্চা হল। কি আশ্চর্য! এই বাচ্চা দুটি তো পাখির বাচ্চা নয়! এ তো মানুষের বাচ্চা! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে!(৩/৩১৮)

এরপর কমল মাঝি লেখককে বলেছে পাখি দুটি ছেলে মেয়ে দুটোকে রাখার জন্য হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে এসে হাজির হয়। ঠাকুর হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে ছেলে মেয়ে দুটিকে রাখবার অনুমতি প্রদান করে।

ছেলে মেয়ে দুটিকে দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে হাঁস হাঁসালী পাখি দুটি কোথায় চলে গেল। তারা যে কোথায় গেল সে কথা আমাদের পূর্বপুরুষ বলে যাননি, তাই আমরা জানি না। এই পর্যন্ত বলে কমল মাঝি হাত জোড় করে ঊর্ধ্বদিকে মুখ করে নমস্কার করলে। সম্ভবত ঐ পাখি দুটির উদ্দেশে।

Dhaka University Institutional Repository

এই মানুষ দুটির নাম 'হাড়াম' এবং 'আয়ো'–কমল মাঝি আবার বলতে শুরু করলে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা।

কেউ কেউ বলে 'পিলচু হাড়াম' 'পিলচু বুড়ো' এবং 'পিলচুবুড়ি' অর্থাৎ পিলচু বুড়ি। সেই হিহিড়ী পিড়ড়ী দ্বীপে তাঁরা সুত্বুবুকূচ ঘাস ও শ্যামা ঘাসের বীজ খেয়ে বেড়ে উঠলেন। এই উরাই হলেন মানুষদের বাবা আর মা। উয়াদের হল ছেল্যা- পিলা। বেটা বিটি।' (৩/৩১৯)

কমল মাঝির এই বিশ্বাসবোধ ধর্মীয় সংস্কারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সৃষ্টিরহস্য বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত এই মিথ তাদের ধর্মীয় সংস্কারেরই প্রতিভূ হিসেবে যুগ-যুগান্তর ধরে পূর্ব-পুরুষ হতে উত্তর-পুরুষ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

'সখী ঠাকরুন' গল্পে ধর্মীয় আচার সংস্কারের রূপটি চমৎকারভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে। গল্পকার তারাশঙ্কর সখী ঠাকরুনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিল্বগ্রামে সখী ঠাকরুন সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কারকেই তুলে ধরেছেন–

ময়ূরাক্ষীর উত্তরে সাঁইথিয়া কাঁদী রাধারঘাট পর্যন্ত যে প্রাচীন কালের মেটে সড়কটা বর্তমানে পিচ দেওয়া পাকা রাস্তাতে রূপান্তরিত হয়েছে, এর উত্তর দক্ষিণে একটা সুপ্রাচীন অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে অনেক প্রাচীন গ্রামের অনেক প্রাচীন নিদর্শন আছে। তারই মধ্যে একটি গ্রাম বিল্বগ্রাম। বিল্বগ্রামের দেবীর নাম বিল্ববাসিনী তিনি নাকি অন্যকেউ নন– তিনিই নাকি মদনভস্মে হতমানিনী উমা, এখানকার এই বিল্বতলে এসে দুশ্চর তপস্যা শুরু করেছিলেন, তাঁর তপস্যায় আকৃষ্ট শিব এসে দ্বারপ্রান্তে ভিক্ষুনাথ রূপে দাঁড়িয়ে আছেন, আর এই দেবস্থানে তপস্বিনী উমার আজ্ঞাবাহিনী এবং সকল কিছুর ভার নিয়ে রয়েছেন যিনি–তিনি জয়া-বিজয়ার মতই তাঁর সখী। তিনিই এখানে সর্বময়ী। তিনি কুমারী, তিনি ব্রহ্মচারিণী। তারই নাম সখী ঠাকরুন। (৩/৮০৩)

এই সখী ঠাকরুনের পদ অলংকৃত করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় রীতি-আচার-সংস্কার পালন করতে হয়। গল্পে এই আচার-বিধি প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন–

পনের পার হয়ে ষোলতে পড়বে সে। তখনও এক মাস বাকী ছিল। বিল্ববাসিনীতলায় অনুষ্ঠান হয়েছিল। সে গেরুয়া রঙা লালপেড়ে শাড়ী পরেছিল। মালা পরেছিল আকন্দফুলের মালা আর গাঁদাফুলের মালা। তার হাতে দিয়েছিল–ত্রিশূল আর কাজললতা একখানা। বলেছিল–বিয়ের কথা ভেবো না, পুরুষের দিকে চেয়ো না। হরগৌরীর মিলনের পর তোমার কথা! বিয়ে হয়ে গৌরী যাবেন কৈলাসে–তুমি যাবে সঙ্গে। তুমি সখী ঠাকরুন। (৩/৮০৫)

রাঢ়ের ব্রাত্য জনজাতি ধর্মীয় সংস্কারকে তাদের জীবনের মঙ্গলের প্রতীক বলে জেনেছে। তবে প্রান্তিক এইসব মানুষেরা ধর্মীয় আচার-সংস্কার মেনে চলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উদারপন্থী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। এদের 'ধর্মাচারে শাস্ত্র বিরোধী চেতনার স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয় লৌকিক জীবনে ও লোকায়ত যাপনে বেদ-ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অনুশাসিত ধর্মের প্রভাব নেই বরং বৈষ্ণব, শাক্ত, ধর্মঠাকুর, বাউল প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়, অশিক্ষিত অসহায় গ্রামীণ মানুষের আশ্রয়স্থল। নিম্নবর্গের মানসজগতের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মাচারে। তবে নিম্নবর্গের ধর্মাচারে উচ্চবর্গের আচারবিশ্বাসের গ্রহণ- বর্জন চলেছে নানামাত্রায়। উচ্চবর্গ বা শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের নিরঙ্কুশ বর্জন নয় বরং তাকে আত্মস্থ করে সহজ সাধনার পথে চলেছে লোকধর্ম।'[১] তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের সহজীকরণ রূপটিকেই নিবিড় মমতায় উপস্থাপন করেছেন।

বেদে, বেদেনী ও সাপুড়ে সংস্কার

তারাশঙ্কর রাঢ় ভূমির প্রান্তবাসী জনমানুষের ঐতিহ্যমথিত সঙ্ঘবদ্ধ জীবনাচারের শৈল্পিক স্ফুরণ ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যিক তুলির সাবলীল স্পর্শে; আপন সহজাত ক্ষমতায় এইসব আদিম তমসাচ্ছন্ন প্রান্তীয় নারী-পুরুষের রহস্যঘেরা জীবনের বিভিন্ন পর্ব ও পর্বান্তর, রূপ ও রূপান্তর, সংস্কার ও সংস্কৃতির ক্রম-প্রসারমান উত্থান ও পতনকে তিনি দৃশ্যমান করে তুলেছেন জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে। ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর বহুচর্চিত সংস্কার ও সংস্কৃতির ঋদ্ধ সম্ভার থেকে তিনি শিল্পের ক্ষুধা মেটানোর প্রয়াসে তুলে ধরেছেন পূর্বপুরুষ এবং উত্তরপুরুষের অকথিত ইতিহাস। বেদে, বেদেনী সাপুড়ে জীবনের নানাবিধ সংস্কার এক্ষেত্রে তাঁর গল্পে এনে দিয়েছে আদিমতার ঝাঁজ ।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখ সাপের ওঝা। কুৎসিত ও কদাকার চেহারার অধিকারী খোঁড়া শেখ সাপকে ভালোবাসে। সাপের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিকৃত যৌনচেতনা ও আদিম সংস্কারের প্রচ্ছন্ন আভাস গল্পটিতে মূর্তমান হয়ে উঠেছে। সাপের সঙ্গে ওঝা বা বেদে জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির পিছনে নিহিত রয়েছে আদিম সংস্কারের ইঙ্গিত। খোঁড়া শেখের পুরুষোচিত অস্বাভাবিক আচার ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বোহেমিয়ান সংস্কারের দিকটি দীপ্র হয়ে উঠেছে। নাগিনীকে বিবি সম্বোধন করে তাকে ঘটা করে সিঁদুর দিয়ে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে খোঁড়া শেখের চরিত্রে আদিম সংস্কারের দিকটি প্রকাশমান হয়েছে:

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপের মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল। (১/৩৭০)

'বরমলাগের মাঠ' গল্পে বেদে জীবনের সংস্কারের চিত্র উঠে এসেছে ভিন্নতর এক বর্ণনায়। নটবর বাউরি যৌবন বয়সে এক বেদেনী লালমণির রূপজ মোহে আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে যাযাবর জীবন-যাপন করে। এক

[১] মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্করের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে লালমণির মৃত্যু ঘটে। নটবর লালমণির কাছ থেকে সর্পবিদ্যা ও কাঁউরের ডাকিনীর মন্তর শিখেছিল। কিন্তু লালমণি তাকে পুরোপুরি শেখায়নি। এক্ষেত্রে লালমণির বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্রটি গল্পে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে–

সে (লালমণি) জানত কাঁউরের ডাকিনীর মন্তর। নটবরকে মন্তর শিখিয়েছিল, বিদ্যা দিয়েছিল, কিন্তু সব দেয় নাই। পাছে তার মন্তরের মায়া কেটে সে পালায়, তাই দেয় নাই। পালালে নটবরকে মেরে ফেলত বান মেরে কি নাগ ছেড়ে দিয়ে। যেখানে যাক না কেন, সে নাগ তাকে না মেরে ছাড়ত না। লোহার বাসরঘরের সরষে-প্রমাণ ছিদ্দ বিষ-নিশ্বেসে বড় হয়েছিল। সেই পথে ঢুকে লখাইকে ডংশেছিল কালীনাগ। তেমনই করে ঘরে হোক, পাহাড়ের আড়ালে হোক যেখানে থাকত ডংশাইতো নটবরকে। (৩/১৮৩)

কাঁউরের মন্ত্র জানা ডাকিনী বাউরি নটবরকে ঘিরে গ্রামের মানুষদের সংস্কারের চিত্র উঠে এসেছে গল্পটিতে–

হাজার হলেও গুণীন মানুষ। কত উপকারে লাগবে। তাছাড়া, ভয়ও আছে। কুহুকী বিদ্যায় অঘটন ঘটাতে পারে ডাকিনী বাউরী। (৩/১৮৪-৮৫)

গ্রামবাসীরা বরমলাগকে হত্যা করতে বললে নটবর ঘরের লোকদেরকে তার বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে বলেছে:

বরমলাগ শিবের গলার পৈতে, লাগের নিশ্বাস পড়ে শিবের নাকে যায়, তাতেই বাবার চোখ হরদম ঢুলুঢুলু। ওর পিতিকার নাই, যমের যমদণ্ডের কাঁটা নিয়ে ওর দাঁত তৈরি হয়েছে। (৩/১৮৫)

'বরমলাগের মাঠ' গল্পে বরমলাগকে নিয়ে লেখক নানা ধরনের মিথ-বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্রকে মূর্ত করে তুলেছেন। ডাকিনী বুড়ো নটবর মৃত্যুর পূর্বে তার উত্তরপুরুষ বলরামকে তার সংস্কার বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছে-

নাগ হলেন দেবতা। নাগের আত্মা ছাড়বেন না, শোধ দেবেন। মাটির ওপরে হঠাৎ কোনদিন সামনে ফণা তুলে দাঁড়াবেন, পরাণের বদলে পরাণ লেবেন। (৩/১৮৯)

'বরমলাগের মাঠ'-এ বেদে সংস্কার ও বিশ্বাসের বিচিত্র চিত্র ফুটে উঠেছে। পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত এইসব বিশ্বাস ও সংস্কার একটা সময় কিংবদন্তির মতো মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

'সাপুড়ের গল্প'-এ লেখকের বর্ণনায় সাপুড়ে বা বেদে জনজাতির বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র উঠে এসেছে। লেখকের বর্ণনায়–

Dhaka University Institutional Repository

খাঁটি ও খাস সাপুড়ে জাতের যারা–তাদের তো আর কথাই নেই। খাল-বিলের কাছে পতিত প্রান্তরে সেই আরণ্যযুগের ঘর-দুয়ারে বাস করে, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, নাচ-গান, ভিতর-বাহির দেহ মনও তাই–সেই আদিম এবং আরণ্য। চেহারায় পর্যন্ত সেই ছাপ। (৩/৩৬০)

গল্পটিতে লেখক কালী বেদেনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বেদেদের বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র বাঙ্ময় করে তুলেছেন। রাঢ়ের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে এই যাযাবর জাতির বিচরণ ক্ষেত্র উল্লেখ করে তাদের সংস্কারের চিত্রগুলি দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন–

দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়ায় সাপুড়ের দল। মুর্শিদাবাদ বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর পর্যন্ত। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে এক গ্রামে ফেলেছিল ডেরা। শুশুনিয়া পাহাড় ওদের না জানার জায়গা নয়। এখানে ওরা সাবধান। ভোর বেলায় আগে কেউ বাইরবি না। দিনমণি চাকিতে চাকিতে থাকতি থাকতি ডেরায় ফিরবা। সিঁধেল চোর লয়রে মানিক, ডাকাত আছে ওৎ পেত্যা। মানে সাপ নয় বাঘ। সাপ সিঁধেল চোর, বাঘ ডাকাত। আঁধার নামলে বন থেকে লাল গামছা মাথায় বেঁধ্যা পথের ধারে বস্যা হাই তুলবে, এই লম্বা জিব বার কর্যা আপন মুখ চাটবে। শিয়াল ডাকিলে পরে বেদেরা লিবে না ঘরে। ঘরে না নিলে পথে থাকে; চলে যাও যে দিকে দু-চোখ যায়। এখানে কিন্তু শিয়াল ডাকে না, ফেউ ডাকে; ফেউ ডাকলে কেউ নাই, আছে বাঘা ডাকাত, সকল পথের শেষ–সাবধান (৩/৩৬১)

রাঢ়ের আদিম অনার্য জীবনের সংস্কারের ক্রমায়তধারা বিদ্যমান থেকেছে এই জনপদে বসবাসরত প্রান্তবর্গীয় জনজাতির অস্তিত্বের গহীনে। বেদে, বেদেনী বা সাপুড়ের মতো জাতিগোষ্ঠী সর্বদাই লালন করেছে তাদের পূর্বপুরুষদের আচরিত সংস্কার ও বিশ্বাসকে। প্রজন্মের হাত ধরে কাল বহতা নদীর মত বয়ে গেছে; কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের ভবঘুরে এই বেদেগোষ্ঠীর জীবন এখনও আদিম সংস্কারের অনড় বন্ধনে বাঁধা।

পটুয়া সংস্কার

বীরভূমের পানুড়ে ও ইটাগড়িয়ায় পটুয়াদের বসতি লক্ষ করা যায়। রাঢ়ের এই প্রান্ত জনজাতির প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে নান্দনিক শিল্পসৌকর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। পটুয়া জাতির উদ্ভব সম্পর্কে গুরুসদয় দত্ত পটচিত্রকারের কাছ থেকে একটি কিংবদন্তি সংগ্রহ করে বলেছেন– 'পটুয়ারা বিশ্বকর্মার বংশধর, মহাদেবের বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি আঁকলে তুলির অবমাননায় মহাদেব অভিশাপ দেন- 'তোরা ছোট হয়ে সমাজে থাকগে'। সব জ্ঞাতিরা একত্রে মহাদেবের কাছে জীবিকা সম্বন্ধে সাশ্রুনেত্রে অনুরোধ করলে তিনি বলেন 'তোরা হিন্দুও হবি না মুসলমানও হবি না। তোরা মুসলমানের রীত করবি আর হিন্দুর কর্ম করবি

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ছবি আঁকবি ও পড়বি।' দত্ত মহাশয় পটুয়াদের কাছ থেকে শোনা উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'সেই থেকে আমরা মুসলমানের মত নামাজ পড়ি।' এখানে মহাদেবের অংশটুকু কাল্পনিক, কিন্তু বাকি অংশ যেমন পটুয়ারা মুসলমানের মত নামাজ পড়ে হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকে ও গান গায় ইত্যাদি বিষয় মোটেই অসত্য নয়। মহাদেব যখন অভিশাপ দিচ্ছেন তখন মুসলমানরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে। মুসলিম বিজয়ের পর বৌদ্ধরা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি করে।'[১] এই বক্তব্যের সঙ্গে বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের সুদর্শন চিত্রকরের অভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'আগে আমরা নামাজ করতাম না, নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করতাম। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের ঘৃণা করতেন এবং সমাজে কোন স্থান দিতেন না। তখন মুসলমানরা আমাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। দুঃখে ও অভিমানে আমরা তাদের ধর্মই গ্রহণ করি। কিন্তু করলে কি হবে, তার আগে হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠানে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, তাই অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আজ তাই আমাদের ঐ নামাজটুকু ছাড়া বাকি সব আচারই হিন্দুর মত। আমাদের মেয়েরা শাখা সিঁদুর পরে, আমরা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি আঁকি, পুজো করি অথচ নামাজও পড়ি। আমাদের নামাজটাই হলো ব্রাহ্মণের অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।'[২] পটুয়াদের জীবনের নানাবিধ আচার-সংস্কারের চিত্র তারাশঙ্কর তার গল্পে বর্ণশোভিত করে তুলেছেন। 'কামধেনু' গল্পে পটুয়া শ্রেণির বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র গল্পকারের বর্ণনায় চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে–

হঠাৎ কি যে হল! জানেন খোদাতায়ালা, জানেন ভগবান গোলকপতি হরি, জানেন পয়গম্বর, জানেন মুনি-ঋষিরা, সাধু-মহাত্মারা। তাই-বা-কেন? নাথুও জানে। জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভরে গেল দুনিয়া। পাপের ভারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মহামারণ চলতে লাগল, তার আর বিরাম নাই। সে বছর বানে দেশ ডুবে গেছে। ফিরে বছরে শীতকালে মাঘ মাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে। (৩/০৬)

পটুয়ার ছেলে নাথু বিশ্বাস করে কামধেনুকে বিক্রি করা এবং বিষপান করিয়ে হত্যা করার কারণে তার জীবনের করুণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। তাকে ফাঁসির মঞ্চে হাজির হতে হয়েছে। এ ফাঁসি তার পাপেরই ফসল–এই সংস্কারে সে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সে বলেছে–

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি* , ১৯৭৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯

[২] বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, (১ম খণ্ড), ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩১১

Dhaka University Institutional Repository

অ্যায়, খোদাতায়ালা, রসুলে আল্লা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লা! হে ভগবান, হে গোবিন্দ! মাফ কর! আমার সকল পাপ, সকল গোনাহ, মাফি মঞ্জুর হোক। আমার ফাঁসি হোক। (৩/১১)

রাঢ়ের পটুয়া জনজাতির সংস্কার ও বিশ্বাসে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের দ্বৈত প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে এই সম্প্রদায়ের সরব উপস্থিতি-ই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রাঢ় অঞ্চলে এদের আনাগোনা একটা সময়ে প্রাণোচ্ছল ছিল। এদের বিশ্বাস ও সংস্কারে তাই এ অঞ্চলের আচার বৈশিষ্ট্যই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে।

লোকবিশ্বাস লোকাচার ও লোক সংস্কার

তারাশঙ্কর লাভপুরের সন্তান। বীরভূমের লাভপুর, কুর্ণাহার, বক্রেশ্বর, সাঁইথিয়া, পানুরিয়া, আহম্মদপুর, চৌহাটা, ময়ূরেশ্বর, দুবরাজপুর, নানুর, সিউড়ি, রাজনগর প্রভৃতি স্থানে এবং রাঢ়ভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলে গল্পকার তারাশঙ্কর পরিভ্রমণ করেছেন। এ অঞ্চলের প্রান্তবর্গীয় শ্রেণিগোষ্ঠীর লোকবিশ্বাস, লোকাচার ও লোকসংস্কারকে তিনি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। নানা বর্ণ-উপবর্ণ, জাতি-ধর্ম ও পেশার হরিজনদের সঙ্গে তিনি নিঃসঙ্কোচে মিশেছেন। এইসব অপাঙ্‌ক্তেয় জনচরিত্রের প্রতি তার সীমাহীন আগ্রহের ও কৌতূহলের শিল্পিত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় তার-ই সাহিত্যের সম্ভারে। 'কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক। মনের আকাশে কতক বিশ্বাস অদৃশ্য ধূলিকণার ন্যায় তরল অবস্থায় ভেসে বেড়ায়; সেগুলি জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কতক লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলি মনের গভীরে স্থান পায়। আচরণসিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে আমরা 'সংস্কার' নাম দিতে পারি।'[১] রাঢ়ের প্রান্ত জনগোষ্ঠীর লোকবিশ্বাস, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, যাদুবিদ্যা, কবচ-মাদুলি-শিকড়-মাকড়-মানত, বাণমারা, বশীকরণ, কুনজর, পিছুডাক, টোটেম বা ট্যাবু সংস্কার, ডাইনি বিশ্বাস, গো-আচার, জন্ম ও মৃত্যু আচার ছাড়াও বিবিধ আচার, সংস্কার ও বিশ্বাসের অনন্য দৃষ্টান্ত তারাশঙ্কর তার ছোটগল্পের রঙিন পটভূমিতে ছন্দময় করে উপস্থাপন করেছেন। 'কেবল লোকাচার ও লোকসংস্কারের মধ্যে যে কোন জনগোষ্ঠীর সামাজিক

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমবিকাশের অতীতের স্তরগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।'[১] এদিক থেকে রাঢ়ের লোকাচার ও লোকসংস্কার থেকে এ অঞ্চলের প্রান্ত জনজাতির সার্বিক জীবনাচারের চিত্র তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

যাদুবিদ্যা-তন্ত্রমন্ত্র-ঝাড়ফুঁক

তারাশঙ্করের গল্পে বর্ণিত প্রান্তিক জনমানসের বিশ্বাস ও সংস্কারে যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকের সক্রিয় প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। 'সকল সংস্কারের মূলে আছে অমঙ্গল চিন্তা। অর্থহানি, স্বাস্থ্যহানি, শাস্তিভোগ, বিচ্ছেদ-বিড়ম্বনা ও বিপদ-আশঙ্কা থেকে অমঙ্গল চিন্তার উদ্ভব। অকল্যাণের মূলে আছে অপদেবতার কোপ, শয়তানের দুষ্ক্রিয়া, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি। এদের প্রভাব থেকে মুক্তি প্রয়োজন। লৌকিক উপায়ে মুক্তির দুটি পথ–মন্ত্র ও ক্রিয়া... মন্ত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা কখন একত্রে, কখন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়। এসব মন্ত্র ও ক্রিয়ার কার্যফলের পেছনে যে শক্তির প্রভাব আছে তা হল যাদুবিদ্যা। ...বিশ্বাস থেকে যে সব লোক-সংস্কার গড়ে উঠে যাদুবিদ্যা তাদের অন্যতম।'[২] 'বরমলাগের মাঠ' গল্পে যাদুবিদ্যার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ডাকিনী বাউরি নটবর বরমলাগকে ধ্বংস করার জন্য কাঁউরের যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছে-

কাঁউরের মা-কামিখ্যের হুকুম, বিষহরির দোহাই, ওই হল লক্ষ্মণের গণ্ডীবন্ধনের আঁক। রাম সীতা লক্ষ্মণের দোহাই! (৩/১৮৬)

'সাপুড়ের গল্প'-এ সন্ন্যাসী কালী বেদেনীর সাপকে দমন করতে যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছেন–

প্রকাণ্ড সাপটা উঠল মাথা নিয়ে কিন্তু সন্ন্যাসী তার আগেই ঝুলিতে হাত পুরে কি একমুঠো বের করে রেখেছিল- ফ্যাং গঙ্গারাম-বোম শঙ্কর-বলে-চীৎকার করে সেই মুঠোর ধূলোর মতো বস্তুটুকু দিলে সাপটার মুখে চোখে ফনায় ছিটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কাণ্ড। সাপটা মাথা নুইয়ে একেবারে কেঁচোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটিয়ে গেল।(৩/৩৬১–৬২)

যাদুবিদ্যায় গোপনীয়তা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। 'মানুষের চুল, নখ, গায়ের ময়লা, জীব-জন্তুর হাড়, চামড়া, দাঁত, মাংস, পাখির পালক, নখ, মাংস, রক্ত; গাছ-গাছড়ার ফুল, ফল, লতা, শিকড়, ছাল; জড় বস্তুর মধ্যে মাটি, পাথর, সোনা, রূপা, তামা, লোহা, কড়ি, ঝাঁটা ইত্যাদি উত্তম উপকরণ হিসেবে যাদুবিদ্যার কাজে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ... যাদু হল একটা আর্ট বা কৌশল, যার সাহায্যে মানুষ তার ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনতে ও আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পারে। প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত ঘটনাকে অলৌকিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার নাম

[১] বিনয়ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩
[২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

যাদুবিদ্যা।'[১] রাঢ়ের ব্রাত্য জনসমাজে এই বিদ্যার বহুল চর্চা যে একসময় ছিল তা তারাশঙ্করের গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রাঢ় বঙ্গের অন্ত্যজ জনজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকের আদিম রীতি-নীতি ও সংস্কার সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কৌমবদ্ধ এইসব অসহায় অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অশুভ শক্তির বিনাশে, কল্যাণ বা মঙ্গল কামনার্থে, অমঙ্গল দূরীকরণে, রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে, তন্ত্রমন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয়েছে। 'কীটে দংশন করলে অথবা ভূত-প্রেত, ডাইনি প্রভৃতি দেহে আছর করলে, কুস্বপ্ন বা বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয় পেলে ঝাড়মন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। টোটকা চিকিৎসায় ক্রিয়া আছে, মন্ত্র নেই; ঝাড়ফুঁকে মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠান উভয় বিদ্যমান। অর্থাৎ মন্ত্র পড়ে এবং তৎসঙ্গে কিছু লৌকিক আচার পালন করে রোগীর উপশমের চেষ্টা করা হয়'[২]। তারাশঙ্করের গল্পে তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তৃতীয় খণ্ডের 'ডাইনী' গল্পটিতে ডাইনীর আছর ছাড়াতে রামজী সাধু অবিনাশের উপর যে ঝাড়মন্ত্র প্রয়োগ করেছে তার প্রক্রিয়া ও পরিণাম নিম্নরূপ:

সরষে এল। হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশের গায়ে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা- বাবারে মারে, ওরে মেরে ফেলল রে! ওরে বাবারে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরোনা, আমি যাচ্ছি। (৩/১২২)

'বাউল' গল্পে ঝাড় মন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সর্পদংশনে একটা শিশুর জীবন বিপন্ন হলে বৃদ্ধ বাউল তার ঝাড়মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে সাপের বিষ নামাতে সক্ষম হয়েছে। গল্পকারের বর্ণনায়–

বাউল আসন করিয়া বসিয়া নানামন্ত্র অদ্ভুত সুরে আওড়াইতে আরম্ভ করিল। সে উচ্চারণ ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে যেন একটা মোহের সৃষ্টি করিতেছিল। দর্শকমণ্ডলীর গুঞ্জনালাপ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ...

দোহাই, দোহাই, মহাদেবের দোহাই– যার মাথায় নাচিস, পায়ে লুটোস তোরা। দোহাই মা বিষহরির দোহাই; দোহাই ! আস্তীক মুনির দোহাই।(১/২৪৯)

'কামধেনু' গল্পে পটুয়ার ছেলে নাথুকে ঝাড়মন্ত্র প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এই ঝাড়মন্ত্রের বর্ণনাংশ লক্ষণীয়:

থলিটি খুলে বার করে এক টুকরো খড়ি। হাত দিয়ে সামনের খানিকটা জায়গার ধুলো পরিষ্কার ক'রে নেয়। ... পরিষ্কার জায়গাটার উপর খড়ি দিয়ে তিনটি সমান্তরাল রেখা টানে। তার সামনে নিজের বাঁ হাত পেতে বিড়বিড় করে কতকিছু বলে

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৭-৪৮

[২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭৪- ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

যায়। বিড়বিড় মন্ত্র শেষ ক'রে বেশ চিৎকার করে বললে– দোহাই মা কাঁউরের কামিক্ষে! দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতার! দোহাই রাসুলে আল্লার! দোহাই মুনি ঋষির! দোহাই পীর গাজীর!

যদি কিছু থাকে তো বলিস।

না যদি হয় তো ডাইনে বায়ে চলিস।

হাত তার চলতে থাকে মাটির উপরে। ডাইনে যায় না, বাঁয়ে যায় না- সমান্তরাল রেখা তিনটির মাঝখানে গিয়ে যেন চেপে বসে যায়। (৩/০৪-০৫)

রাঢ়ের প্রান্তিক জনমানসের বিশ্বাস, আচার, সংস্কারের সঙ্গে যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকের একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্ধ আবেগী সভ্যতাবিমুখ মন এই ধরনের সংস্কারকে আরো বেশি প্রশ্রয় দিয়েছে।

বাণমারা

তারাশঙ্কর রাঢ়ের যে জনজীবনকে তাঁর গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন সে জীবন ও জনপদের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে বাণমারা প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 'ঝাড়মন্ত্র ও ফুসমন্তরের ভালমন্দ দুদিকই আছে। কিন্তু বাণমন্ত্র কেবল অনিষ্ট করে। শত্রুকে পঙ্গু বা হত্যা করে শাস্তি দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। বাণমন্ত্র অব্যর্থ, এর অন্য কোন চিকিৎসা নেই, কেবল প্রতিমন্ত্র দিয়ে এর ক্রিয়া রোধ করা যায়। বাণমারা ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার বিষয়। গুণী গোপনীয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করে মন্ত্র পড়ে ও কিছু ক্রিয়া করে শত্রুকে বাণ মেরে থাকে।'[১]শত্রুর চরম অনিষ্ট করার চিন্তা থেকে বাণমারা মন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পটিতে কুসুমপুরের ওস্তাদ প্রৌঢ় নাদের শেখের কার্যকলাপে বাণমারা মন্ত্র প্রয়োগের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়-

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত মাঠের মধ্যে নাদের ছোট্ট একটা উনানে আগুন জ্বেলে সরার মধ্যে কি পাক করছিল। উনানের স্বল্প আলোর প্রভায় দেখা যাচ্ছিল, তার সামনে রয়েছে খানিকটা বালি, কিছু কাঁটা, একটা মরা সাপের কঙ্কাল, একটা কাগজের উপরে কাঁকড়াবিছার হুল। নাদেরের নাকে একখানি ন্যাকড়া বাঁধা। সে উপকরণগুলি একটির পর একটি সরায় ফেলে দিচ্ছিল। সে বাণ তৈরি করছে। ... নাদের একদৃষ্টিতে সরাটার দিকে চেয়ে রইল, নাকের কাপড় ভেদ করেও তীব্র গন্ধে তার বুকটা কেমন করছে, সরাটার উপর থেকে এঁকে-বেঁকে ধোঁয়া উঠছে খেলায় মত্ত সাপের ছানার মত। এ বাণ ছাড়লে আর রক্ষা নেই।(৩/৮২৭)

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

বাণমন্ত্রের মাধ্যমে শত্রুর সার্বিক ক্ষতিসাধন করা হয়। শত্রুকে শারীরিকভাবে পঙ্গু করে বিভিন্ন অঙ্গহানি ঘটিয়ে, মানসিক পীড়াদানে বাণমন্ত্র অব্যর্থভাবে কাজ করে। যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকের মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকলেও বাণমন্ত্রে সাধারণত অকল্যাণই সাধিত হয়।

মাদুলি-কবচ-শিকড়-বাকড় ও মানত

রাঢ়ের প্রান্তস্পর্শী জনপদের অধিকাংশই বিভিন্ন রোগ ব্যাধির উপশম, সন্তানপ্রাপ্তি, অনিষ্টমুক্তি কিংবা স্বপ্নসাধ পূরণের প্রত্যাশায় মাদুলি-কবচ, শিকড়-বাকড়কে প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিবেচনা করেছে। রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজে তাই এসব উপকরণের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। প্রান্তিক জনজাতি এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে অলৌকিক নিরাময়ের শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করে। 'স্থলপদ্ম' গল্পে মাদুলি ব্যবহার করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। গল্পে একজন প্রৌঢ়া তার ছেলেকে মাদুলি নিয়ে শ্মশানে যেতে নিষেধ করেছে–

লসো তু যেন যাস না বাবা। তোর আবার মাদুলি আছে, তোকে শ্মশানে যেতে নেই। (১/৬০)

শ্মশান ঘাট অপবিত্র এবং অমঙ্গলের প্রতীক। প্রান্তিক নারী-পুরুষ মনে করে শ্মশানে ভূত-প্রেত-ডাইনি-পিশাচ থাকে, তাই সেখানে গেলে মাদুলির পবিত্রতা নষ্ট হবে এবং কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস থেকে প্রৌঢ়া তার সন্তানকে শ্মশানে যেতে নিষেধ করেছে।

'মতিলাল' গল্পে সন্তানপ্রাপ্তির আশায় মতিলালের স্ত্রী ভুবনমোহিনী শরীরে মাদুলি ধারণ করেছে। মতিলাল একে একে ভুবনমোহিনীকে পাঁচ-ছয়টা মাদুলি এনে দিয়েছে। সন্তান লাভের আশায় ভুবনমোহিনী এই মাদুলি পরম আগ্রহে ধারণ করেছে–

ভুবন বলিল, হবে তো ছেলেপিলে?

মতিলালের মনে পুলক বাড়িয়া গেল, দাঁড়া, আজ মাদুলি এনে দেব তোকে!

মাদুলি সে আনিয়াও দিল, একটা নয়, একটা একটা করিয়া পাঁচ-ছয়টা মাদুলি ভুবনের বুকে এখন ঝোলে। (১/৪৮৯)

সন্তানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অন্ত্যজ নারীর মাদুলি ধারণ একটা প্রাচীন রীতি। রাঢ়ের প্রান্তিক নারীরা এই রীতি বা সংস্কারকে ঐতিহ্যগতভাবে পালন করে আসছে। 'বোবা কান্না' গল্পে মাদুলি ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শশী ডোম ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের দেওয়া মাদুলি ধুয়ে জল খেয়েছে। তার (শশীর) বিশ্বাস কুইনিনের সঙ্গে মাদুলিধোয়া জল ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য অব্যর্থ–

Dhaka University Institutional Repository

কুনিয়ানের উপকারিতা স্মরণ করার পাশাপাশি 'আরও একটা বল তার (শশীর) ছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের দেওয়া মা-চণ্ডীর আশীর্বাদী দিয়ে তৈরী করা মাদুলি। 'কুনিয়ান' খাওয়ার সঙ্গে মাদুলিটা ধুয়েও সে নিয়মিত জল খেত। ডাক্তারেরা বলেন, ব্র্যাণ্ডি সহযোগে কুইনিনের কার্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর ধারণা, ভট্টাচার্যের মা-চণ্ডীর মাদুলি ধোয়া জল সহযোগে ডাক্তারী 'কুনিয়ান' অব্যর্থ। (২/৪৭২)

'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে ডাক্তার বেদেনীর দেওয়া পোকাটি গ্রহণ করেছে। বেদেনী পোকাটি ডাক্তারকে দিয়েছে মাদুলিতে পুরে ব্যবহার করার জন্য–

বেদেনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে একটা পোকা ডাক্তারের সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, মাদুলি করে ধারণ করবেন বাবু, কেউটের মাথার এঁটুলি কাঁচামানিক। (৩/৮২৬)

ডাক্তার পোকাটি প্রত্যাখ্যান না করে সেটিকে পরম যত্নে গ্রহণ করেছে।

'বাউল' গল্পে দেখা যায় প্রৌঢ় বাউল মন্ত্রবলে একটা সাপে কাটা শিশুকে বাঁচিয়ে তোলে। বিষ নেমে গেলে যে সাপটি শিশুটিকে কামড় দিয়েছিল তাকে বাউল হাঁড়িবন্দি করে, এবং শিশুটির জন্য একটা শিকড় প্রদান করে, যেটি তিনটি গোলমরিচ দিয়ে বেঁটে খাওয়াতে হবে–

একটা হাঁড়ির মধ্যে সর্প শিশুকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। তারপর একটি শিকড় বাহির করিয়া নবীনের হাতে দিয়া বাউল কহিল– জল ঢালুন খুকীর মাথায়। জ্ঞান হবে। জ্ঞান হলে এই শিকড়টি গোলমরিচের সঙ্গে বেঁটে খাইয়ে দেন। তিনটি গোলমরিচ। (১/২৪৯)

'সখী ঠাকরুন' গল্পে সখী ঠাকরুন শ্যামাদাসী নতুন সখী ঠাকরুন এলোকেশীকে যৌবন অটুট রাখার জন্য শিকড় খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। শ্যামাদাসী বিশ্বাস করে এই শিকড়বাটা নারীর যৌবনকে স্থায়ী করে-'একটা শেকড় বাটা, তার সঙ্গে আরও যেন কি-কি তার (এলোকেশীর) সামনে এগিয়ে দিয়েছিল শ্যামাদাসী। খেয়ে নে।

এক ঢোকেই শেষ করিস। বড় তেজী।

-কিন্তু খাব কেন মাসী? কিসের জন্য খেতে হবে?

-এ খেলে আর কোঁক ফলবে না। (৩/৮০৫)

যৌবনকে অক্ষুণ্ন রাখার উপায় হিসেবে শ্যামাদাসীর এ সংস্কার এ অঞ্চলের লোকবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করেছে। রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের মনোজাগতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নানা প্রকার মানতের আশ্রয় নেয়। ব্যক্তিজীবনে অতি গোপনীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় অন্ত্যজ মানুষেরা নানা ধরনের মানত

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে থাকে। মানতের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়ে পড়লে মানত কার্যকরী হয় না। তাই মানতকারীকে মানতের ইচ্ছার বিষয়টি গোপন রাখতে হয়। মানতকারী অনেক সময় মানত পূরণের আকাঙ্ক্ষায় অলৌকিক শক্তির উদ্দেশ্যে নানা ধরনের অর্ঘ্য উৎসর্গ করে। অনেক সময় মানত করে বাসনা পূরণের লক্ষ্যে বট, বৃক্ষ, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র বৃক্ষে প্রান্তবর্গীয় মানুষেরা ঢেলা বেঁধে রাখে। তারাশঙ্করের 'স্থলপদ্ম' গল্পে এই মানতের ধরন চিত্রিত হয়েছে বেলে নামক অন্ত্যজ নারীর আচরণে–

মা বুড়ীকালী জাগ্রত দেবতা। যে যাহা মানত করিয়া কালী তলার বটগাছের ঝুরিতে ঢেলা বাঁধিয়া আসে তাহাই পূরণ হয়; গাছটির ঝুরিতে বোধ হয় লাখ খানেক ঢেলা ঝুলিতেছে। ঢেলার ভারে গাছটাই হয়তো ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি? লক্ষগুণ মানুষের অপূর্ণ সাধের যদি ওজন থাকিত তবে সে ওই ঢেলাগুলার চেয়েও বেশি হইত। বেলে ঝুরিতে একটা ভারী ঢেলা বাধিতে লাগিল। কে পিছন হইতে বলিল, 'কি মানত করলি বেলে?

বেলে ঘুরিয়া দেখিল প্রশ্নকারিণী গ্রামেরই বামুনদের মেয়ে, সে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, 'বলতে নেই ঠাকুরন। (১/৬২–৬৩)

তারাশঙ্কর রাঢ়ের প্রান্তস্পর্শী জনপদের যে জীবনাচারকে তাঁর গল্পের নিরেট বুননে উপস্থাপন করেছেন সে জীবনের লোকবিশ্বাস ও সংস্কারে মাদুলি-তাবিজ-কবচ-শেকড়-বাকড়-মানতের রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। এই প্রভাব যে প্রান্তিক জনচরিত্রের কতটা গহিনে প্রোথিত তা লেখকের গল্পপাঠে অনুধাবন করা যায়।

বশীকরণ

বশীকরণের মাধ্যমে অবাধ্য নারী-পুরুষকে বশে আনা হয়। প্রিয় মানুষটিকে যখন এমনিতে পাওয়া যায় না কিংবা বশে আনা যায় না, তখনই মানুষ বশীকরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। শত্রুকে বশ করার ক্ষেত্রেও বশীকরণ রীতি পালন করা হয়। রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজে এই রীতির প্রচলন লক্ষ করা যায়। 'অপরকে ইচ্ছার অনুকূলে বা সবশে আনার নাম বশীকরণ। বশীকরণের মন্ত্র এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল মন্ত্রপাঠ বা জপ করে বশে আনা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রের সঙ্গে আচারও পালন করতে হয়। যে ব্যক্তি বশ করতে চায় সে নিজে অথবা গুণীর সাহায্যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।'[১] অবাধ্য নারী কিংবা পুরুষকে বশে আনার ক্ষেত্রে বশীকরণ মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

তারাশঙ্করের 'যাদুকরী' গল্পে বশীকরণের রীতি বর্ণিত হয়েছে। মুখুজ্জে গিন্নির প্রতিবেশিনী তার স্বামীকে বশে আনার জন্য বাজীকরী নারীর কাছে যোগবশের ঔষধ চেয়েছে। বাজীকরী নারী এই প্রতিবেশিনীকে ঔষধ বা

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্র দেওয়ার পূর্বে কিছু রীতিনীতি ও সংস্কার মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে এবং বলেছে পরামর্শগুলি সঠিক ভাবে পালন করলেই কেবল যোগবশের মন্ত্র কার্যকরী হবে। বশীকরণের রীতি বা পালনীয় আচারের কথা বলতে গিয়ে বাজীকরী নারী বলেছে–

স্নান করা লয় ঠাকুরন; পরিষ্কারের অনেক কারণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে। ঢলকো করে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা গায়ে গন্ধ লিবা, আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। ভেব্যা দেখ, এসব পারতো এলাচ আন, আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি। স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল–পারব। –তবে আন, এলাচ আন, দারুচিনি, বড় এলাচ; মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি ক'রে পান সাজবা, নিজে খাবা; খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম তা না করলে খাটবে না ওষধ: তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারি সিঁদুর-আর পুরনো কাপড় একখানি। লিয়ে এস। (২/৩৭০)

বশীকরণের ক্ষেত্রে হাতের নখ, নারী কিংবা পুরুষের মাথার চুল, পরিধেয় জামা বা কাপড়ের টুকরো, পান, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গাছের শেকড় ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহৃত হয়।

কুনজর

কোন ব্যক্তি, শিশু, পশু, বৃক্ষ, ক্ষেত বা ফসলের দিকে মন্দ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষতিসাধন করলে সে দৃষ্টিকে কুনজর বলে। যার দ্বারা এ ধরনের কার্য সাধিত হয় তার দৃষ্টিতে অনিষ্টবোধ লুকিয়ে থাকে। সাধারণত ডাইনি শ্রেণির নারীর দৃষ্টিতে কুনজরের প্রভাব বেশি বিদ্যমান। ডাইনির দৃষ্টিতে আছে ধ্বংসের লীলা–এই লোক বিশ্বাস রাঢ় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'ডাইনি শ্রেণীর নারী শিশুদের উপর নজর দিয়ে রক্ত শোষণ করে। ফলে শিশু শুকিয়ে যায়। ডাইনির প্রভাব থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মা ছেলেকে তেলকাজল দেওয়ার সময় কপালের একপাশে কাজলের ফোঁটা দিয়ে থাকেন। এতে আর ডাইনির প্রভাব পড়ে না। একই উদ্দেশ্যে শিশুর হাতে-পায়ে লোহার বালা বা মল পরান হয়। জন্মের পর শিশুর কান ছিদ্র করা হয়। খুঁত থাকলে প্রেতাত্মারা তা স্পর্শ করে না। শিশুর উপর কুনজর পড়লে সন্ধ্যাবেলায় তিনটি শুকনো মরিচ ও তিনটি লেবুর পাতা আগুনে দিয়ে শিশুকে সেঁকলে তার প্রভাব দূর হয়।'[১] তারাশঙ্করের ডাইনি সিরিজের গল্পত্রয়ে কুনজর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পটির স্বর্ণ ডাইনির কথা বলা হয়েছে। ছোট্ট শিশু টুকুর প্রতি স্বর্ণ ডাইনির কুনজরের বিষয়টি গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। মানদা ডাইনির কুনজর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছে-

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ওদের (ডাইনীদের) মত অনিষ্টকারী পৃথিবীতে আর নাই। ফলন্ত গাছ, পোয়াতী, শিশুছেলে এদের ওপর রাক্ষসীদের বড় লোভ। মানুষের শরীরের রক্ত চুষে খেয়ে নেয়। (১/২৩০)

টুকুর উপর স্বর্ণ ডাইনির কুনজরের দিকটি স্পষ্টভাবে গল্পে ফুটে উঠেছে–

স্বর্ণ যেন উন্মত্ত হইয়া গেছে। সে কহিল- 'আমি ডাইনী, আমি কি করব? আমার সামনে এলি কেন, এলি কেন তুই? এই যে তোর দেহের লাল রক্ত আমি দেখতে পাচ্ছি। (১/২৩১)

দ্বিতীয় খণ্ডের 'ডাইনী' গল্পেও কুনজর প্রসঙ্গটি ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধা ডাইনি এ গল্পে সাবিত্রীর হৃষ্টপুষ্ট শিশু সন্তানের দিকে কুনজর দিয়েছে–

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে চাহিয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ, কচি লাউ ডগার মত নরম, সরস, দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তালে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে! এঃ ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে!... ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ। যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল- খেয়ে ফেললাম! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা পালা–তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি! (২/২৪৭)

তৃতীয় খণ্ডের 'ডাইনী' গল্পে ডাইনির কুনজরের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক ডাইনির কু-দৃষ্টির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন–

এই দৃষ্টিতে ডাইনীরা কচি নধর দেহের সুন্দর সুশ্রী মানুষের তরুণী নববধূর দেহের অস্থি চর্মমেদ মাংস ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে খুঁজত প্রাণ-পুতুলী। তাকে পেলে চুষে চুষে তারা খেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়, সোনার মত দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। তরুণী নববধূর সব লাবণ্য ঝরে পড়ে। শুধু মানুষ কেন, কচি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। ডাইনীরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিঃশেষে। (৩/১১৯)

তারাশঙ্কর তাঁর ডাইনি সিরিজের তিনটি গল্পে প্রাঞ্জল ভাষায় ডাইনি সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের 'ডাইনী' গল্পের পরিসমাপ্তিতে বলেছেন:

আজ সেকালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনীতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনী ও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজ ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সেকালের ডাইনীর বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধ বিশ্বাসই তো নাই- আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা। সারাটা জীবন তারা অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত। নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অপবাদকে সত্য বলে আর ভগবানকে ডাকত স্বর্ণের মত- আমার এ লজ্জার বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু। এ ভয়ঙ্কর জীবনের অবসান কর। (৩/১২৪)

ডাইনি কেন্দ্রিক কুনজর সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার রাঢ়ের প্রান্ত জনজাতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। এ বিশ্বাসে তাদের পূর্বপুরুষোচিত সংস্কার-ই অধিক ক্রিয়াশীল থেকেছে।

Dhaka University Institutional Repository

টোটেম

রাঢ়ের কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন প্রান্ত সমাজের জনজাতির আদিম বিশ্বাস বা সংস্কারে একসময় 'টোটেম' বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। এখনও তার প্রভাব স্থানভেদে পরিলক্ষিত হয়। 'প্রাচীনকালে এক একটি কৌমের ছিল এক একটি টোটেম। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কৌম পরিচিত হতো তাদের নির্দিষ্ট টোটেম আঁকা ধ্বজ বা ধ্বজার সাহায্যে। টোটেম আঁকা এই ধ্বজাগুলি আবার রীতিমতো পুজো পেত সেই কৌমের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীর কল্পনার বাহন হিসেবে বিভিন্ন পশু-পাখির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন– সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, বিষ্ণুর বাহন গরু ইত্যাদি। দেব-দেবীর বাহনের এই কল্পনা আগের যুগের টোটেম ও ধ্বজা পূজার স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।'[১] রাঢ়ের কৌমবদ্ধ জন সম্প্রদায়ের বিচিত্র ধর্ম ও বর্ণের মানুষেরা টোটেম সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। 'রাঢ়দেশে টোটেম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বহু জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। পশ্চিমবঙ্গের 'বাঘ', 'হাতি', 'ঘোড়া' ইত্যাদি লৌকিক উপাধি আজও তার সাক্ষী।'[২] তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়ের প্রান্ত জনসমষ্টির টোটেম সংস্কারকে মূর্ত করে তুলেছেন। 'শিলাসন' গল্পে একটা সাদা প্রস্তর খণ্ডের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রস্তরখণ্ডটি আদিবাসী সাঁওতালদের কাছে টোটেমের প্রতীক। পাথরটিকে ঘিরে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে নানা ধরনের বিশ্বাস সংস্কার ও মিথ প্রচলিত আছে। শ্বেত শুভ্র পাথরটি তাদের কাছে শুভ-অশুভের প্রতীক বলেই বিবেচ্য। এই আদিবাসী সাঁওতালরা বিশ্বাস করে তাদের গোত্রের যদি কেউ তাদের আশ্রয়প্রার্থী কোন অতিথিকে কষ্ট দেয় কিংবা আঘাত করে তবে পাথরটির বর্ণ কালো হয়ে যাবে। গল্পকথক অমল চৌধুরী কাঁদনের স্ত্রীর কথা শুনে ভেবেছে–

> আমার অনিষ্ট যদি সে (কাঁদন) করে, তবে এই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে। আকাশের নীল স্নিগ্ধ সুষমা তাম্রাভ কঠিন হয়ে উঠবে শ্মশান গন্ধে। সূর্য সীসক পিণ্ডে পরিণত হবে। (৩/১৫১)

গল্পশেষে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমল চৌধুরীও সাদা পাথরের শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং টুকরো সাদা পাথরকে সে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মাথায় ঠেকিয়েছে। গল্পটিতে সাদা পাথর খণ্ডটিই আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে টোটেম বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

'কমল মাঝির গল্প'–এ আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের টোটেম সংস্কারের চিত্র ফুটে উঠেছে। কমলমাঝি লেখককে হাঁস ও হাঁসালি দুটি পাখির কথা বলেছেন। একটি পুরুষ অন্যটি স্ত্রী। এই পক্ষীদম্পতি 'হাড়াম' এবং 'আয়ো' থেকে সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি ঘটেছে বলে তাদের সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করে। তাই এই

---

[১] অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫, সাহিত্যিকা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৯

[২] বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

হাঁস ও হাঁসালি তাদের কাছে টোটেম বিশ্বাসের প্রতীক। এই জন্য কমল মাঝি লেখকের কাছে তাদের সৃষ্টিরহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে হাত জোড় করে হাঁস ও হাঁসালিকে নমস্কার করেছে।

আদিবাসী সমাজব্যবস্থায় টোটেম বিশ্বাস বা সংস্কার সর্বাধিক সক্রিয়। যুগ যুগ ধরে আদিম সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে টোটেম বিশ্বাস ও সংস্কার নানাভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। 'মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গপূজা, কুমারী পূজা, টোটেম-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনা সমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল।'[১] রাঢ়ের প্রান্তিক আদিবাসী সমাজও এর বাইরে ছিলনা। এই সমাজের মানুষেরা টোটেমকে পবিত্র বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতীক রূপেই বিবেচনা করেছে।

পিছু ডাক

পিছুডাক বাঙালি সমাজে আবহমানকাল থেকে সংস্কার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। উচ্চবর্গের মানুষ থেকে শুরু করে নিম্নবর্গের প্রান্তিক জনজাতি পর্যন্ত এই সংস্কার ধারণ ও লালন করে। পিছুডাককে অমঙ্গল বা অশুভ-এর প্রতীক বলে মনে করা হয়। অন্ত্যজ শ্রেণির নর-নারীদের মধ্যে এই সংস্কার আরো বেশি ক্রিয়াশীল। তারাশঙ্কর রাঢ়বঙ্গের পটভূমিকায় তাঁর গল্পের যে প্লট নির্মাণ করেছেন, সেখানে প্রান্তবর্গীয় নর-নারীরা এই সংস্কারকে তাদের দৈনন্দিন আচরিত জীবনে লালন করেছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী ডুবন্ত নৌকার যাত্রীদেরকে উদ্ধার করার জন্য নিজের নৌকা থেকে ময়ূরাক্ষী নদীতে ঝাঁপ দিলে তার নৌকার বৃদ্ধ যাত্রীরা পিছু ডাকলে তারিণীর নৌকার কাঁলাচাদ বলেছে–

এই বুড়ীরা পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি। (১/৪৫৯)

পিছুডাকের মধ্যে এখানে অমঙ্গল সংঘটিত হবার আশঙ্কায় প্রকাশ পেয়েছে।

---

[১] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, ৩য় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

গো-আচার

বাঙালি কৃষি সমাজে গো-আচার সংস্কাররূপে সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রচলিত। 'হিন্দু বাঙালি গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে গো-হত্যা মহাপাপ। ভারতীয় পুরাণে কামধেনু সকল মানববাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারত। সে সর্বশক্তির অধিকারিণী।'[১] রাঢ়ভিত্তিক কৃষি সমাজে গো-আচার ও সংস্কারের চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পের বর্ণিল ক্যানভাসে। বাড়িতে নতুন গরু কিংবা মহিষ কিনে আনলে বরণ করার ক্ষেত্রে গো- আচার ও সংস্কার পালন করা হয়। রাঢ়ের সমাজেও এ আচার লক্ষ করা যায়। 'সম্পদ অর্থে গরু বাঙালির কছে 'লক্ষ্মীস্বরূপা'। খরিদ করে গরু আনলে সাথে লক্ষ্মীও আসেন। এ জন্য তাকে বরণ করে নিতে হয়।'[২] তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পে এই বরণ সংস্কার উঠে এসেছে। গল্পটিতে রংলাল দুইটি মহিষ ক্রয় করে আনে। গোয়াল ঘরে প্রবেশের পূর্বে রংলাল তার স্ত্রীকে তেল, হলুদ, সিঁদুর দিয়ে মহিষ দুটিকে বরণ করে নিতে বলেছে–

লাও লাও, জলের ঘটি লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও, চল দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো! (২/৮৮)

তেল, হলুদ, সিঁদুর দিয়ে গবাদি পশু বরণের এই রীতি বাঙালির প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে অন্বিত।

'কামধেনু' গল্পে গো-আচার ও সংস্কারের চিত্র অনন্য বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে। পটুয়ার ছেলে নাথু এক গৃহস্থের নবলক্ষ গাভীর বর্ণনা দিয়ে তার যত্ন নেওয়ার রীতি-নীতির কথা বলেছে-

নবলক্ষ গাভীর পাল ছিল এক গৃহস্থের। ঘরের কর্তাবুড়ো সকালে গোয়ালের দরজায় প্রণাম করে দরজা খুলত। বড় বউ করত গোয়াল পরিষ্কার, বড় ছেলে দিত খেতে, মেজ ছেলে দুইত দুধ, ছোট ছেলে নিয়ে যেত মাঠে। নবলক্ষ গাভী খুঁটে খুঁটে কচি ঘাস খেত, সে (নাথু) চারিদিকে পাহারা দিয়ে ফিরত; কোথায় আসছে সাপ, কোথায় উঁকি মারছে 'হুড়ার'। তার হাতে থাকত লাঠি, কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশি। সন্ধ্যায় নবলক্ষ গাভী এসে দাঁড়াত গোয়ালের সামনে। এবাপর সেবার পালা পড়ত বাড়ির বুড়ী গিন্নির ছেলেদের মায়ের; প্রতিটি গাইয়ের ক্ষুরে জল দিত, শিঙে তেল দিত, কপালে দিত হলুদ আর সিঁদুর। (৩/০২)

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৮-৫৯

[২] পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-২৬১

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়ার ছেলে নাথু তার পূর্বপুরুষের পুণ্যের ফলে কামধেনু লাভ করে। সে নিজেও অনেক গো-আচার ও রীতি-নীতি পালন করতো এবং এ সংক্রান্ত কিছু বিদ্যাও তার রপ্ত ছিল। এক গৃহস্থ বাড়ির প্রৌঢ়াকে উদ্দেশ্য করে সে তার গোয়াল ঘরের শ্রীভ্রষ্টতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। গোয়াল ঘর শুদ্ধ করতে হলে কী কী করতে হবে তাও জানিয়ে দিয়েছে নাথু–

সাতটি তুলসীপাতা, সাতটি বেলপাতা, অসর্বজয় বেনের দোকানে পাবেন মা সর্বজয়া, এই জগন্নাথের মাহাপ্রসাদ, গোরক্ষনাথ শিবের আশীর্বাদী, একসঙ্গে করে পুঁতে দেবেন গোয়ালে। আর গোয়ালের মাটি তুলে দেন; দেয়ালগুলি নিকিয়ে দেন। আবার মা সুরভীর দয়া হবে। নবলক্ষ পালে গোয়াল আপনার ভরে যাবে। (৩/০৫)

'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পে গরু এলোকেশীকে আঘাত করে বলরাম। এ কারণে তার মধ্যে পাপবোধ জাগ্রত হয়। কারণ গরু ভগবানতুল্য। তাকে আঘাত করে সে অন্যায় করেছে। তার কুষ্ঠরোগ হয়েছে। তার কাটা পুকুরে এ কারণে জলপূর্ণ হয়নি। । বলরাম তার পাপ মোচনের জন্য এলোকেশীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে–

পরিচ্ছন্ন স্থানটিতে বাঁধা এলোকেশীর পায়ে সে লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এলোকেশীর পায়ের ক্লেদ ধূলা সর্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে তাহার মুখটি ধরিয়া কহিল-'দে মা দে, তুই আমায় ভাল করে দে– তোকে মেরেই আমার এ পাপ মা, এ প্রায়শ্চিতি-। (১/২১৩)

'গো-আচারের মধ্যে বাঙালি মানসের একটা অবিচ্ছিন্ন কামনার পরিচয় পাওয়া যায়। নিখুঁত গরু ঘরে এলে গৃহস্থের কল্যাণ। যদি গরুর দোষ থাকে, যদি তা পোষ না মানে, তবে কাজের সমূহ ক্ষতি হয়। ...ধান, দুর্বা বা আমপাতা দিয়ে গরুর গায়ে পানি ছিটানোর ক্রিয়ায় আদিম লোকসংস্কার নিহিত রয়েছে।'[১] রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজের মানুষগুলির মধ্যে গো-আচার ও সংস্কার একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। গরুকে দেবতাজ্ঞানে এইসব প্রান্তিক মানুষেরা সেবা করে এবং বিভিন্ন রীতি-নীতি পালন করে।

জন্ম আচার

প্রান্তিক সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এবং তৎপরবর্তী সময়ে কিছু আচার-সংস্কার পালন করা হয়। 'আঁতুড়বন্ধন অনুষ্ঠানে ঘরের দরজায় মরা গরুর মাথার হাড়, ছেঁড়া জুতা ও ঝাঁটা রেখে ডাকিনী যোগিনীর কুনজর ও জ্বিন ভূতের কুপ্রভাব থেকে নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে রক্ষা করার কল্পনার মধ্যেও যাদু বিশ্বাস রয়েছে। হাড়, জুতা, ঝাঁটা এসব অলৌকিক আত্মার অস্পৃশ্য বস্তু। এগুলি অমঙ্গলের প্রতিষেধক রূপে ক্রিয়া করছে।'[২] 'অগ্রদানী' গল্পে পূর্ণ চক্রবর্তীর স্ত্রী একজন নিখুঁত সন্তানপ্রসবা নারী। অপরদিকে জমিদার

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬১

[২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামাদাস বাবুর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকেনা। তাই জমিদার তার সন্তানের মঙ্গলকামনায় ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীকে আঁতুড় ঘরের সামনে অবস্থান করতে বলে। পূর্ণ চক্রবর্তী বাইরে পাহারায় থাকাকালে জমিদারের স্ত্রী শিবরাণী একটা মৃতপ্রায় সন্তান প্রসব করে। সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তান পোয়াতির কোলে মৃত্যুবরণ করলে দোষ হয়। তাই এ সংক্রান্ত আচার পালন করার কথা উল্লেখ করেছে জমিদার শ্যামাদাস বাবুর মাসীমা–

মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা, আচার-আচরণগুলো মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনো প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরানীর কোল শূণ্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। (১/৬৪৮)

মৃত্যু ও সৎকার

রাঢ়ের অন্ত্যজ কৌমবদ্ধ মানুষগুলির মধ্যে মৃত্যু ও সৎকার সংক্রান্ত আচার পালন করতে দেখা যায়। 'সন্ধ্যামণি' গল্পে চাটুজ্জে মৃত ব্যক্তির চিতার আঙ্‌রা ঝাড়তে যেতে চাইলে শ্মশানের চণ্ডাল পৈরু তাকে চিতার কাছে যেতে নিষেধ করে বলেছে–

না-না দেওতা, বাড়ি যাবে তুমি। শীতকা রাত, আস্নান করতে হবে।

অর্ধদগ্ধ শবটাকে নাড়াচাড়া দিতে দিতে চাটুজ্জে কহিল তোর ওই ধুনির পাশেই শোব না হয় আজ। একান্ত দুঃখের সহিত পৈরু কহিল–নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম। হামার পাপ হোবে দেওতা। (১/২২২)

'পাটনী' গল্পেও মৃতদেহ সৎকারের চিত্র বর্ণিত হয়েছে-

দণ্ডধারী চিতা সাজানোর প্রথম কাঠখানি পেতে দেয়; তারপর শব বাহকেরাই চিতা সাজায়, সে উপদেশ দেয়। মুখাগ্নি করে শ্রাদ্ধাধিকারী। তারপর দণ্ডধারী দেয় চিতায় আগুন। বলে সকল পাপের তোমার মোচন হল আমার আগুনে আর মা গঙ্গার জলের পুণ্যে। শিবলোকে হোক তোমার বাস। (৩/৩২)

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কারকে লালন-পালন করে থাকে। 'মৃত, মৃতের সৎকার, মৃত আত্মার তুষ্টি সাধন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সকল সম্প্রদায়ের লোকের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে আচার আছে। মুসলমান ও খ্রীস্টানরা মৃতদেহ কবরস্থিত করে, হিন্দুরা দাহ করে। হিন্দু শাস্ত্র মতে মানবাত্মা অমর, তা পুনর্জন্ম লাভ করে পূর্ব কর্মফল ভোগ করে। ... মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্য হিন্দুদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গোষ্ঠীভেদে দশ বা ত্রিশ দিন পর শ্রাদ্ধ করার রীতি আছে।'[১] রাঢ়ের প্রান্তিক জনসম্প্রদায় তাদের মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভিত্তিক নিজস্ব আচার ও সংস্কার পালন করে থাকে।

বিবিধ আচার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

রাঢ়ভিত্তিক প্রান্তিক চরিত্রের প্রাত্যহিক জীবনাচারে নানা আচার, বিশ্বাস ও সংস্কারের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। হতদরিদ্র, শিক্ষার আলো বঞ্চিত, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব আচার ও সংস্কারকে সুপ্রাচীন কাল থেকে কেবল লালনই করে না; পালনও করে আসছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে খেয়াঘাটের মাঝি তারিণী তার স্ত্রী সুখীকে বলেছে–

পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল। জল এইবার হবে ... ওই দেখ কাকে কুটো তুলছে–বাসার ভাঙা ফুটো সারবে। (১/৪৬৪)

পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের দিকে চললে দ্রুত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ জল এলে তাদের বাসা ভেসে যায়। এ কারণে পিঁপড়েরা আগেই বৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে। আবার বৃষ্টির মৌসুম শুরুর পূর্বেই বিভিন্ন পাখি তার ভাঙা বাসা মেরামত করে নেয়। এ গল্পে কাকের বাসা মেরামতের কথা উল্লেখ করেছে তারিণী মাঝি। এসব লক্ষণ দেখা দিলে যে বৃষ্টি শুরু হয় রাঢ়ের অন্ত্যজ মানুষের মধ্যে এই লোকবিশ্বাস বা সংস্কার বিদ্যমান।

'ভুলোর ছলনা' গল্পে ভুলোয় ধরার লোকবিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। গল্পে নিতো বা নিতাইকে ভুলোতে ধরেছে বলে গ্রামের বাউরিরা মনে করেছে। নিতো এবং পাঁড়ে দুই বন্ধু। পাঁড়ে ভুলো ভূত সেজে নিতাইকে নিয়ে যেতে এসেছে। লেখক গ্রামের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে-

ওগো ভুলো ভূত পাঁড়ে সেজে এসে, ওই দেখ মাঠে মাঠে ওকে (নিতাইকে) ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ ধরতে পারছে না। নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারবে গো; ছামুতে নদী দুকূল পাথার। আঃ আঃ ভরা জোয়ান গো আঃ আঃ। (৩/৪৭৮)

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের এই অন্ত্যজ জাতিগোষ্ঠী ভূত-প্রেত বা ভুলোতে ধরার মতো সংস্কারে বিশ্বাস করে। এই লোকবিশ্বাস বা সংস্কার তাদের অন্তরের গভীরে প্রোথিত।

'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে কালী মূর্তিকে ঘিরে ডাকাত প্রহ্লাদ ভল্লার রয়েছে বিশেষ সংস্কার। তাই দারোগা পায়ে জুতা, কোমরে বেল্ট, রিভলভারের চামড়ায় খাপ বেঁধে প্রহ্লাদের ঘর খানাতল্লাশ করতে গিয়ে মা কালীকে ছুঁয়ে দিলে প্রহ্লাদ রাগান্বিত হয়ে দারোগাকে চড় মারে। প্রহ্লাদ মনে করে চামড়াজাত দ্রব্য পরিধান করে মা কালীকে স্পর্শ করলে মা অপবিত্র হয়ে যান। এ সংস্কার তার আদিম জীবনাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'রাজসাপ' গল্পে অনন্ত বেদে রাজসাপ সম্পর্কে তার বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে বলেছে–

দত্তমশায় রাজলোক; রাজসাপ তো এ বাড়িতে থাকবেই। ভারী পয়মন্ত সাপ, উ যে সে বাড়িতে থাকে না। কারু অনিষ্ট উ সাপে করে না। দুমুখো সাপ, অপরাধ করলে একমুখ চন্দ সূয্যিকে সাক্ষী রাখে, এক মুখে ডংশায়! তবে ডংশালে শিবের অসাধ্যি। (২/১১৬)

'প্রতিমা' গল্পে কুমারীশ প্রতিমা তৈরি করার জন্য বারবনিতার আগনের মাটির কথা বলেছে। প্রতিমা তৈরি করতে এই মাটির প্রয়োজন হয়। শিল্পী কুমারীশ প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে এই বিশেষ সংস্কার পালন করেছে।

'চৌকিদার' গল্পে চৌকিদারের স্ত্রী কমলি বিশ্বাস করে যে, গাছেরা রাতে জীবন পায়, কথা বলে ও উড়ে বেড়ায়। সে স্বামী বনোয়ারী বাগদিকে বলেছে সে কথা–

কমলি মিথ্যা বলে নাই–রাত্রে গাছে জীবন পায়। কোন মুনির শাপে ওরা আর কথা বলতে পারে না, নতুবা আগে গাছেরা কথা কহিত, এখান হইতে ওখানে উড়িয়া চলিয়া যাইত। (২/১০৭)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় ভূখণ্ডের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রাজ্ঞ রূপকার। এতদঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তবর্গীয় জনচরিত্রের বিচিত্রমুখী জীবনের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণাকে তিনি তাঁর গল্পের শীর্ষবিন্দুতে স্থান দিয়েছেন। বহুমুখী সংস্কার আর বিচিত্র সব বিশ্বাসে আচ্ছন্ন রাঢ়ের
প্রান্তিক চরিত্রের মানসপ্রবণতা তারাশঙ্কর ভাষিক দক্ষতায় বাঙময় করে তুলেছেন। এ দিক থেকে তিনি রাঢ়ের নিখুঁত ভাষাশিল্পী; রাঢ়ভূমির নন্দিত সাহিত্যিক প্রতিভা।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি

রাঢ়ের প্রান্তবাসী মানুষের সংস্কৃতি চিত্রণ ও রূপায়ণেও তারাশঙ্কর অপ্রতিম কথাকার। রাঢ়ের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরবার পূর্বে সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। সংস্কৃতি Culture শব্দটি একটি ব্যাপকতর ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সংস্কৃতিবান প্রাণী। সমাজতাত্ত্বিক অর্থে বলা যায় সংস্কৃতি হচ্ছে A way of life. এ অর্থে কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে সংস্কৃতির অধিকারী হয় না, বরং সমাজে বাস করতে গিয়ে সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে থাকে। তাই সংস্কৃতি বলতে একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনন্য সামাজিক বৈশিষ্ট্যকেই বুঝায়। সংস্কৃতি শব্দটির সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন–

প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Crapo, Richley H. এর মতে 'Culture a learned system of beliefs, feelings and rules for living around which a group of people organize their lives; a way of life of a particular society.'[১]

সংস্কৃতি মানুষের জীবনের এমন একটি দিক যা মানুষকে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করে অর্জন করতে হয়। মানব সভ্যতার বিকাশে সংস্কৃতির অনন্য অবদান রয়েছে। সভ্যতা বিকাশের পাশাপাশি মানুষের জ্ঞানের প্রসারতা লাভ করে। তবে বিদ্যা এবং সংস্কৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ টেনে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেছেন–

কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। [২]

রবীন্দ্রনাথ এখানে সংস্কৃতিকে একটা দীপ্তির সাথে তুলনা করেছেন। যা মানুষের সমগ্র জীবনটাকে রাঙিয়ে দেয়। মানুষ তার আপন বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠে দীপ্তিমান।

---

[১] Crapo, Richley H., *Cultural anthropology*, 5th edition, 2002, Mcgraw-Hill, New York, Page-48

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষের কবিতা, *রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র*, তপন রুদ্র (সম্পা), ১ম সংস্করণ, ২০০৩, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-০৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সমালোচক গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেছেন–

সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি সম্পদও নয়। ইহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবন সংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সেই জীবন যাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রঙও পরিবর্তিত হয়। আবার সংস্কৃতির সাহায্যেও জীবনযাত্রা যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার সঙ্গে নতূন হইয়া উঠে। [১]

এখানে সংস্কৃতিকে তিনি মানবজীবনযাত্রার সঙ্গে অন্বিত করে জীবনের নান্দনিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। ড. ওয়াকিল আহমদ সংস্কৃতির সংজ্ঞায়নে বলেছেন–

সংস্কৃতি জীবন সম্পৃক্ত, বস্তু সংলগ্ন এবং মানসসম্ভূত। সংস্কৃতি একাধারে জীবনযাত্রার নিয়মপদ্ধতি, যথা– আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি; অন্যদিকে জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ, তথা ঘরবাড়ি, খাদ্যসামগ্রী, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অলংকার ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ মানসফসল, যথা– সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বয় হল সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়। [২]

এখানে তিনি বস্তুগত, অবস্তুগত ও মানস ফসলসম্ভূত সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন। মানবজীবন ও সমাজের বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণে সংস্কৃতির বহুল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

উপর্যুক্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞায়নের আলোকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) ছোটগল্পে বর্ণিত রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণযোগ্য । পূর্বেই বলা হয়েছে তারাশঙ্কর বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছেন। বর্ধমান, বীরভুম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া–এসব ভূ-খণ্ডই একদা প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন পুঁথি আচারঙ্গ সূত্রে। জনপদের উত্তরতম সীমায় গঙ্গা-ভাগীরথী, পূর্ব সীমায়ও নদী। মাঝের অংশটুকুই রাঢ় জনপদ। রাঢ়ের দুইভাগ : সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমি। বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ হুগলি জেলার বহুলাংশ ও হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত হয়েছিল। অজয় নদ ছিল রাঢ়ের দুই বিভাগের মাঝের সীমানা। অজয় নদের উত্তর দিকে রাঢ়ের অন্তর্গত যে ভূ-ভাগ তারই নাম উত্তর রাঢ় বা

---

[১] গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৪

[২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২-৩

Dhaka University Institutional Repository

বজ্রভূমি।'[১] রাঢ় ভূখণ্ডে অন্ত্যজ জনপদের উপস্থিতি এবং তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের স্তরবিন্যাস আবহমান কাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। 'বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির জেলে, বাগদি, বাউরি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখন বেশি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ় দেশে। এ আধিপত্য আগে আরও বেশি ছিল বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও দেখা গিয়েছে যে, এইসব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুণ্ন রয়েছে।'[২] তাই একথা সত্য যে, রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় জনজাতির রয়েছে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে অবস্তুগত, বস্তুগত ও মানসফসলসম্ভূত এই ত্রিমাত্রিক সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। রাঢ়ের ব্রাত্য শ্রেণির সংস্কৃতি- গঙ্গায় একাধিক স্রোত- প্রতিস্রোত মিলে-মিশে এ জনপদের জীবনকে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। লোকনৃত্য, লোকনাট্য, মেলা, যাত্রা, সার্কাস, কিংবদন্তি, বিভিন্ন পূজা, ব্রত, উৎসব, বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রবাদ-প্রবচন লোকছড়া, ভাষা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, লোকশিল্পকর্মসহ বিবিধ সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য সমাবেশ ঘটেছে রাঢ়ের অন্ত্যজ মানুষের জীবন প্রণালীতে।

লোকনৃত্য

লোকনৃত্য রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতির একটি অন্যতম সমৃদ্ধতর সংস্কৃতির ধারা। রাঢ়ের পল্লিসমাজের অনগ্রসর জাতি-বর্ণের মধ্যে দলগতভাবে এই প্রভাব বিদ্যমান। 'প্রতিষ্ঠিত জীবন চক্রের গতিময় দলবদ্ধ প্রত্যানুসরণই পল্লীনৃত্য বা লোকনৃত্য। লোকনৃত্য অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলে এতে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।'[৩] লোকনৃত্যের আঙ্গিক ও প্রসাধনকলা অন্যান্য নৃত্য থেকে স্বতন্ত্র। 'লোকনৃত্যের জন্য কৃত্রিম মাচা বাঁধতে, আলো জ্বালাতে বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাবৃত শ্যামল ভূমি, মাথার উপরে থাকে অসীম আকাশের নীলিমা। ... শিল্পীরা হয়তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানে না। শুকনো ব্যাকরণের বাঁধা বচনও তাদের অজানা। নাচে তারা অচলায়তন থেকে মুক্ত প্রবল জীবনের আনন্দে এবং অঙ্গভঙ্গে ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই। যে কোন জাতির সত্যিকার আত্মা খুঁজে

---

[১] অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬০-৬১

[২] বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩১

[৩] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় তার লোকনৃত্যে এবং লোকসঙ্গীতেই।'[১] রাঢ়ের প্রান্তবাসী জনসম্প্রদায়ের মধ্যে রায়বেঁশে নাচ, বাউল নাচ ইত্যাদি লোকনৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রায়বেঁশে নাচ

রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তস্পর্শী জনজাতির জীবনে রায়বেঁশে নাচের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'রায়বেঁশে নাচ লাঠিনাচের অনুরূপ। যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ নাচ। 'রায়বাঁশ' নামক এক প্রকার শক্ত বাঁশের তৈরি লাঠি নিয়ে এ নাচ হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। রায়বেঁশে মূলত হিন্দুদের নাচ: ডোম, বাউরি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এতে অংশগ্রহণ করে। বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদে এর প্রচলন আছে।'[২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে রায়বেঁশে নৃত্যের কথা বলেছেন-

প্রহ্লাদ ভল্লাকে পাওয়া গেল না। তাহার বাড়িতে বলিতেছে সে গত পরশু অর্থাৎ ঘটনার পূর্বদিন হইতেই সদর শহরে গিয়েছে; সেখানে উকিল রঘুনাথ বাবুর বাড়িতে পুত্রের বিবাহে রায়বেঁশে নাচের বায়না লইয়াছে। (৩/১৬০)

রঘুনাথবাবু সদরের ফৌজদারি আদালতের বড় উকিল। তাই তার পুত্রের বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে 'ডশ রূপেয়ার' নোট বকশিশ পেয়ে অতিথিদের প্রহ্লাদ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে রায়বেঁশে নৃত্যের কসরত দেখায়–

সাতজন লোক সারি দিয়ে লাঠি হাতে। ওদিক থেকে প্রহ্লাদ হাঁক মেরে পড়ল লাফ দিয়ে। পাঞ্চলাইট জ্বলছিল, সেই আলোতে মিনিট চারেকের জন্য দেখা গেল, প্রহ্লাদ এদিক থেকে ওদিক বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে এল বার তিনেক। সাতখানা লাঠির উপর তার লাঠির ঘা পড়েছে। ... তেল মাখানো ঘুরন্ত পাকা লাঠির চিকচিকে গায়ে আলোর ছটা বাজছে। সেই ছটাটা ঘুরছে। আর শব্দ উঠেছ ঠুই-ঠাঁই। তারপরই দেখা গেল, একজন টলল, প্রহ্লাদ চলে গেল ওপারে। এবার সব কজন তাকে চক্রাকারে ঘিরে ফেললে। সব কখানা লাঠি একসঙ্গে পড়তে লাগল। খটখট শব্দ। তারপরই দু-তিন জন পড়ল। প্রহ্লাদ হাঁক মেরে বেরিয়ে এল, সাহেবকে সেলাম করে দাঁড়াল। প্রহ্লাদের বাহুতে পিঠে সোঁটা সোঁটা দাগ, ফেটে রক্ত পড়ছে। (৩/১৬১)

---

[১] উদ্বৃত, ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫

[২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের ব্রাত্য জনজাতি লোকজ ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে আবহমান কাল থেকে এই নৃত্যের চর্চা করে আসছে। তবে বর্তমানে শহুরে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে এসব নৃত্যের প্রচলন কমে এসেছে।

বাউল নাচ

রাঢ়ের বিস্তৃত ভূ-ভাগে একদিকে যেমন রুক্ষতার ছোঁয়া রয়েছে; তেমনি অন্যদিকে রয়েছে বাউলের জ্ঞান, দর্শনের ললিত সুরধারা। এ-অঞ্চলের জনমানসে সুমিষ্ট সতেজতার আস্বাদ নিয়ে এসেছে বাউল নাচ। জয়দেবের কেঁন্দুলি, চণ্ডীদাসের নানুর বেষ্টিত রাঢ়ের অন্ত্যজ গণমানুষের জীবনে বাউল গান ও নাচের প্রভাব সুবিদিত। 'কেবল মানসিক প্রস্তুতি ও আনন্দানুভূতির তীব্রতা অনুসারে গানের গূঢ়ার্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য বাউল গান করতে করতে নাচে মেতে উঠে। ...অনেক বাউল নূপুর পরে। বাঁয়া কাঁধ থেকে ঝোলান কোমরের সঙ্গে এঁটে বাঁধা। ডান হাতের এক তারার সুরে বাম হাতের বাঁয়ার তালে এবং পায়ের নূপুরের ঝঙ্কারে বাউল মশগুল হয়ে গান গায় ও নাচে।'[১] 'বাউল' গল্পে বৃদ্ধ বাউলের নৃত্যের কথা উল্লেখ রয়েছে--

বাবাজী পায়ে নূপুর বাঁধিয়া একতারায় ঝঙ্কার দিয়া গান শুরু করিল-

সাধে কি তোর গোপাল চাই গো

শোন যশোদে!

তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে-

বনে অন্ন পাই গো শোন যশোদে!

তালে তালে হাতে ঝঙ্কার দেয় একতারা, পায়ে বাজে নূপুর। (১/২৪৭)

বাউল নৃত্য রাঢ়ের প্রান্তিক জীবনের এক বিশেষ সংস্কৃতি। 'একতারা আনন্দলহরী কোমরে বাঁধা বাঁয়া নিয়ে গানের সুরে সুরে বাউলের নৃত্য এক বিশেষ শিল্পরীতিকে প্রকাশিত করে।'[২] রাঢ় অঞ্চলে গান সহযোগে বাউল নৃত্য জনপ্রিয় লোকনৃত্য রূপে বিবেচ্য। রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্ত জনসমাজে বাউল নৃত্যের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০২

[২] শ্রী সনৎকুমার মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি-বিচিত্রা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮২, বিশ্বাস পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

খেমটা নাচ

রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূম অঞ্চলে খেমটা গান ও নাচের প্রচলন লক্ষ করা যায়। রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজে খেমটানাচ ও গান আদি রসাত্মক স্থূল বিনোদনরূপে প্রচলিত ছিল। ভ্রাম্যমাণ এই নাচের দল বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করে থাকে। এরা দলবদ্ধভাবে নৃত্য পরিবেশন করে। দলে পুরুষ এবং নারী উভয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কম বয়সী নারীরা গান সহযোগে নৃত্য করে; পুরুষেরা তবলা, হারমোনিয়াম এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৃত্যকে আরো মুখরিত করে তোলে। এরা কখনো রেলস্টেশনে কখনো হাট-বাজারে বা জনাকীর্ণ স্থানে তাদের নৃত্যগীতি প্রদর্শন করে। তারাশঙ্কর তাঁর 'তমসা' গল্পে এ রকম এক খেমটা নাচের দলের কথা উল্লেখ করেছেন–

স্টেশন-শেডের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি লোক অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খেমটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ী ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। (২/৫৮২)

খেমটা নাচের নারীদের অনেকে দেহপসারিণী। বিলাসিনী এই নারীরা রাঢ়ের অন্ত্যজ জনচরিত্রের সংস্কৃতিতে এনেছে আদিম অনার্য মাদকতা।

'যাদুকরী' গল্পে নগ্ন লোকনৃত্য পরিবেশন করেছে বাজিকরের এক নারী। লেখক তার বর্ণনায় লিখেছেন–

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। (২/৩৭১)

লোকনৃত্য রাঢ়ের প্রান্তজনজীবনকে দিয়েছে ভিন্নতর এক মাত্রা। রাঢ় অঞ্চলের ব্রাত্য মানুষের জীবনে লোকনৃত্য সুদীর্ঘকাল ধরে চর্চিত হয়ে আসছে। বংশপরম্পরা এ সংস্কৃতির ধারা আজও এখানকার লোকজ প্রান্তিক চরিত্রে সমভাবে বহমান।

লোকনাট্য

লোকনাট্য রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। বিবিধ লোককথা, লোকপুরাণ যা বহুদিন ধরে লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে, তা-ই নাট্য সহযোগে যখন উপস্থাপিত হয় তখন তাকে লোকনাট্য বলে। এ দিক থেকে 'ভাসান' লোকনাট্যের একটা বিশিষ্ট আঙ্গিকরূপে বিবেচ্য। ভাসানের বেহুলা

Dhaka University Institutional Repository

ও লখিন্দরের কাহিনি বা লোককথা লোকনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হওয়ার বর্ণনা ফুটে উঠেছে 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে–

তারপর পড়ত ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙিন পাটের কাপড় পরে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত সরকারী চল্লিশ বাতির আলো। শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শঙ্কর! শঙ্কর! আসরখানা গমগম করে উঠত...।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপছপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি ছিল ডাগর; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোন কালেই যোগেন্দ্রের বেশি নয়, তাও কামিয়ে পরচুলা পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনি রঙের পাটের শাড়ীখানা পরে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকে হাসত। পুরুষদের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মাঞ্জাসে সে নদীর জলে ভাসাত, বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসরে আমার রান্না করা ভাত আছে, সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক, তুমি আমার বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে বলো বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত, 'জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা!

এমন সময়ে ঠোঁটের কোণে চুন মেখে, গালে কপালে চুনের দাগ এঁকে পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ভুঁড়ি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে নেচে আসরে ঢুকত গোদা মালো। পোশাক পালটে পালই সাজত গোদা মালো; দেখে কার সাধ্য যে বলে, এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদ সদাগর। (২/৫০৬)

লোকনাট্যের এই বিশেষ ধরন ও বৈশিষ্ট্য রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির বর্ণিল সমারোহকেই যেন উন্মোচিত করেছে।

বিভিন্ন ধরনের পূজা, ব্রত ও উৎসব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর নামক ছোট একটি গ্রামে জন্মেছিলেন। তাঁর কল্পনার কিশলয়গুলি অঙ্কুরিত হয়েছে এই গ্রামকে ঘিরেই। শৈশব আর কৈশোরের তারাশঙ্কর পরবর্তীতে যখন সাহিত্যিক তারাশঙ্করে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন এ কল্পনা বা মানস প্রবৃত্তি লাভপুরের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর রাঢ়ের সীমানাকে স্পর্শ করেছে। বৈচিত্র্যময় রাঢ় ভূমির বিভিন্ন পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষের অনাবিষ্কৃত বিবিধ সংস্কৃতির রূপময় ঐশ্বর্যকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিক বুননে গীতল সতেজতায় উপস্থাপন করেছেন। রাঢ়ের অন্ত্যজ জনজাতির বিভিন্ন ধরনের পূজা, ব্রত ও উৎসবের চমকপ্রদ বর্ণনায় তারাশঙ্করের ছোটগল্প মুখরিত। বিভিন্ন ধরনের পূজা এবং ঐ পূজা বা ব্রতকেন্দ্রিক নানাবিধ সংস্কৃতির সঙ্গম ঘটেছে তাঁর গল্পের নান্দনিক ক্যানভাসে।

Dhaka University Institutional Repository

ইঁদু ও ভাঁজো পূজা

ইঁদু ও ভাঁজো পূজা রাঢ়ের প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি উৎসব। তবে ইঁদু পূজা ব্যাপকভাবে পালিত ও পরিচিত না হলেও এতদঞ্চলে ভাঁজো পূজা খুব আড়ম্বরতার সঙ্গে উদ্‌যাপন করা হয়। 'বীরভূম মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ভাদ্র মাসে ইন্দ্রপূজা বা ইঁদুপূজার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ...ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্রধ্বজের উৎসবের কাল ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি।'[১] ইঁদুপূজার পরপরই ভাঁজো পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'ভাঁজো বীরভূমের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন বিশিষ্ট লোক-দেবতা। ভাদ্রমাসে শুক্লা একাদশীতে ইঁদুতলার মাটির সঙ্গে প্রয়োজনে আরও কিছু বালি বা ইঁদুর মাটি মিশিয়ে তালের খোলা বা খুপরি অথবা নতুন মাটির সরায় শনের বিচি, পোস্তা দানা, কালো কড়াই, ধান ইত্যাদি বীজ ছড়িয়ে ভাঁজো বা ভাঁজই পাতা হয়। দশ-বার বছরের ছেলে মেয়েরা বা তাদের নাম করে বড়োরাও ভাঁজো পাতে। সাধ্যমত ফল-সিঁদুর-আমের পল্লব, শালুক ফুলের মালা, গুড় বাতাসা-চিঁড়ে এর পূজা উপাচার। আট দিনের দিন উপবাস করে ও স্নানান্তে ঘট কিনে ভাঁজোর কাছে পাতা হয়। ঐদিন জাগরণ। এই জাগরণে সারারাত ধরে নাচ-গান এবং ভাঁজো সাজিয়ে ও মাথায় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হয়। এই জাগরণ অনুষ্ঠানে সব বয়সের নারী-পুরুষই যোগ দিতে পারে। পুরুষেরা নানা ধরনের সঙ সেজে ঢোল ও কাঁসি সহযোগে গান ও নৃত্য করে। এই পূজায় সাধারণত বাগদি ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন।... ভাঁজো পাতার নয় দিনের দিন জলশয়ান বা বিসর্জন।'[২] তারাশঙ্কর তাঁর 'প্রতীক্ষা' গল্পে ভাঁজো পূজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন–

ভদ্রমাসে ইন্দ্রপুজার বা (ইঁদুপূজার) সময়েই 'ভাঁজো পরব'– নৃত্যে গীতে সুরে সঙ্গীতে এই বাউরী জাতি সুরারাজের উপাসনা করে। দিবারাত্রি সুরার স্রোত বহিয়া যায়। ফুলে পাতায় মণ্ডপ সাজাইয়া ইন্দ্রদেবতার বেদী প্রস্তুত করে। ঢোল কাঁসি বাজাইয়া মেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে জল ভরিতে যায়। তাহারা চুলে পরে শালুক ফুলের মালা, গলায় দোলায় লাল-সাদা হরগৌরী ফুলের হার। পরী এবার সাজার ভাঁজোয় স্থান পাইল না। কিন্তু সে দমিবার মেয়ে নয় .... সে বাড়িতে আসিয়া ভাঁজোর মণ্ডপ সাজাইয়া তুলিল। ঢোল কাঁসির বায়না দিল পূজার দিন। (১/৫৭১-৭২)

গল্পে পরী ও অখনার কণ্ঠে ভাঁজো সঙ্গীত উচ্চারিত হয়েছে–

পরী বলেছে-

কে বলে রে কে বলে রে আমার ভাঁজো কালো,

লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আলো।

অখনা বলছে-

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩

[২] শ্রী সনৎকুমার মিত্র, *পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৩-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দেব সই
গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কীমালা বই। (১/৫৭২)

ভাঁজো পূজাকে রাঢ়ের অনেকেই শস্য উৎসব বলেও অভিহিত করে থাকে। ভাঁজো রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষের একটি ব্রত অনুষ্ঠান।

মনসা পূজা

রাঢ়ের বীরভূম অঞ্চলে মনসা পূজা আজও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশরূপে বিবেচ্য। 'সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বর্তমান বীরভূম জেলায় আধুনিক কাল পর্যন্তও মনসাপূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূম জিলায় এমন কোন গ্রাম নাই, যেখানে এক কিংবা একাধিক 'মনসার মন্দির' নাই। এই সকল মন্দিরে নিম্নজাতির লোককর্তৃক মনসা পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।'[১] তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে মনসাদেবীর পূজা এবং তৎসংক্রান্ত নানা প্রথা ও সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে–'রাঢ়ে আছে আর এক চম্পাইনগর...। বেহুলা নদীর ধারে চম্পাইনগরে বিষহরির আটন। নাগপঞ্চমীতে বিষহরির পূজার দিন আজও গ্রামের বধূরা শ্বশুর বাড়িতে থাকে না। সেদিন তাদের বাপের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা। চম্পাইয়ের বধূরা বেহুলার কথা স্মরণ করে সেদিন চম্পাইনগর ছেড়ে চলে যায়। বাপের বাড়িতে গিয়ে মনসার উপবাস করে, চম্পাইনগরে বিষহরির পূজা পাঠায়।'[২] মনসা বাংলার প্রাচীন দেবী। চাঁদসদাগর, বেহুলা-লখিন্দরকেন্দ্রিক দেবী মনসার কাহিনী বাংলার লোকসমাজে সর্বাধিক প্রচলিত জনপ্রিয় লোককথা হিসেবে স্বীকৃত। 'বীরভূমে গন্ধবণিক সমাজে মনসা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই মনসা পূজা করে। মনসাপূজার সময় মনসাগাছকে মনসার প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, আর তা নয়তো চালির পিছনে অঙ্কিত মনসাদেবীর পূজা করা হয়। বীরভূমের অনেক গ্রামে সর্পাসীনা প্রস্তরমূর্তি বা সিন্দূর লেপিত প্রস্তরখণ্ড সাধারণত অশ্বত্থ বা অন্যকোন বৃক্ষমূলে স্থাপিত হয়।'[৩] বাংলার বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে মনসা দেবী সর্বাধিক প্রাচীন। তারাশঙ্কর

---

[১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৪, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২১৪

[২] বিষ্ণু বসু (সম্পা), *তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (১ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫, অবসর, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬২৮

[৩] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'বরমলাগের মাঠ' গল্পে দেবী মনসার পূজার উল্লেখ করেছেন। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র নটবর বরমলাগের পূজা প্রদান করত। লেখকের বর্ণনায়–

বরমলাগকে পুজো দিত নটবর। নটবরের নাম তখন ডাকিনী বাউরী হয়ে গিয়েছে। ...কুহকী বিদ্যায় অঘটন ঘটাতে পারে ডাকিনী বাউরী। রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় ব্রহ্মনাগ মানুষের বুকভর উঁচু হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে চেয়ে হেলত, দুলত, ডাকিনী ডাঙার ধারে দাঁড়িয়ে দেখত, নাগ চলে যেত। সেও প্রণাম করে ফিরে আসত। (৩/১৮৪-১৮৫)

রাঢ়ের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলায় প্রান্তিক সমাজে মনসাপূজা ব্যাপকভাবে পালিত হয়। বর্ধমানে 'মনসাপূজা উপলক্ষে ঝাঁপন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মাল বা মালবৈদ্যরা নানা জাতের সাপ নিয়ে এই উৎসবে উপস্থিত হয়ে সাপের খেলা দেখান। সর্প সমাবেশ এই পূজার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের ঝাঁপন বা মনসাপূজা এই জেলার আউস গ্রাম থানার কানসা, মেমারী থানার কেজা এবং কালনা থানার কয়েকটি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।'[১] রাঢ়াঞ্চলে মনসা জাগ্রত দেবী রূপে পূজিত হয়। রাঢ়ের প্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের বিপদ-আপদ, রোগ-শোক থেকে সার্বিক পরিত্রাণ পেতে জান ও মালের সুরক্ষার নিমিত্তে আবহমান কাল থেকে মনসাকেই আরাধ্য দেবীরূপে পুজো অর্পণ করেছে।

অন্নপূর্ণা পূজা

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে অন্নপূর্ণা পূজার প্রসঙ্গ এনেছেন। 'স্রোতের কুটো' গল্পে জেলফেরত গোপাল বাড়ি ফেরার পথে একটি গ্রামে বিশ্রামের আশায় প্রবেশ করে। গ্রামে প্রবেশ করেই সে গ্রামের মধ্যে হৈ-চৈ দেখতে পায়–

তখন গ্রামের ভিতর খুব হৈ চৈ চলছে, ঢাক-ঢোল বাজছে, রাস্তা ভেঙে লোক ছুটছে। ভিড়ের সঙ্গে স্রোতের কুটোর মত ভেসে গিয়ে গোপাল দেখলে–এক জায়গায় অন্নপূর্ণাপূজা, পূজক মাথা নেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ভর খেলছে, অর্থাৎ স্বয়ং অন্নপূর্ণা মা সেবকের ঘাড়ে চেপেছেন, কাকেও ওষুধ দিচ্ছেন, কাকেও হারানো জিনিসের সন্ধান দিচ্ছেন, কাকেও অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ঘুচবে তার আশ্বাস দিচ্ছেন; ঠনঠন করে পয়সা পড়ছে, আর একজন সেই পয়সা কুড়িয়ে জমা করছেন। (১/০৯)

অন্নপূর্ণা পূজার এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় রাঢ় সমাজের প্রান্তিক জন-জীবনে এই পূজার প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং এই পূজায় হৈ চৈ ও লোকসমাগম বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

---

[১] শ্রী সনৎকুমার মিত্র, *পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দশহরার পূজা

রাঢ়ের প্রান্ত সমাজে দশহরার পূজার প্রচলন লক্ষ করা যায়। 'তারিণী মাঝি' গল্পে এই পূজার বর্ণনা আছে। ময়ূরাক্ষীর গণুটিয়া ঘাটের মাঝি তারিণী। তার স্ত্রী সুখী। দশহরার পূজার দিন তারিণী ময়ূরাক্ষীর পূজা করে। ময়ূরাক্ষীর প্রসাদে তার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়। সে দশহারার পূজা নিয়মিত করে–

ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্ন বস্ত্রের অভাব হয় না। দশহরার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরোশত বিয়াল্লিশ সালে দশহরার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও শাড়ি–ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। (০১/৪৬১)

দশহরার পূজা রাঢ়ের প্রাচীন সংস্কৃতিরই একটি ঐতিহ্যবাহী অংশ। রাঢ় ভূ-খন্ডের বর্ণময় সংস্কৃতিতে এই পূজা এক স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজন করেছে।

ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজের পূজা

রাঢ়ের বীরভূম ধর্মঠাকুরের পূজার জন্য প্রসিদ্ধ স্থান। বীরভূমে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। তাই এ অঞ্চলে ধর্মরাজ ও ধর্মঠাকুরের পূজা বেশ সাড়ম্বরে পালিত হয়। ধর্মঠাকুর এ অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা। 'বীরভূমের গ্রামদেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজাই সবচেয়ে বড় পূজা। নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে, বিশেষ করে বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতিসমূহের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা এই ধর্ম যদিও প্রভাবান্বিত হয়েছে, তথাপি ডোম জাতির লোকই শিলারূপী ধর্মঠাকুরের পুরোহিত।'[১] ডোম জাতির কাছে ধর্ম ঠাকুরই প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হয়। 'আদিতে ধর্ম ছিলেন ডোম জাতির দেবতা, ডোমরাই ছিলেন পূজারী। এখন হাড়ি ডোম বাউরী মুচি বাগদীদের মধ্যে এই পূজার অধিক প্রচলন, তবে তন্তুবায়, বণিক, কর্মকার প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকও পূজা দেয়। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে ব্রাহ্মণ পূজারী থাকে, সঙ্গে নিম্নজাতির সেবায়েৎও থাকে।'[২] রাঢ়ে, বিশেষ করে বীরভূমে ধর্মঠাকুরের পূজা ব্রাত্য সম্প্রদায়ের কাছে এক অনাবিল আনন্দোৎসব। 'ধর্মঠাকুরের সবচেয়ে বড় পূজা যেটা, সেটা হচ্ছে বাৎসরিক পূজা। এটা সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়। তবে কোন জায়গায় চৈত্রী পূর্ণিমা বা জ্যৈষ্ঠী বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ পূজাকে 'ধর্মের গাজন' বলা হয়, এবং যাঁরা এই পূজায়

---

[১] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫

[২] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসী বা ভক্ত হন, তাঁরা শিবের গাজনের ন্যায় নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন।'[১] তারাশঙ্কর তার 'মতিলাল' ছোটগল্পে ধর্মঠাকুরের পূজার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন–

রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পুর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলালের গ্রামে, মহুগ্রামে ধর্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্মদেবতা নাকি ভারি জাগ্রত। চার-পাঁচ খানা গ্রামের নিম্নজাতি সকলেই এই ধর্মরাজের পূজা অর্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশি। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে! এবার ঢাক আসিল ত্রিশটা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশটা। ...ও গ্রামে ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ... মহুগ্রামে ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গেছে। ...সার্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে তিথিতে অর্ধ জগতের ধর্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ। সেইদিন হয় মুক্তিস্নান। ...পরদিন পূর্ণিমার অবসান-সময়ে ব্রতের উদ্‌যাপন। ঢাক শিঙা কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই একদল ঢাক ও বাদ্যভাণ্ড, তাহার পরেই শ্রেণীবদ্ধভাবে বারো-চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়াল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়াল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস, কলসগুলির গলায় ফুলের মালা; ভক্তের দলের ও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কন্ধে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্তদলের চারিপাশে সারি সারি ধূপদানি হইতে ধুপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত-নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে একদল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নর-নারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে। (১/৪৯১-৪৯২)

গল্পে মতিলাল গাজনের সং সেজেছে। ভালুক ঝাঁটাবুড়ি সেজে সে আগন্তুকদের আনন্দদান করে। সে নানা অঙ্গভঙ্গি করে ঢাকের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করেছে। বীরভূমের ধর্মঠাকুরের পূজায় এ সকল সংস্কৃতির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে ধর্মঠাকুরের পূজায় যে সমারোহ হয় তা অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। 'বীরভূমের সিউরীর তাঁতি পাড়া গ্রাম, খয়রাশোল থানার অন্তর্গত বাবুইজোড়, অবজরপুর, বড়রা, সিরে, ভাদুলে প্রভৃতি স্থানে ধর্মপূজা হয়। গ্রাম দেবতাই ধর্মরাজঠাকুর। খয়রাশোল থানায় কদমডাঙা গ্রামে এক বিচিত্র দেবতা আছেন, নাম 'মালঞ্চবুড়ি'। আর এক বুড়ি সিউড়ি শহরে বাউরি পাড়ায় আছেন, তিনি অপদেবতা, নাম 'ঝেঁটেনি-বুড়ি'। ভক্তের ঘাড়ে ভর করে তার মুখ দিয়ে তিনি যে কোনো লোকের ভূত ভবিষ্যত, বর্তমান বলিয়ে ছাড়েন।'[২] ধর্মঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে গাজন বা চড়ক উৎসব হয়ে থাকে। এ উৎসবে ভক্তরা আগুনখেলা বা ফুলখেলা, কাঁটাখেলায় অংশগ্রহণ করে বিবিধ রীতি-নীতি

---

[১] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫

[২] বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে থাকে। 'অধিকাংশ স্থলে ধর্মঠাকুরের বিশেষ রকমের হিতসাধন ক্ষমতা যেমন নিঃসন্তানকে পুত্রদান, মৃতবৎসার সন্তাননাশরোধ, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণদান, দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদান, কুষ্ঠ, বাত প্রভৃতি রোগ আরোগ্য সাধন সম্পর্কে জনবিশ্বাস প্রচলিত। আহমেদপুরের কাছে বেলিয়া গ্রামের ধর্ম'র বাতের ওষুধ বিখ্যাত।[১] ধর্মঠাকুরের পূজা এবং এই পূজাকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার-রীতি-নীতি রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে থাকে। তাই এ পূজা নিম্নশ্রেণির সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা সার্বজনীন উৎসব। রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূমের সর্বত্র দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় জনসমাজও এই পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। তারাশঙ্কর তাঁর 'প্রতিমা' গল্পে দুর্গাপূজার কথা উল্লেখ করেছেন। কুমারীশ প্রতিমা নির্মাণের কারিগর। সে দুর্গাপূজার প্রতিমা নির্মাণ করে। গল্পে আসন্ন দুর্গোৎসবের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে–

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশে মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙও ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। ...গৃহস্থবাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গেছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে। (০২/১৯)

ভাদ্র মাসের দুর্গাপূজার বর্ণনা এখানে উঠে এসেছে। অন্ত্যজশ্রেণি-চরিত্র কুমারীশ এ গল্পে দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরির কারিগররূপে চিত্রিত হয়েছে। সে চাটুজ্জে বাড়ির ছোট বৌ যমুনার মুখের আদলে দুর্গার মুখশ্রী ফুটিয়ে তুলেছে।

পৌষব্রত উৎসব

রাঢ়ের বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে পৌষ মাসে নতুন ফসল ঘরে ওঠাকে কেন্দ্র করে পৌষব্রতের আয়োজন করা হয়। তারাশঙ্করের 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে পৌষব্রতকে উপলক্ষ করে একটি ছড়ার উল্লেখ রয়েছে:

এস পৌষ ব'স পৌষ জন্ম জন্ম থাকো,

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

গেরস্ত ভরিয়ে থাকো দুধে ভাতে রাখো। (২/৫০৯)

পৌষের এই ছড়া যেন গৃহস্থের জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিতই প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গল্পকার লিখেছেন–

বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ থই থই-করা ধান, খামার ভর্তি গোলা-ভর্তি-ঘর-ভর্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম জন্মই থাকবে, গেরস্থকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা-পাথর ভ'রে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান, মোল্যানিরাও হবে আবার দলমলে মেয়ে, তাদের এক ফুঁয়ে শাঁখ বেজে উঠবে শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুনে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে খামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল কি পাতা কি কুটো কি ময়লা। পৌষ সংক্রান্তির ভোররাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে ধূপ দিয়ে রঙ- করা চালগুঁড়ার আলপনা এঁকে শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে, পৌষ পৌষ পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে ব'স পৌষ তখন কি যেতে পারবে? (২/৫০৯)

রাঢ়ের বীরভূম অঞ্চলে গ্রামীণ কৃষক সমাজ সাধারণত ভাল ফসল উৎপাদন এবং ফসলকে ঘিরে সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধিকে কামনা করে পৌষব্রত পালন করে থাকে। রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় এই উৎসবকে পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে– 'পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান একান্তভাবে রাঢ়ের কৃষিনির্ভর মানুষের ফসলের প্রার্থনা উৎসব।'[১] পৌষব্রত মূলত রাঢ়ের ফসল উৎসব। পৌষ মাসে কৃষকের ঘরে নতুন ফসল উঠলে রাঢ়ের ঘরে ঘরে এ উৎসব পালিত হয়।

কালীপূজা

রাঢ়ের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মা কালীর উপাসনা ও পূজা প্রথা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কালী শক্তির দেবী। অসুরনাশিনী এই দেবী রাঢ়ের প্রান্ত জনসমাজে স্বীয় মহিমায় পূজিত হয়ে থাকেন। তারাশঙ্করের 'চোরের মা' গল্পে মা কালীর পুজোর প্রসঙ্গ এসেছে। শশী ডোম তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

সন্তান ফিঙেকে চৌর্য বৃত্তিতে পাঠানোর পূর্বে তার সন্তান হাবল তাকে (শশীকে) ফিঙের উদ্দেশে কালী পূজা দিতে বলেছে। প্রত্যুত্তরে শশী বলেছে–

তবে নিয়ে আয়, একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে আয়; কালীতলায় যে পুজো আজকে। (২/২১৪)

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নশ্রেণির মানুষেরাও এখানে দেখা যাচ্ছে যে, চুরি ডাকাতি করতে যাওয়ার পূর্বে পুজো দেবার মাধ্যমে মা কালীর আরাধনা করেছে।

'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে প্রহ্লাদ ভল্লার কালীভক্তি ও পূজাপালন পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। দারোগা তার কালী মাকে ছুঁয়ে দিলে সে নতুন করে কালী মায়ের অঙ্গরাগ করে কালীপূজার ব্যবস্থা করেছে-

কাল নতুন করে কালীমায়ের অঙ্গরাগ করে পূজা করে তারপর তোকে (দারোগাকে) দেখাবে। কাল সমস্ত দিন কাজ, মা কালীকে মেরামত করে, রোদে শুকিয়ে, না শুকোয় তো আগুন জ্বেলে সেঁকে শুকিয়ে রঙ দিতে হবে। তারপর পূজো। কলাগাছ চাই, ঘট চাই, সিঁদুর চাই, ডাব চাই, মিষ্টি চাই, চাল চাই, ডাল চাই, পাঁঠা চাই, কাঠ চাই, নুন-তেল-মসলা-আদা-পেঁয়াজ, ফুল, বেলপাতা ফর্দ তার মুখস্ত। পাঁঠা একটা ভাল পাঁঠা চাই। ওই সাতনা হাড়ীর একটা শিঙ ভাঙা বড় পাঁঠা আছে। তার মা কালীর সে-সব বাছা-বিছার নেই। শিঙ ভাঙা, শেয়ালে ধরা, খুঁতো এ-সব খুঁত খুঁতুনি নেই। বলি হলেই হল, তাজা রক্ত আর প্রচুর মাংস। পেঁয়াজও খায় তার মা-কালী। (৩/১৬৬)

অসুরবিনাশী কালী শক্তির আরাধ্য দেবী হিসেবেই রাঢ়ের প্রান্তিক সমাজে সর্বাধিক পরিচিত। রাঢ়ের অন্ত্যজ মানুষেরা তাদের সাহস, বল ও শক্তির আশ্রয়স্থলরূপে মা কালীর পুজো করে থাকে।

লক্ষ্মী পূজা

রাঢ়ের কৃষি সমাজে লক্ষ্মীপূজার প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 'পৌষ চৈত্র ও ভাদ্র মাসে যে লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা হয়, তাকে আগেকার দিনে (বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত) 'খন্দ' পূজা বলা হত। সম্ভাবত গ্রামাঞ্চলে এখনও বলা হয়। 'খন্দ' শব্দটা খুবই অর্থবাচক শব্দ এবং আদিম 'খন্দ' জাতির সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত করে কিনা তা বিচার্য; যদিও অভিধানে 'খন্দ' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'ফসলাদি'। তবে লক্ষ্মীপূজা যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত, তা লক্ষ্মীর বাহন ও ঝাঁপির উপকরণসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এ সম্পর্কে আরো লক্ষণীয় যে, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালীর দিনের লক্ষ্মীপূজা, পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা সত্ত্বেও, মেয়েরা নিজে নিজে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে ও লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ করে।[১] তারাশঙ্কর তাঁর 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে লক্ষ্মীপূজার

[১] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পে মুকুন্দপাল অবস্থাসম্পন্ন কৃষক। গাঁয়ের লক্ষ্মীপূজা সম্পর্কে কৃষক মুকুন্দপাল তার স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে-

এবার লক্ষ্মীপূজোয় বারোয়ারী থেকে ভাসান-গান হবে ঠিক হয়েছে। ও (চেকা) অমনই অন্নপূর্ণাপূজার ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারী। ওর একার লক্ষ্মীপূজো। দশও এবার লক্ষ্মী ছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ ভরা ধানে খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মন ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর। (২/৫০৯)

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পরে লক্ষ্মীপূজা ঘটা করে উদ্‌যাপনের কথা এখানে বলা হয়েছে। অনাহার, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য দূরীভূত হবে, কৃষকের শূন্য গোলা আবার সোনালি ধানে ও ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে– এ লক্ষ্যে মা লক্ষ্মীর পূজা কৃষি সমাজে নতুন আশার উদ্রেক করেছে।

বাউনি বাঁধা উৎসব

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে রাঢ়ের অকথিত বিচিত্র সংস্কৃতির নানামাত্রিক রূপের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। বাউনি বাঁধা এমনই একটি সংস্কৃতি। পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব দিনে রাঢ়ের পল্লিবধূরা এই উৎসব পালন করে থাকে। সংসার জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে এ উৎসব পালিত হয়। 'রাঢ় পল্লীর বধূরা পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব দিন বাউনী বাঁধা নামে একটি প্রথা পালন করেন। কার্তিক-সংক্রান্তিতে গৃহস্থ যে সুঠলক্ষ্মী অর্থাৎ নতুন ধানের খড় সংগ্রহ করে রাখে তা দিয়ে আঁউরী-বাঁউরী নামে পবিত্র দড়ি তৈরি করা হয়। তা দিয়ে বাড়ির যাবতীয় আসবাব, তৈজসপত্রাদি বাঁধা হয় এই বিশ্বাসে যে, সব কিছুতে মা লক্ষ্মীর বন্ধন পড়বে। বন্ধনকালে মেয়েরা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়– তাদের সম্পদ যা আছে

তা যেন থাকে, যা গিয়েছে তা যেন ফিরে আসে, আর সঞ্চয় সমৃদ্ধিতে, নূতনে পুরাতনে সংসারের যেন শ্রীবৃদ্ধি হয়'[১] তারাশঙ্কর তাঁর 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে এই 'বাউনি বাঁধা' প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলেছেন–

এতদিন পৌষ এসে 'বাঁউনির বাঁধন' মানে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতেই গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত যেন উবে গিয়েছে।... এবার যা নমুনা তাতে ওর (চেকার) দোরে আর যেতে হবে না। (২/৫০৯)

এ-গল্পে দেখা যাচ্ছে যে, 'বাঁউনির বাঁধন' কৃষি সমাজে সাংসারিক সমৃদ্ধির প্রতীক। প্রান্তিক শ্রেণির কৃষক এ বিশ্বাস পোষণ করে। বাউনির বাঁধন কার্যকর হলে ঘরের অভাব দূর হয়ে যায়।

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে রাঢ়ের নানামাত্রিক পূজাচারের আকর্ষণীয় বর্ণনা উঠে এসেছে। রাঢ়ের প্রান্ত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষই এ সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। আবহমান কাল থেকে তারা এ-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করেছে। কাল প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাংস্কৃতিক এ-ধারা প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে বেগবান ও সমৃদ্ধ।

সঙ্গীত

রাঢ়ের মিশ্র সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের রয়েছে বিস্ময়কর উপস্থিতি। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াসহ রাঢ়ের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে নানা ধরনের সঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে। বাউল, কবি, ঘেঁটু, ঝুমুর, ভাসান, বৈষ্ণব, গাজনসহ বিচিত্র লোকজ গানের সমৃদ্ধ সমাবেশ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় এ-অঞ্চলে। প্রান্তিক মানুষেরা এ সমস্ত সঙ্গীতকে তাদের জীবনে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাঢ়ের ব্রাত্য জনজাতি গানের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনাকেই যেন মূর্ত করে তুলেছে।

বাউল গান

বীরভূম অঞ্চলে বাউল গানের প্রচলন লক্ষ করা যায়। ভেদ-বুদ্ধিহীন নিরাকার ঈশ্বরের সন্ধান এবং জাতিধর্ম ও বর্ণহীন সমাজ ও মানুষ তৈরির এক গূঢ় তত্ত্ব বাউল সঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। বীরভূমের বাউল গানে বৈষ্ণবীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'বাউল' গল্পে প্রৌঢ় বাউলের কণ্ঠে যে গান উচ্চারিত হয়েছে তাতে রাধা-কৃষ্ণের বৈষ্ণবীয় প্রভাব বিদ্যমান—

সাধে কি তোর গোপাল চাই গো
শোন যশোদে!
তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে-
বনে অন্ন পাইগো শোন যশোদে! (১/২৪৭)

অন্যত্র বাউল গেয়েছে-

ভাল করে পড়গা ইস্কুলে'
নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে,
বড় স্কুল জেলা নদীয়া,
হেড মাস্টার দয়াল নিতাই কেলাসে দেয় তুলে। (১/২৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

'কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি' গল্পে বৃদ্ধ নিতাই দাস বাউলের কণ্ঠে যে গান ধ্বনিত হয়েছে সেখানে ভক্তি ও মরমীবাদ এবং জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে অন্তরের পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে। বাউলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

জ্ঞান-বুদ্ধির বড় লাইন গিয়েছে হেরে-
ভক্তিপথের ছোট গাড়ি হায় রে আগে দিয়েছে ছেড়ে।
আমার নিতাই চাঁদের ডেরাইবারির-কি কারিগরী
মরি রে মরি! হায় তামাশায় হেসে যে মরি! (৩/২০)

অন্যত্র গীত হয়েছে—

শেখ-সৈয়দ আমীর-নবাব ফকির ঠাকুর-পীর
বৈরাগীকে পায়ের ধূলা দাও-চরণধূলা।
তোমার খোদা আল্লাতালায় বলো আমার কথা–
মুছিয়ে দিতে আমার মনের মলা-দিলের মলা। (৩/২২)

প্রান্তিক জনচরিত্রের কণ্ঠে ধ্বনিত এই সব বাউল গানের মধ্য দিয়ে গভীর চিন্তা ও দর্শনের রূপ ফুটে উঠেছে। ঈশ্বররূপী স্রষ্টা আলোকিত মানুষের দেহে বসবাস করে। আকারের মধ্যেই নিরাকারের বসবাস। দিব্যজ্ঞানে কেবল তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পরমপুরুষের সন্ধানে রাঢ়ের প্রান্তিক বাউলশ্রেণি গৃহহারা যাযাবর জীবনকে আলিঙ্গন করে থাকে। কখনো কখনো তারা ঘর বাঁধে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। বাউল গানই তাদের সঙ্গীতরূপে বিবেচ্য হয়।

কবি গান

রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তিক সমাজে কবিগানের সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় কবিগান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবিগানের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। এক মত অনুযায়ী এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অন্য মত অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর ও ধামালীগান থেকে উদ্ভূত। ...কবিগানের চারটে অংশ-থাকত–ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ, বিরহ ও খেউড়। খেউড়ের মধ্যে আদি রসাত্মক অনেক গান থাকত। একপক্ষ অনেক সময় গানের মাধ্যমে অপর পক্ষকে গালি গালাজও করত। কবিগান মুখে মুখে রচনা করা হত। এর জন্য একজন বাঁধনদার থাকতো।'[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[১] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'কবি' ছোটগল্পে কবিগানের বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তীতে কবি উপন্যাসে এ বর্ণনা আরো বিস্তৃত হয়েছে। 'কবি' গল্পে হাড়ি বংশোদ্ভূত নিতাইচরণের কবিয়ালরূপে আত্মপ্রকাশের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবিগানের প্রতিযোগিতায় নিতাই নিজের বাঁধা গান স্বীয় কণ্ঠে পরিবেশন করেছে–

হুজুর-ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন, সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন

জানি-জানি-জানি।

বাবুরা খুব বাহবা দিয়া উঠিলেন-বহুত-আচ্ছা-বহুত আচ্ছা।

হরিজনেরা বলিল-ভাল-ভাল।

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিল।

এ্যাই কাটছে! সঙ্গে সঙ্গে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিতে দিতে বোল বলিতে আরম্ভ করিল, সে গোড়ার ধূয়াটা গায়িল–

'কয়ে-কালীক পালিনী, খয়ে খপ্পরধারিণী

গয়ে-গোমতা সুরভী গনেশজননী।

কণ্ঠে দাও মা বাণী।। (২/৩১৬)

কবিয়াল নিতাই পরস্ত্রী ঠাকুরঝিকে ভালোবেসে নিজেই গান বেঁধে গেয়েছে-

–কাল যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।

অন্যত্র কালো চুলে রাঙা কোসোম (কুসুম) হের হের নয়ন কোণে। (২/৩২৩)

কবিগানের এই চর্চা রাঢ়ের সংস্কৃতিতে এনেছে ভিন্নতর দ্যোতনা। এই কবিগানের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ হাড়ি চরিত্র নিতাই সাধারণ মানুষ থেকে হয়ে উঠেছে কবিয়াল নিতাইচরণ।

ঘেঁটু গান

ঘেঁটু গানের সংস্কৃতি রাঢ় অঞ্চলে দেখা যায়। 'চর্মরোগের দেবতা ঘণ্টাকর্ণই নিম্নজাতীয় বাঙালীর আরাধ্য ঘেঁটু। বসন্ত, বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগের প্রকোপকালে, চৈত্রমাসে এঁর পূজা হয়। ...বীরভূম, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায় ভক্তরা চৈত্রমাসে ঘেঁটুর নামগান করে। 'সিধা' ভিক্ষা করে এবং সংক্রান্তি গাজনের উৎসবে যোগ দেয়।'[১] তারাশঙ্কর তার 'স্থলপথ' গল্পে ঘেঁটু গানের উল্লেখ করেছেন–

একটা দশ এগারো বছরের ছেলে, পেট জোড়া পিলে লইয়া, বুকের হাঁড়-পাঁজরা একখানা করিয়া গণা যায়, উৎকট নৃত্যের সঙ্গে মিহি গলায় ঘেঁটু গান গাহিতেছে–

সায়েব আস্তা বানালে,

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১

Dhaka University Institutional Repository

ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে,

সায়েব আস্তা ...

পুল ভেঙে নদীর জলে সায়েব চিৎপটাং

ওগো তোরা ভেসজ্জনের বাজনা বাজা,

ড্যাং-ড্যানা ড্যাং-ড্যাং। (১/৫৮)

ঝুমুর গান

রাঢ়ের আদিম সংস্কৃতির মধ্যে ঝুমুর গান অন্যতম। ঝুমুর আদিরসাত্মক গান। 'ঝুমুর কবিগানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আদিরসাশ্রয়ী লঘু সঙ্গীত। রাঢ়ের গ্রামে অনুষ্ঠিত ঝুমুর প্রধানত স্ত্রী ও পুরুষ শিল্পীর মধ্যে প্রশ্ন ও জবাবের ভঙ্গিতে গাওয়া গান।'[১] ঝুমুর গান সওয়াল ও জবাবের সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। এটি একটি দলগত পরিবেশনা। দলে নারী ও পুরুষ উভয়ই থাকে। 'দলের মেয়েরা পদাবলী, খেউড়, খেমটা-টপ্পা প্রভৃতি সংগীতে পটীয়সী, আবার দেহ পসারিণীও বটে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে। খেউড় গাওয়ার যোগ্যতায় নিম্নস্তরের এই কবিয়াল ঝুমুর দলে অপরিহার্য হয়ে উঠে; দলের কদর বাড়ে।'[২] তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল তাই দলের প্রয়োজন মেটাতে খেউড় গান পরিবেশন করছে। 'কবি' উপন্যাসে ঝুমুর গান ও ঝুমুর দলের অনুপুঙ্খ বর্ণনা উঠে এসেছে।

'তমসা' গল্পে ঝুমুর দলের কথা বলা হয়েছে। এ গল্পে ঝুমুর দলের মেয়েটির কণ্ঠের গানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে–

কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।

কভু পথের পরে, কভু নদীর পারে

চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার

কাজল পরা জোড়া আঁখি। (২/৫৮৬)

ভাসান গান

রাঢ়ের প্রান্তিক সমাজব্যবস্থায় অন্ত্যজ চরিত্রের মানুষেরা সুদীর্ঘকাল ধরেই ভাসান গানকে লোকজ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই বিবেচনা করে আসছে। 'স্রোতের কুটো' গল্পে ভাসান দলের কথা বলা হয়েছে। দলে

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫

[২] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল গায়ক হিসেবে যোগদান করেছে। 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে ভাসান যাত্রাপালার বর্ণনার পাশাপাশি ভাসান গানের উল্লেখ রয়েছে। যোগেন্দ্র বেহুলা সেজে গাইত ভাসানের গান–

জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা! (২/৫০৬)

বৈষ্ণবীয় গান

রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতিতে বৈষ্ণবীয় গানের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। বৈষ্ণব সঙ্গীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বাস্তব জগতের নর-নারীদের প্রেম ও রোমান্টিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বৈষ্ণব গানের সঙ্গে পদাবলির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। পদাবলির গানে বৈষ্ণবীয় ভাবানুষঙ্গ ফুটে উঠছে। 'রসকলি' গল্পে বৈষ্ণবীয় গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মঞ্জরী গেয়েছে–

লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী। (১/৪৬)

গল্পকার তারাশঙ্কর 'রাইকমল' গল্পে বৈষ্ণব গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। রসিকদাস গেয়েছে–

মথুরাতে থাকলে সুখে আসতে তারে বলিসনে গো–
তাতে মরণ হয় যদি মোর সুখের মরণ জানিস সে গো। (১/১১০)

এই গল্পে অন্যত্র বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার-

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে–
দেখা তো হত না পরাণ গেলে– (১/১১৬)

সখি বলিতে বিদরে হিয়া!
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া (১/১১৭)

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই–

Dhaka University Institutional Repository

সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তারই ঠাঁই। (১/১১৮)

'মালাচন্দন' গল্পে বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার-

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল। (১/১৮২)

গেল নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর (১/১৮৭)

অন্যত্র

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর। (১/১৮৬)

'বাঞ্ছাপূরণ' গল্পে বৈষ্ণবীয় গানের ব্যবহার লক্ষণীয়-

আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে
রাধা আমার রইল কোথা, গোলক ধাঁধার কোন গোপনে।'(৩/৯৭)

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'য় বৈষ্ণবীয় গানের ব্যবহার–

সাধের কলস গলায় বেঁধে,
ডুব দিয়ে আর উঠব না;
যমুনায় কদমতলায়
ডুব দিয়ে আর উঠব না।
মন-আগুনের জ্বালায় পুড়ে
খাক হয়ে যাক আর ছুটব না।
ও সাধের কলস গলায় বেঁধে
ডুব দিয়ে আর উঠব না। (৩/১২৯)

Dhaka University Institutional Repository

চণ্ডীদাসের পুণ্যভূমি রাঢ়ের আনাচে-কানাচে বৈষ্ণবীয় গান ও পদাবলির রয়েছে এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় জনজাতির ওপর বৈষ্ণব গানের প্রভাব সুদূরস্পর্শী।

সাঁওতালদের বর্ষার গান

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে ব্রাত্য জনচরিত্রে যে সমস্ত গানের ব্যবহার দেখিয়েছেন তার মধ্যে সাঁওতালদের বর্ষাবরণ গানের প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। 'শিলাসন' গল্পে সাঁওতালদের বর্ষা বরণ গানের নান্দনিক বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে–

এস মেঘ বস মেঘ আমার ভুঁয়ের শিয়রে
গলে নাম ভিজায়ে হে
টিলা খানা টিকরে
তোমার বরণ আমার কেশে–
যতন করে মাখি হে। (৩/১৪৬)

বিবিধ লোকজ গান

তারাশঙ্কর বাউল, কবি, ঝুমুর, ঘেঁটু প্রভৃতি গান ছাড়াও লোকজীবনে প্রচলিত বিবিধ লোকজ গানের সার্থক ব্যবহার ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে। 'যাদুকরী' গল্পে বাজিকর নারীর বিশেষ ধরনের লোকজ গানের পরিবেশনা লক্ষ করা যায়–

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝুমঝুমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা–
জার ঘিনিনা–
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনারূপো বাতিল হল কাঁদছে বসে স্যাকরাণী।
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানি।
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা–
জার ঘিনিনা–(২/৩৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

'মালাকার' গল্পে রজনী মালাকারের কণ্ঠে লোকজ গান উচ্চারিত হয়েছে–

হাতে দিব বাজবন্ধ গলাতে সাতনর
চরণে বাজিবে মল ঝমর ঝমর।'(২/১৭৯)

'তমসা' গল্পে দৃষ্টিহীন পক্ষীর কণ্ঠে লোকজ গানের সুর ধ্বনিত হয়েছে–

হায়-হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি
জেবন (জীবন) সফল করিতে।
হায় হায়, থাকতো না খেদ মরিতে। (২/৫৮৩)

'বেদের মেয়ে' গল্পে বেদেনী কন্যা শিবির কণ্ঠে লোকজ গানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়–

বাবু তোমায় দেখাই দেখো
কাঁউরের ভেলকি বাজি,
বেদের মেয়ের ভেলকি খেলা–
তোমারে দেখাই দেখো;
তুমি শুধু চেয়ে থাকো
বেদের মেয়ের মুখের দিকে
চোখে চোখ মিলিয়ে রেখে
তুমি শুধু চেয়ে থাকো
দেখাই দেখো!
নিজে তুমি সামলে থেকো
তোমায় হারিয়ে দোব, উড়িয়ে দোব
আকাশে উড়িয়ে দোব
নিজেকে সামাল রেখো–
চেয়ে থাকো! (৩/৯৪)

তারাশঙ্করের গল্পে গানের বিপুল সমারোহ রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির চিত্রকেই প্রতিফলিত করেছে। রাঢ় সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষেরা এইসব গানের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের স্বকীয়তাকে অনাবিল স্নিগ্ধতায় তুলে ধরেছে। রাঢ়ের ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর মানসপ্রবণতা তাদের ধ্যান-ধারণা, রুচি-সংস্কৃতির প্রতিভূরূপে এইসব গান আজও নাগরিক জীবনের মানুষের কাছে সীমাহীন আগ্রহের বিষয় বলে বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মেলা

'মেলা' প্রান্তিক জনজাতির জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেলা রাঢ়ের প্রাচীন সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য। এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক ধরনের গতি সঞ্চার করে। 'মেলা পল্লীবাসীর আনন্দ ও অবকাশ যাপনের একটি কেন্দ্রই শুধু নয়, লোকসংস্কৃতির একটি প্রদর্শন-ক্ষেত্রও বটে। জনসংস্কৃতি লালিত হয় প্রধানত গ্রামে। তার বিবিধ উপকরণের সাক্ষাৎ মেলে মেলার সাজ-সরঞ্জাম ও অনুষ্ঠানাদিতে। ...বাংলা সাহিত্যে পল্লীর হাট ও মেলার বর্ণনা তারাশঙ্করের মত এত অধিক পরিমাণে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অপর কোন লেখক দেননি।'[১] 'মেলা' গল্পে তারাশঙ্কর গ্রামীণ মেলার পণ্য যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। এ গল্পে মেলার বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বিকি-কিনি হতে শুরু করে মেলায় আগত বিচিত্র মানুষের চালচিত্র, রকমারি পণ্যের বর্ণনা সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিতে তিনি অঙ্কন করেছেন এভাবে:

উত্তর পাড়ে মনিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে। প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং– এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নিচে তক্তপোষের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র একখানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি। বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফি যেন পাথরের জালি; রঙিন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেত পাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পানতোয়া ভাসিতেছে তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই ডালায় মুড়িমুড়কী চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। (১/২৩৬)

রথের মেলার উল্লেখ রয়েছে 'স্থলপদ্ম' গল্পে। সন্তানপ্রত্যাশী বেলে হারার কাছে রথের মেলা দেখতে যাওয়ার জন্য পয়সা চেয়েছে–

বেলে হাসিয়া হাত পাতিয়া বলে, আজকে যে-রথের মেলা–মেলা দেখবো, পয়সা দাও। (১/৬৫)

মেলা থেকে বেলে ঝুমঝুমি, বেলফুল, কাঠের ফুল, ঝিনুক, বাটি, হারার ভাত খাওয়ার জন্য একটি খাঁদা পাথর ক্রয় করে। হারা মাথার তেল, আয়না, চিরুনী, খোঁপার কাঁটা চুড়িসহ বিচিত্র রকমারী পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসে।

'জুয়াড়ী' গল্পেও মেলার অনুপম চিত্র ফুটে উঠেছে-

শ্রীপঞ্চমী, শীতলা ষষ্ঠী দুইদিন মেলার চলিয়া গিয়াছে। দৈধার মেলাটা প্রায় জমিয়া উঠি উঠি করিতেছিল। দোকান দুই একখানা এখনও আসিতেছি বটে, কিন্তু অধিকাংশ দোকানই বসিয়া গেছে; ছাড়া সাজিয়া উঠিয়াছে বর্ণে, বৈচিত্র্যে, গন্ধে, রসে বসন্তের মরসুমী ফুলের ক্ষেতের মত। চায়ের ও মাংসের বড় দোকানটা চেয়ার টেবিল দিয়া সাজানও হইয়াছে। ভিতরে পর্দা দিয়া ঘিরিয়া খান দুই নিরালা কামরাও তৈয়ারী করিয়াছে ইন্দ্র ঘোষাল। পর্দা টাঙানো দরজায় আবার লিখিয়া দিয়াছে প্রাইভেট।

---

[১] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দোকানী ইন্দ্র ঘোষালের বন্দোবস্ত ভাল। একদিকে পান সিগারেটের দোকান, অন্যদিকে মাংস, পরোটা, চপ, কাটলেট, ডিম সাজানো। মাংসের দোকানে দু-জন করিগর, চায়ের টেবিলে তিনটি ছোকরা খাটিতেছে। পান বেচিতেছে একটি মেয়ে (২/৫৩৯)।

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে মেলার যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন তা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত। তিনি বীরভূমের বিভিন্ন স্থানের মেলা ঘুরেছেন এবং দেখেছেন। গল্পের বর্ণনায় যেন তারই প্রতিরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থেও মেলা দেখার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিত মেলার বিবরণে রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষের সম্পৃক্ততার কথাই অধিক বর্ণিত হয়েছে। এইসব গ্রামীণ মেলায় নিত্যদিনের রকমারী পণ্যের আমদানি ঘটত। যা গ্রামীণ মানুষ একত্রে সুলভমূল্যে ক্রয় করতে পারত। প্রান্তিক মানুষের এই মেলাপ্রীতি রাঢ় সংস্কৃতিতে আবহমান বাঙালির প্রাণস্পন্দনকেই যেন ধ্বনিত করেছে।

যাত্রা

যাত্রা রাঢ়ের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে অন্বিত লোকবিনোদনের অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম হিসেবে বিবেচ্য। যাত্রার নানামাত্রিক বর্ণনা তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। প্রান্তিক জনজাতির কাছে যাত্রাপালা সুলভ বিনোদন রূপে পরিচিত। তারাশঙ্কর তাঁর 'হারানো সুর' গল্পে যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন:

সন্ধ্যার পর যাত্রাগান আরম্ভ হইল, রাধা কৃষ্ণের প্রেমের অভিনয়। সে কি সুন্দর, কি মধুর! সখীগণের হাস্য-পরিহাস, ফুলতোলা, মালাগাঁথা, দুটি কিশোর-কিশোরীর প্রেমের কথা–অন্তহীন, যেন ফুরাইবার নয়। কথা কিন্তু দুটি–'তুমি আমার, আমি তোমার' সেই লইয়া মান-অভিমান, যে মানের জন্য অনন্ত সাধ্য-সাধনা! সুরের পর সুর ফুটিয়ে উঠে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে–ধাপে ধাপে পঞ্চমে সপ্তমে–। (১/৫১)।

'রাধারাণী' গল্পে সমাজের প্রান্তবর্তী যাত্রাগোষ্ঠীর জীবনাচার উঠে এসেছে। রাঢ় বাংলার বীরভূম অঞ্চলের প্রান্ত স্পর্শী এইসব যাত্রাদলের মানুষের জীবনপ্রণালী ছিল বৈচিত্র্যময়। এ গল্পে কালীয়দমন অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রার দলের কথা এসেছে:

দলটা খুব বড় নয়, জন ত্রিশ বত্রিশ লোক- তাহার মধ্যে জন দুয়েক ভারবাহী , একজন চাকর, একজন পাচক, বাকী সাতাশ আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে-ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহারা উত্তরমুখে চলিয়াছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারই জানে। পথে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। (২/১৬০)

Dhaka University Institutional Repository

দলের মূল গায়েনের যাত্রাভিনয়ের বর্ণনা দিয়ে লেখক লিখেছেন–

মূল গায়েনই দলের অধিকারী এবং পালাগানে সে-ই অধিনায়কত্ব করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে-ই হয় বৃন্দাদূতী, নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সে-ই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী, কখনও সখী, কখনও রাণী-একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ অভিনয় করিয়া যায়। পালাগানের কঠিন এবং গভীর রাগাত্মক গানগুলির সে-ই প্রথমে ধরতা ধরে। লোকটির বয়স যে কত সে বলা কঠিন, তবে ছোটখাট মানুষটি বেশ, সুশ্রী–সর্ব অবয়বের মধ্যে একটা কমনীয়তা আছে। তাহার সঙ্গের ছেলে দুইটির একটি সাজে রাধা, অপরটি কৃষ্ণ। (২/১৬০)

গল্পে যাত্রা দলের নট-নটীর বেশ-ভূষার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এইসব যাত্রাদলে ছেলেরা মেয়ে সেজে রাধার চরিত্রে অভিনয় করে। মূল গায়েন দলের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। 'দেহের প্রদীপে রূপের শিখা' গল্পে যাত্রা প্রসঙ্গ এসেছে। গল্পটিতে বনগোপালপুরের সিংহ বাড়ির একমাত্র শরিক কৃষ্ণকিশোর সিংহের যাত্রা দলে অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। সে ভালবাসে ব্রাত্য নারী চারুকে। যৌবনে চারু কৃষ্ণকিশোরের যাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়েছিল। কৃষ্ণকিশোরের যাত্রাভিনয়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার জীবনচিত্রও উঠে এসেছে:

কৃষ্ণ কিশোর তখন আর ভিক্ষুকের পাঠ করে না, বিল্বমঙ্গলের পার্টেই নামে সে। শুধু স্টেজে নয়, সাধারণ জীবনেও সে তখন বিল্বমঙ্গল। সন্ধ্যাবেলা গান বাজনার আসর বসায়। নিজে সুকণ্ঠ গায়ক, নিপুণ যন্ত্রীও বটে। মিষ্ট-মধুর স্বভাব, প্রাণোচ্ছল জীবনের উল্লাস। আসর জমে ওঠে। (৩/৫৮১)

রাঢ় সমাজের অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান হল যাত্রা। যাত্রা গ্রামীণ জনতাকে নির্মল আনন্দ দান করে। যাত্রা লোকশিক্ষা ও আনন্দের বাহন। রাঢের লোক জীবনে বিনোদন ও নীতি শিক্ষার অন্যতম বাহন হল যাত্রা। প্রান্তবর্গীয় চরিত্রের ওপর এই যাত্রার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ়ের বিশেষ করে বীরভূম অঞ্চলের যাত্রাপালা-সংস্কৃতির নিটোল বর্ণনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এইসব লোকজ সংস্কৃতি রাঢ়ের অন্ত্যজ চরিত্রের জীবনাচারে গভীরতর পরিবর্তন আনয়ন করেছে।

সার্কাস

রাঢ় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সার্কাসের বর্ণনা তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পে ফুটে উঠেছে। জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে শারীরিক কসরতের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিনোদন দানের একটি মাধ্যম হল সার্কাস। রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণি চরিত্রের মানুষেরা, বিশেষভাবে যারা যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত তারা এই বিশেষ ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে অন্নের সংস্থান করে থাকে। রাঢ়ের বর্ণবহুল সাংস্কৃতিক জীবনে সার্কাস এক নতুন মাত্রা যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। 'মরুর মায়া' গল্পে সার্কাস বা দৈহিক কসরতের উল্লেখ রয়েছে। হা ঘরের যাযাবর দল এই কসরত প্রদর্শন করেছে–

কেহ কেহ যায় বাঁশবাজি, দড়িবাজি করিতে, কসরত দেখাইতে, কপালের উপর লম্বা বাঁশ খাড়া করিয়া দেয়, তার উপরে শুইয়া থাকে হাঘরের ছেলে, সে আবার সেথায় হাততালি দেয়। দড়ির উপর নাচে জোয়ান, তাহার দু'কাঁধে দুইটা ছেলে, হাতে একটা বাঁশ;-ডুগ ডুগ করিয়া ডমরুর মত বাজনা বাজে, তালে তালে জোয়ান নাচিয়া নাচিয়া দড়ির উপর চলে, হাতের বাঁশ নাচায়। (১/১২৩)

'বেদেনী' গল্পের শম্ভু বাজিকর ও তার স্ত্রী রাধিকা প্রান্তিক কৌম সমাজের শ্রেণি প্রতিনিধি। যাযাবর এই নর-নারী বিভিন্ন স্থানে তাঁবু ফেলে সার্কাস খেলা দেখায়–

লোকে বলে বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে 'ভোজবাজি'-ছারকাস। ছোট তাঁবুটার প্রবেশ পথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে ভোজবাজি-ছারকাস। লেখাটার একপাশে একটা বাঘের ছবি, অপরদিকে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তরবারি, অপরহাতে একটি ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুইটি পয়সা। ভিতরে আছে কিন্তু গোলধামের খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ' 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজ বিবিকা করব'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দি একটা চিতা বাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘের চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয়, মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। (২/ ২৩৪)

এছাড়াও 'আফজাল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী' গল্পেও সার্কাস প্রসঙ্গ এসেছে। রাঢ়ের ব্রাত্য মানুষের সংস্কৃতিতে সার্কাস আনন্দ ও বিনোদনের মাধ্যম বলে বিবেচ্য হলেও এর মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ চরিত্রের সাহসিকতা, দক্ষতা ও বিচিত্র ক্রীড়া প্রদর্শনে পারদর্শিতার চিত্র ফুটে উঠেছে। রাঢ় সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সার্কাস প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যেমন তাদের জীবিকা নির্বাহ করেছে, তেমনি তারা তাদের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্যকে রঙিন ফানুস বানিয়ে এর মধ্য দিয়ে নিমিষে উড়িয়ে দিয়েছে; ভুলে গেছে জীবনের সব অবসাদ, গ্লানি, জ্বালা আর যন্ত্রণা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদ-বচন

রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রবাদ-বচনের বহুল ব্যবহার করে থাকে। প্রবাদ-বচনের মধ্য দিয়ে এইসব নিম্নবর্গের জনজাতির প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ-বচনের বিষয় যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি এর মধ্যে থাকে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। তারাশঙ্কর তাঁর বিভিন্ন গল্পে প্রবাদ-বচনের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। গল্পে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্ত্যজ চরিত্রের মানুষেরা প্রবাদ-বচনকে তাদের কথায় বিভিন্ন উপমা, উদাহরণ বা তুলনা বোঝাতে ব্যবহার করেছে। নিম্নে বিভিন্ন গল্পে ব্যবহৃত এ রকম কিছু প্রবাদ-বচনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

- ❑ আপন তেতো পর মিষ্টি, ছেনালের এই কুষ্টি।

  (স্থলপদ্ম, ১/৬০)

- ❑ অফলা নারী আর এঁটো হাঁড়ী দুই-ই সমান– শেষ আঁস্তাকুড়ই গতি।

  (স্থলপদ্ম, ১/৬৩)

- ❑ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

  (স্থলপদ্ম, ১/৬৩)

- ❑ যারে ভাতারে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা।

  (স্থলপদ্ম, ১/৬৭)

- ❑ লাজে মা কুঁকুড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

  (তারিণীমাঝি, ১/৪৫৯)

- ❑ পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু।

  (রসকলি, ১/৪০)

- ❑ নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

  (রসকলি, ১/৩৬)

- ❑ দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল-ই ভালো।

  (রসকলি, ১/৪২)

- ❑ ছেলে কোলে মরে জলে ফেলব, তবু না পোষ্য পুত্র দিব।

  (রাইকমল, ১/১১৮)

- ❑ শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়।

  (রাইকমল, ১/১১৬)

- ❑ ধান ভানতে শিবের গীত।

Dhaka University Institutional Repository

(রাইকমল, ১/১০৭)

- চাষার বুদ্ধির ধার কেমন, – না ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন।

(রাইকমল, ১/১০৬)

- রোদে পোড়া চাষা, আর আগুনে তপ্ত ফাল – এ দুই সমান।

(রাইকমল, ১/১০৫)

- ভাত দেবার সোয়ামী লয়কো কিল মারবার গোঁসাই।

(রাইকমল, ১/১০৫)

- বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী–রাই হেন কত মিলবে দাসী।

(প্রসাদমালা, ১/১৪৩)

- দিনেতে অশ্বিনী রাত্রিতে রমণী।

(প্রসাদমালা, ১/১৪৮)

- মাছ খায় সব পাখিতেই, নাম হয় কেবল মাছরাঙার।

(টহলদার, ১/৪০৮)

- মাগ নাই ছেলে কাঁদে, তার দুঃখে গগন ফাটে।

(টহলদার, ১/৪১১)

- পাপ ছাড়ে না আপন বাপ।

(সর্বনাশী এলোকেশী, ১/২১১)

- ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

(মালাকার, ২/১৮৩)

- শাখের করাত যেতে ও কাটে, আসতেও কাটে।

(পৌষ-লক্ষ্মী, ২/৪৯৬)

- যাকে ব'লে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়।

(পৌষ-লক্ষ্মী, ২/৫০৪)

- দশের লাঠি একের বোঝা।

(পৌষ-লক্ষ্মী, ২/৫০৯)

রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় নারী-পুরুষ তাদের সহজ-সরল জীবনের পরিমণ্ডলে প্রবাদ-প্রবচনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত এ সব প্রবাদ-প্রবচন রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূমের অস্পৃশ্য মানুষগুলোর জীবনাচারে

Dhaka University Institutional Repository

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ব্রাত্য চরিত্রের নিত্যদিনের কথোপকথনে প্রবাদ-প্রবচনের উপস্থিতি তারাশঙ্করের গল্পকে দিয়েছে শৈল্পিক সুষমা।

লোকছড়া

রাঢ়ের অন্ত্যজ জনচরিত্রে লোকছড়ার ব্যবহার আবহমানকাল থেকে লক্ষ করা যায়। লোকছড়ার মধ্যে কখনো কখনো লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার নিহিত থাকে। সহজ-সরল ভাষার মধ্য দিয়ে লোকছড়া লোকমানসে এক গভীর ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে দেয়। লোকছড়া লোকসংস্কৃতির প্রাচীন অথচ সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে যে সমস্ত লোকছড়ার ব্যবহার করেছেন সেগুলোর অধিকাংশ ব্রাত্য শ্রেণির জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিম্নে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে ব্যবহৃত কিছু লোকছড়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

- রাঙ্গা পেড়ে শাড়ী দিব শঙ্খ দিব রাঙা,
  সুন্দরী লো কর না আমায় তিন নম্বর সাঙা। (স্থলপদ্ম, ১/৬৭)

- কালা বিনে হলাম কাল
  কালোর গুণ আর বলব কত। (স্থলপদ্ম, ১/৬৭)

- সিঁদুর মুখী ধানে ধানে
  ভরিবে গোলা
  আমার সোনামুখীর হবে
  সোনার কাঠির মালা। (পৌষ-লক্ষ্মী, ২/৪৯৯)

- আয় চাঁদ আয় চাঁদ আয় চাঁদ–
  আ-রে! আয় আয় আ-রে
  চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা রে। (সাপুড়ের গল্প, ৩/৩৬৪)

শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, ঘুম পাড়ানো, ফসলের সমৃদ্ধি, বহুবিবাহ, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ বিষয় উল্লিখিত লোকছড়ার মধ্যে ফুটে উঠেছে। রাঢ়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবেগ, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই সমস্ত লোকছড়ায়। লোকছড়াগুলি গ্রামীণ চিন্তা-ভাবনা ও দর্শনকে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মতো ধারণ করে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবদন্তি

রাঢ়ের প্রান্তস্পর্শী জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তির বহুল প্রচলন লক্ষ করা যায়। রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূম অঞ্চলের ব্রাত্য মানুষের জীবনে কিংবদন্তি বিশেষ এক ধরনের লোকবিশ্বাস বলেই পরিচিত হয়ে আসছে। কিংবদন্তির বাস্তবিক কোন ভিত্তি না থাকলেও লোকসমাজের মানুষ এটি শুনতে, বলতে এবং বিশ্বাস করতে পছন্দ করে। 'কিংবদন্তি যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে না, অন্তত লোকসমাজের মনে। তারা সরল বিশ্বাসে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা অথবা পুরোপুরি কল্পনাশ্রিত কোনো ঘটনাকে প্রজন্ম পরম্পরায় স্মৃতিতে ধরে রাখে।'[১] তারাশঙ্কর 'ডাইনী' সিরিজের গল্পগুলিতে কিংবদন্তির সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। গল্পগুলির সাথে সমান্তরালভাবে কিংবদন্তি যেন স্থান জুড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডের 'ডাইনী' গল্পটি শুরু হয়েছে একটা কিংবদন্তি উল্লেখ করে–

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান; ছাতি-ফাটার মাঠ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রাম চিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে।

'সন্ধ্যামণি' গল্পে উপকথার প্রসঙ্গ এসেছে। 'সন্ধ্যামণি' গল্পে পাল কর্তার উপকথার আসর জমানোর কথা বলা হয়েছে–

পাল-কর্তার মজলিসে তখন পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশ পথে উড়িয়াছে। ... উপকথা আগাইয়া চলিল-প্রবাল দ্বীপের চিলে- কোঠা দেখা যাইতেছে; রাজকন্যার এলানো চুল বাতাসে উড়িতেছে। পদ্মফুল ভিজানো জলে স্নান- করা তাঁর চুলে উজাড় করা পদ্মবনের গন্ধ। সেই গন্ধে মৌমাছিরা দলে দলে চারিপাশে গুনগুন করিয়া বেড়ায়। উজান বাতাসে সে গন্ধ রাজপুত্রের বুকে আসিয়া পশিল। গন্ধে মাতাল রাজপুত্র বলেন, আরও জোরে পক্ষীরাজ, আরও জোরে। (১/২১৯, ২২০)

উপকথার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক চরিত্রের মানুষেরা দুঃখ-কষ্টের সুকঠিন বাস্তবতার প্রাচীর পেরিয়ে কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে গড়ে তোলে স্বপ্নের এক বর্ণিল সৌধ।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে বর্ণিত বাদশাহি সড়ক সম্পর্কে লেখক তারাশঙ্কর একটা কিংবদন্তি উল্লেখ করেছেন। রামেন্দ্রবাবু রজতবাবু ও সুরেশবাবুর কথোপকথনের এক পর্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে এ-কিংবদন্তি:

---

[১] বরুণকুমার চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর: আচারধর্ম ও সংস্কার, তারাশঙ্কর: *সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, ১৯৯৯, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

রামেন্দ্রবাবু কহিলেন, বাদশাহী সড়ক যখন, তখন কোনো বাদশাহের কীর্তি নিশ্চয়। কোন বাদশাহের কীর্তি মশাই?

–ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সুন্দর একটা কিংবদন্তি এ দেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় নাকি কোনো বাদশাহ বা নবাব দিগ্বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ ফকীরের দর্শন পান। সেই ফকীর তাঁর অদৃষ্ট গণনা করে বলেন– রাজধানী পৌঁছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকীরকে ধরলেন– এর প্রতিকার করে দিতে হবে। ফকির হেসে বললেন– প্রতিকার? মৃত্যুর গতি রোধ করা কি আমার ক্ষমতা? বাদশাও ছাড়েন না। তখন ফকির বললেন– তুমি এক কাজ কর, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরি করতে করতে যাও, তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে ক্রোশ অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরি কর। (১/২৮৬)

এ ধরনের কিংবদন্তি দীর্ঘদিন লোক মুখে প্রচলিত হয়ে লোকসমাজে তা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'বরমলাগের মাঠ' গল্পে শিবনাথ বরমলাগের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেকটা কিংবদন্তির মতো

লাগ মশাই-ব্রহ্মলাগ! সাপ। ভেষণ সাপ ... হাতের তেলো দুখানিকে পাশাপাশি জুড়ে ঈষৎ বেঁকিয়ে সাপের ফনার মত করে বললে, এই এমনি কুলোর মত ফণা মশায়, ঘোর কালো– মা কালীর অঙ্গের মত বরণ, সেই কালোর ওপর কুলোর মত ফণায় শ্বেতবরণ চক্কর। ভেতরের দিকটি-মানে, গলাপেট দুধের মত সাদা। ফণা তুলে দাঁড়াত মশায়, মানুষের বুক বরাবর উঁচু হয়ে উঠত। লকলক করত দু'খানি জিভ। উদয়কালে একবার, আর একবার ঠিক 'সনজের' সময়। ওই ডাঙার ধারে গেলেই লোকে দেখতে পেত, ফণা তুলে সূর্যের পানে তাকিয়ে দুলছেন। বায়ে একবার, ডাইনে একবার, মধ্যে মাঝে ছোবল দিয়ে ঝড়ার মত মাটিতে পড়ছেন 'সাঁট-পাট হয়ে। ছোবল মারছেন না, সূর্যিদেবকে পেনাম করছেন। (৩/১৭৯, ১৮০)

রাঢ়ের অন্ত্যজ সমাজে কিংবদন্তির বিচিত্র স্বরূপ লক্ষ করা যায়। এই সব কিংবদন্তি লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচ্য। রাঢ়ের প্রান্তিক জনমানসে কিংবদন্তির প্রভাব সুদূরসঞ্চারী।

ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও বিচিত্র সংস্কৃতি

রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূমের যারা আদিম অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী তাদের রয়েছে বিচিত্র ধর্মীয় রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি। বাজিকর, বেদে, পটুয়া প্রভৃতি প্রান্তিক জনজাতির ধর্মীয় বিশ্বাসে বিবিধ ধর্মের রীতি-নীতি ও সংস্কারের মিথস্ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 'বেদেনী' গল্পে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির দ্বৈত প্রভাব বিদ্যমান। বেদে জাতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও আচার-আচরণে হিন্দু রীতি পালন করে থাকে। লেখকের বর্ণনায় অন্ত্যজ জাতির এই মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল; আর একটু দূরে আর একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসাপূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠীর

Dhaka University Institutional Repository

ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। (২/২৩৭)

'যাদুকরী' গল্পে বাজিকর জাতির ধর্ম ও বর্ণ পরিচয় প্রদান করে লেখক লিখেছেন–

বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলাদেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুল পঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। ... দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না; দল দূরের কথা স্বামী-স্ত্রীতে এক সঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায় না। (২/৩৬৬)

পটুয়াদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে বিশেষভাবে পটুয়া সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ধর্মীয় রীতি ও সংস্কৃতির পরিচয় উঠে এসেছে। 'রাঙাদিদি' গল্পে এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন–

পটুয়ারা ধর্মে ইসলামীয়, কিন্তু আচারে ব্যবহারে পুরা হিন্দু। তাহারা নামাজও পড়ে, আবার হিন্দুর ব্রত আচারও পালন করে, হিন্দুর অখাদ্য খায় না। দেব দেবীর প্রতিমা গড়ে, পটের উপর হিন্দুর পুরাণ কথার ছবি আঁকে; সেই পট দেখাইয়া লীলা-গান করিয়া ভিক্ষা করে। জাতি জিজ্ঞাসা করলে বলে, ইসলাম। চাষবাসের বালাই নাই; ভিটা, চলিবার পথ, গৃহস্থের দুয়ার এ তিন ছাড়া মাটির সহিত সম্বন্ধ নাই। (২/২৫৬)

'বেদেনী' গল্পেও পটুয়াদের ধর্মীয় রীতি নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তারাশঙ্কর লিখেছেন–

এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু পৌরাণিক গান করে, তাহারা নিজেদের বলে পটুয়া, পট তাহারা নিজেরাই আঁকে। বিবাহ আদান প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না কবর দেয়। (২/২৩৭)

'কামধেনু' গল্পেও পটুয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা বিন্যস্ত হয়েছে। পটুয়ার ছেলে নাথুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তারাশঙ্কর পটুয়াদের ধর্মীয় আচারের বর্ণনায় লিখেছেন–

পটুয়ারা সকালে 'দুর্গা দুর্গা' 'হরি হরি' বলে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মুখে হাতে জল দিয়ে আল্লাহতায়ালাকে ডাকে, রসুল আল্লাকে স্মরণ করে। কেউ গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে খঞ্জনি পট নিয়ে গ্রামান্তরে বার হয়, কেউ শুধু খঞ্জনি নিয়ে শিবদুর্গার নাম নিয়ে বার হয়, কেউ গোমতা সুরভির নাম নিয়ে বার হয়-

সুরভিমঙ্গল গান গোধন-মহিমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ দিতে নারে সীমা।
লোমকূপে কূপে মায়ের দেবতারই বাস
যে সেবে গো-মাতা তার পুরে সর্ব আশ। (৩/০২)

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের প্রান্তিক এই সমস্ত জনজাতির জীবনে বিভিন্ন ধর্মের সহজ আদান-প্রদান লক্ষ করা যায়। নানা ধর্ম ও বর্ণের অন্ত্যজ মানুষেরা রাঢ়ের ভূখণ্ডে বংশপরম্পরা সহাবস্থান করে আসছে। এর ফলে এক ধর্মের আচার-সংস্কার অন্যধর্মের আচার সংস্কারকে প্রভাবিত করেছে। ব্রাত্য সমাজের অশিক্ষিত আদিম মানুষগুলি তাদের জীবনাচারে এই সকল-সংস্কার ও বিশ্বাসকে লালন করেছে।

বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি

রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় প্রভাব বেশি থাকায় এ অঞ্চলে প্রান্তিক সমাজে বৈষ্ণবীয় আখড়ার প্রচলন লক্ষ করা যায়। আখড়া তৈরি ও সাজ্জ-সজ্জার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবীদের বিশেষ রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আখড়ার পরিবেশ অঙ্কনে তারাশঙ্করের পারঙ্গমতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বৈষ্ণবীয় চিন্তা-চেতনা ও দর্শন নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে এ ধরনের আখড়া সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। 'রাইকমল' গল্পের মতো 'মালাচন্দন' গল্পে সন্ধ্যা–জোলের আখড়ার আকর্ষণীয় বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন–

বিদায় লইয়া যখন তাহারা সন্ধ্যা-জোলের আখড়ায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা আর নাই, গোধূলির আলো ঝিকিমিকি করিতেছে। তুলসী প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছে-এক পাশে জাফরি-বোনা বাঁশের বেড়ায় গাঁদা ফুলের গাছ, সর্বাঙ্গ ভরিয়া অজস্র ফুল; কয়টা বড় ফুলে ন্যাকড়া বাঁধা, বীজ থাকিবে; মাঝে মাঝে কয়টা রাধাপদ্মের গাছে বিশাল হলদে ফুল, কয়টা সন্ধ্যামণির গাছে তখনই সদ্য সদ্য রক্তরাঙা ফুলগুলি ফুটিতেছে; ওপাশে কয়টা আমগাছে মুকুলের মেলা, দুইটা সজিনার গাছে ফুলের ফুলঝুরি। সম্মুখেই দাওয়া, উঁচু, বাঁধান মেঝে বড় মেটে ঘর একখানি, তারই ঠিক পাশেই সমকোণ করিয়া ছোট ঘর একখানি, তারও বাঁধান মেঝে, আকারে প্রকারে মনে হয় এইটিই বিগ্রহ-মন্দির দুয়ারের চৌকাঠে সিঁড়িতে সিঁড়িতে আলপনার বিচিত্র রেখার শুভ্র রেশ তখনও জাগিয়া আছে। (১/১৭৮)

প্রান্তিক সমাজের মানুষেরাই যেহেতু বৈষ্ণবীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, তাই তারাই এই আখড়া সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। বৈষ্ণব অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে আখড়ার পরিবেশে সব সময় একটা শ্বেত শুভ্র ভাবগাম্ভীর্যতার ছাপ পরিদৃশ্যমান হয়েছে। রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় সমাজের লোকসংস্কৃতিতে আখড়া সংস্কৃতি নবতর এক দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে প্রান্তিক চরিত্রের আবাসস্থল, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা, খাদ্যদ্রব্য, কৃষি যন্ত্রপাতি, লোকশিল্পকর্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাঢ়ের প্রান্তিক চরিত্রের দৈনন্দিন জীবনে এসব বস্তুগত সংস্কৃতির নিবিড় প্রভাব বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

আবাসস্থল

তারাশঙ্কর তাঁর বিভিন্ন গল্পে অন্ত্যজ চরিত্রের বসবাসের উপযোগী আবাসস্থল বা গৃহের বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের পছন্দ কিংবা নিজস্ব রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের গৃহনির্মাণ করেছে। গৃহের সাজ-সজ্জাতেও এইসব চরিত্রের স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। রাঢ় অঞ্চলের গৃহনির্মাণ বৈশিষ্ট্যও এক্ষেত্রে প্রান্ত চরিত্রের আবাসস্থল নির্মাণে ক্রিয়াশীল থেকেছে। 'রসকলি' গল্পে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের ঘর-দোরের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে গল্পকার মঞ্জরীর গৃহের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান কয়েক পট-সেই পুরানো গোরাচাঁদ জগন্নাথ, যুগল-মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তপোষ, একদিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো। (১/৪১)

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পে বৈষ্ণব গৃহের বর্ণনা দিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন–

ঘর-দোরগুলি বারো বছরে খুব পুরোনো নয়। তার উপর বারান্দায় কিছুদিন আগে টিন পড়েছে। বাঁধান হয়েছে। তাতে নতুন বলে মনে হয়। অঙ্গনটি ঝকঝকে তকতক করছে। পরিচ্ছন্ন নিকানো। ছোট একটি ধানের মরাই। ওদিকে একটি গোশালা। সামনে একটি ছোট পরিপাটি ঘর। ঘরখানি পূজামন্দির। (৩/১২৫)

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গৃহের বর্ণনায় ও সাজ-সজ্জায় এক ধরনের পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এসব গল্পের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গৃহ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় রাঢ়ের বৈষ্ণব সমাজের গৃহ নির্মাণ শৈলীর ছাপ লক্ষ করা যায়।

'বাউল' গল্পে বাউলের গৃহ নির্মাণের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে–

এ পাড়ার লোকগুলি সকলেই নিপুণ কর্মঠ। মাসখানেকের মধ্যেই দেওয়াল উঠিয়া শেষ হইয়া গেল। বাবাজীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক খুঁটিনাটি নিজের চোখে দেখিয়া সুন্দরভাবে না করাইলে মন খুঁতখুঁত করে। বাবাজী নিজে রায়দের ভিটা খুঁড়িয়া ইঁট বাহির করিয়া জমা করে। ঘরের মেঝে বারান্দা বাঁধান হইবে। (১/২৫২)

'ডাইনী' গল্পে বর্ণিত ডাইনির গৃহের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন-

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ায় মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে ছাওয়া বারান্দা।...তাহার (বৃদ্ধের) কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। (২/২৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

'ইমারত' গল্পে জনাব আলী আকর্ষণীয় মসজিদ মন্দির ও গৃহ নির্মাণ করলেও তার আশ্রয় হয়েছে বুড়ো বটগাছ তলায়। 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু বাজিকর তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তুলেছে। 'সাপুড়ের গল্প' - এ সাপুড়ের বাড়িঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন–

খাঁটি এবং খাস সাপুড়ে জাতের যারা তাদের তো আর কথাই নাই। খাল-বিলের কাছে পতিত প্রান্তরে সেই অরণ্যযুগের ঘর-দুয়ারে বাস করে, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, নাচ-গান, ভিতর-বাহির দেহ মনও তাই সেই আদিম এবং অরণ্য। (২/৩৬০)

'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে তারাশঙ্করের বর্ণনায় প্রহ্লাদ ভল্লার গৃহের চিত্র ফুটে উঠেছে–

গ্রামের প্রান্তে একেবারে মাঠের ধারে দুচালা লম্বা একখানা ঘর। সামনে খানিকটা ভিজে রক অর্থাৎ খোলা বারান্দা। সবই অবশ্য মেটে। নিকানো উঠানে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা। ঘরের মধ্যে একটা কালীমূর্তি। (৩/১৫৮)

রাঢ়ের প্রান্তবর্গীয় জনজাতির আবাসস্থলের যে বর্ণনা তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার স্ফুরণ দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের আবাসস্থল নির্মাণে নিজস্ব রুচি ও সংস্কৃতিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। গৃহ-নির্মাণ শৈলীতে এইসব জনজাতির অর্থনৈতিক চিত্রও প্রতিভাসিত হয়েছে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার

তারাশঙ্করের গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির পোশাক-পরিচ্ছদের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা ফুটে উঠেছে। চরিত্রের ধরন ও শ্রেণি-বর্ণ অনুসারে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের নিপুণ বর্ণনাদানে তারাশঙ্করের পটুতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 'স্থলপদ্ম' গল্পে প্রান্তিক বাগদি জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জার কথা বলা হয়েছে–

গ্রামের প্রান্তে পায়রাখুপির মত ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা-কালিপড়া হাঁড়ির গাদা, ছাইয়ের রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারী। অধিবাসীগুলি ওই আবর্জনার মতই নোংরা ...তার উপর শ্রীহীন সাজে আরও কুৎসিত দেখায়, মাথায় খাঁটো চুলের যোগান দিয়া বিঁড়ের মত প্রকাণ্ড খোঁপা-তাহাতে অগুন্তি বেল কুঁড়ির সারি, পরনে বাহারে পাড় শাড়ী; কিন্তু ময়লা চিট, আর পরিবার সে কি ভঙ্গি। (১/৫৮)

'মরুর মায়া' গল্পে সমাজের প্রান্তে অবস্থানরত হা-ঘরের দলের কথা বলা হয়েছে। এই ভবঘুরে সম্প্রদায়ের নারী পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদেহ পুরুষ রোদে-পোড়া তমাটে রঙ; পেশী-সবল দেহ, মাথায় দীর্ঘ রুক্ষ চুল, গলায় লাল পাথরের কণ্ঠী, স্ফটিকের মালা, হাতে কাঠের মোটা মোটা গুলের তাগা, কারও-বা লোহার; পরণে রঙিন খাটো কাপড়, গায়ে কুর্তা। মেয়ের দল–তাদেরও রোদে-পোড়া তামাটে রঙ, রুক্ষ পিঙ্গলাভ চুল-তার উপর রঙিন কাপড়ের ফালি বাঁধা উদ্দাম যৌবনকে বাঁধিয়া-আঁটা রঙিন কাঁচুলি, পরনে ঘাঘরা সমস্ত লইয়া একটা উগ্র সৌন্দর্য সবল চঞ্চল গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। (১/১২৩)

'যাদুকরী' গল্পে বাজিকর নর-নারীর পোশাক ও অলংকারের বর্ণনা পরিস্ফুটিত। বাজিকর নারীর পোশাক ও অলংকারের বর্ণনায় এইসব জনজাতির সৌখিনতার চিত্রও ফুটে উঠেছে–

মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশ বিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে বসে চুল বাঁধিতে। পরনে সৌখিন পাড় শাড়ি, হাতে একহাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিলটির চুড়ি, গলায় গিলটির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ী, এখন পরে গিলটির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভুষা। (২/৩৬৬)

'রাধারাণী' গল্পে যাত্রার মূল গায়েন গৌরদাসের পোশাক ও পরিহিত অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে–

মাথায় পাটীপাড়া ধরনের পরচুলা, তাঁহাতে সিঁথি। সিঁথির দুইটি শাখা চুলের রেখায় রেখায় বেড়িয়া কবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। কানে কান, নাকে নথ, গলায় চিক ও সাতনর, হাতে কঙ্কণ, বাহুতে তাবিজ ও বাজুবন্ধ, পরনে বিচিত্র বেশ, কপালে তিলকবিন্দুর সারি, নাকে রসকলি আঁকিয়া সাজিয়া দূতীরূপে সে আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। (২/১৬৯)

যাত্রা পালার মূল গায়েন এখানে নারী পোশাক ও অলংকার ব্যবহার করে নারী চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। তাছাড়া রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জাতি-উপজাতির পুরুষেরা নানা রকমের অলংকার শরীরে পরিধান করে থাকে। এটি রাঢ় সংস্কৃতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপেই বিবেচ্য।

'বেদেনী' গল্পে পোশাকের প্রসঙ্গ এসেছে। এই গল্পে শম্ভু ও রাধিকা তাঁবুতে সার্কাস দেখায়। তাই তাদের পরিধানের পোশাকে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়–

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোষাকটা বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙয়ের চোঙার মত সরু প্যান্টালুন, আর একটা কালো রঙয়েরই খাটো হাতা কোট। রাধিকার পরণে পুরানো রঙিন ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস।...উহাদের তাবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ধরনের বডিস। (২/২৪০)

'চোর' গল্পে শশী ও তার পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। পাশাপাশি ডোমদের সুসময়ের কথা উল্লেখ করে ডোম নারীদের অলংকার পরিধানের প্রসঙ্গে লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

নবীন স্বর্ণকার রূপার চুড়ি, সোনার নাকছাবী, কানের টপ তৈয়ারী করিয়াই দিন চালাইত। ডোম কন্যারা আজ কিনিয়া দশদিন পর আধা দামে বন্ধক দিত-অথবা বিক্রয় করিত। আবার বিশ দিন পর নূতন কিনিত। (২/৩০৬)

অন্ত্যজ শ্রেণির পোশাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহৃত অলংকারের এক নিটোল বর্ণনা উঠে এসেছে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে। পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার বস্তুগত সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপদান। রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারে যে নানামাত্রিক ভিন্নতা রয়েছে তা গল্পকার তারাশঙ্কর অত্যন্ত সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন।

খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যাভ্যাস

রাঢ় কেন্দ্রিক বীরভূম অঞ্চলের প্রান্তিক জনজাতির খাদ্যাভ্যাসে রয়েছে বৈচিত্র্যের সমাবেশ। তবে অন্ত্যজ সমাজের অধিকাংশ নারী-পুরুষের নেশাজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে মদ, তামাক, গাঁজা, সিগারেট ইত্যাদি পান ও সেবন করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া ভাত, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ক্ষীর, পিঠা-পায়েস ইত্যাদি রকমারি খাবারের বর্ণনা উঠে এসেছে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে। 'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পে ত্রিপুরা ভৈরব বৈষ্ণব বলরাম নিজের খাদ্যাভাসের বর্ণনা দিয়ে শাস্ত্রবাক্যের দোহাই পেড়ে বলেছেন–

> কারণ বারিতে আগে কর আচমন।
> মৎস মাংসে ভোগ পরে করিব নিবেদন।

রাগের বশে বলরাম গড় গড় করিয়া হুঁকা টানে। টানিতে টানিতে আবার গোঁয়ারের গোঁ বাড়িয়া যায়, ঠক করিয়া হুঁকাটা দাওয়ার উপর নামাইয়া কহে-

> আমি খাব, আমি মদ খাব মাংস খাব, আমার যা মন চায় তাই করব-তাতে কোন শালার কি? (১/২০৪)

এখানে বলরাম ভৈরব বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও মদ, তামাক, মাছ খাওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। 'সন্ধ্যামণি' গল্পে চাটুজ্জের বিড়ি সেবনের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে:

চাটুজ্জে দু'পা আগাইয়া কালীর দোকানে চাপিয়া বসিয়া আবার কালীকে প্রশ্ন করিল তারপর মেলা কেমন দেখলি বল দেখি? কই বিড়ি দে রে বাপু।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে বিড়ি দেশলাই টানিয়া লইল। (১/২১৭)

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে কালী বাগদী আদালতের কাছে নিজের কৃতকর্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মদ পান করার কথা বলেছে–

Dhaka University Institutional Repository

মদের নেশায় মাথায় ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে চুমুক দিতাম। (১/২৯২)

'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী আকণ্ঠ মদ পান করে বাড়িতে ফিরেছে। ঘোষ মহাশয় তারিণীকে যখন বলেছে কিছু চেয়ে নিতে তখন তারিণী বলেছে

এক হাঁড়ি মদের দাম আট আনা। (১/৪৫৯)

লেখকের বর্ণনায় তারিণীর মদপানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে-

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। (১/৪৬০)

'রায়বাড়ি' গল্পে বারণেশ্বর রায় নায়েবকে হুদ্দা শ্যামপুরের প্রজাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। খাবারে মাছ ও দুধ আছে কিনা এ ব্যাপারে রায় মহাশয় নিজে খোঁজ খবর নিয়ে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করেছেন-

খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে।

কত?

আজ্ঞে দশ সের।

হুঁ। দুধ?

সরকার এবার চুপ করিয়া রহিল। কর্তা আবার প্রশ্ন করিলেন

দুধের ব্যবস্থা হয়েছে?

আজ্ঞে অবেলায়-

... কর্তা বলিলেন, অতিথি তিথি মেনে আসে না,

বেলা দেখে আসে না। যাও, বাড়ির দুধ নিয়ে এস। (১/৫৯৩)

'অগ্রদানী' গল্পে ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী ভোজনপ্রিয় লোভী ব্যক্তি। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানসহ গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার অধিক খাবার গ্রহণের বিষয় গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে। গল্পটিতে শ্যামাদাস বাবুর বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ভোজনে পূর্ণ চক্রবর্তী মাছ, মিষ্টান্নসহ নানাবিধ খাবার গ্রহণ করেছে–

শ্যামাদাস বাবু বলিলেন, সে তো হবেই; একটা মাছের মুড়ো? পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, ছোট দেখে (১/৬৪২)

Dhaka University Institutional Repository

'মালাকার' গল্পে রজনী মালাকারের ভোজন বিলাসিতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে কারিগরের পাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন থাকে। কিন্তু ভাত থাকে না। রজনী যা আয় করে তাই নেশা নারী ও খাবারে ব্যয় করে। রজনীর খাবার পছন্দের ক্ষেত্রে তার আহার প্রিয়তার চিত্র ফুটে উঠেছে–

> একটা পর্দা-ঘেরা দেখাইয়া দিয়া দোকানী বলিল, বসুন গিয়ে।
>
> খাবার কি দোব?
>
> পর্দাটা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে করিতে রজনী বলিল, পোয়াখানেক
>
> মাংস, আর আর দুটো ডিম, ব্যাস। (২/১৮৪)

'চোর' গল্পে শশীর পাকি-মদ পান করার কথা বলা হয়েছে। ডোম নারী-পুরুষদের মদ, খাসীর মাংস, ভাত, পান খাওয়ার কথা এ গল্পে লেখক উল্লেখ করেছেন:

> বাসী মাংস ও ভাত খাইয়া-পান মুখে দিয়া ডোমেরা ম্লানমুখে চলিল। (২/৩০৮)

'ইমারত' গল্পে তামাক সেবন করার কথা বলা হয়েছে। রাজমিস্ত্রি জনাব আলী তামাক সেবন করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছে-

> বাবারে তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে টেনে লে একটান-। খুসবইওয়ালা তামাক। (২/৫৫০)

'বেদের মেয়ে' গল্পে দাগী চোর ভোলা খাসির মাংস ও পাকি মদ খেতে চেয়েছে। মদ সে পান করেছে এবং শিবি বেদেনীকে ডাকাতির গল্প শুনিয়েছে।

'শিলাসন' গল্পে অতিথিকে কাদনের বউ মধু ও ক্ষীরের পায়েস খেতে দিয়েছে। অতিথি মধু এবং ক্ষীর পরিতোষ সহকারে পান করেছে।

রাঢ়ের বিশেষভাবে বীরভূম অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের খাদ্যাভ্যাসে বিচিত্র রকমের খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান দিয়েছেন তারাশঙ্কর। এই খাদ্যাভ্যাস তাদের যাপিত জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়েই গড়ে উঠেছে। তাদের এই খাদ্যাভ্যাস রাঢ় সংস্কৃতিতে এনেছে ভিন্নতর মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি উপকরণ

তারাশঙ্কর তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে রাঢ়ের কৃষক সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ সমস্ত গল্পে তিনি নানা ধরনের কৃষি উপকরণের উল্লেখ করেছেন। 'প্রসাদমালা' গল্পে হরি মোড়লের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার কথা বলা হয়েছে। (১/১৩৪)

'নারী ও নাগিনী' গল্পে গরুকে প্রহার করার জন্য পাচন ছড়ির কথা বলা হয়েছে। (১/৩৬৮) 'ডাক-হরকরা' গল্পে দীনু ডোমকে কোদাল এবং ঘাস কাটার জন্য কাস্তে ও ঝুড়ি নিয়ে মাঠে যাবার উল্লেখ রয়েছে। (১/৫৮) 'কালাপাহাড়' গল্পে লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে–

লাঙ্গল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে। (২/৮৫)

'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পে ধান কাটার প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক কাস্তে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে–

পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই হাতের মুঠায় কোনমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধরে ডান হাতের কাস্তে টানে। (২/৪৯৬)

এই গল্পেও পাঁচন লাঠির কথা বলা হয়েছে। 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা' গল্পে কোদাল হেঁসোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক–

গোবিন্দ জনৈক ব্রাহ্মণকে বলেছে- 'একা কোদাল চালিয়ে জমি করেছি, এই ঘর করেছি। আমার চালের বাতায় ওই দেখ হেঁসো আছে। (৩/১২৬)

'মাটি' গল্পে মাটিওয়ালা মেওয়ালালের গাঁয়ের ক্ষেত-খামারের কথা বলা হয়েছে। মেওয়ালাল লেখককে গঙ্গা তীরে পাঁচ বিঘা ক্ষেত চাষ করার কথা বলেছে। মাটিওয়ালা জীওনলালকে লছমিয়া মেওয়ালাল বলে ডাকত। মেওয়ালাল লেখকের কাছে জমি চাষবাসের কথা বলে খুরপি ও কোদালির মতো কৃষিযন্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে। (৩/৭২)

তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের ব্যবহার যেমন দেখিয়েছেন; তেমনি এসব উপকরণের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠককে রাঢ়ের অন্ত্যজ কৃষি সমাজের একটা পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

লোকজ শিল্পকলা

তারাশঙ্করের গল্পে বিভিন্ন লোকশিল্পকলার বর্ণিল সমাবেশ লক্ষ করা যায়। লোকজ শিল্পকলা রাঢ়ের লোকসংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। লোকশিল্পকলা রাঢ়ের বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তৃতি লাভ করলেও; বীরভূমের লোকশিল্পকলার বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। 'রাজনগরে কারুকার্য সমন্বিত মাটির পুতুল তৈরি হয়ে থাকে। লোকপুরে কাঠের ওপর পিতলের পাতের নক্সা দিয়ে পাই (এক প্রকারের মাপমাত্র) তৈরি করা হয়ে থাকে। বক্রেশ্বর, তাঁতিপাড়া, করিধ্যা, ইলামবাজার প্রভৃতি জায়গায় রেশমবস্ত্র তৈরির ব্যবস্থা আছে। এককালে দেশ-বিদেশে ইলামবাজারের গালার কাজ ও তার শিল্প সুষমার বিশেষ খ্যাতি ছিল। আধুনিক কালে তৈরি শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে শ্রীনিকেতনে নানা ধরনের হস্তশিল্প ও কারুকলা জাত দ্রব্যাদি তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। এর মধ্যে কাপড় ও চামড়ায় বাটিকের বা নক্সার কাজ, চীনামাটির কাজ, এম্ব্রয়ডারির কাজ, তাঁতের তৈরি কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি বিখ্যাত। এছাড়াও দেওয়াল আলপনা, মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির অলঙ্করণ ও চিত্র রচনা, চণ্ডীমণ্ডপের থাম, দরজা প্রভৃতিতে কাঠের কাজও এই জেলার লোকসমাজের শিল্পরুচিকে প্রকাশিত করে থাকে।'[১] তারাশঙ্কর এ জেলারই গর্বিত সন্তান। তাই তাঁর ছোটগল্পে এ অঞ্চলের লোকশিল্পকলার সুপ্রচুর ব্যবহার উল্লেখ করে অন্ত্যজ জনজীবনের সঙ্গে এ শিল্পের সম্পৃক্ততা তিনি দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'প্রতিমা' গল্পে পূজা উপলক্ষে চাটুজ্জে বাড়িতে দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরির জন্য কুমারীশ কারিগরের ডাক পড়েছে। গল্পকার প্রতিমা নির্মাণের চিত্রটির অনুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরেছেন–

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে ...একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটির নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রু চোখ মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। (২/২৬)

'মালাকার' গল্পে ডাকসাজের কারিগর রজনী মালাকার। সে প্রতিমার প্রসাধন করে থাকে। প্রতিমার পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষণের সঠিক ব্যবহার করে সাজ-সজ্জা করতে রজনী মালাকারের পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। লেখকের বর্ণনায় সে চিত্র প্রতিভাত হয়েছে–

রজনীও আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হ্যারিকেনটি তুলিয়া ধরিয়া বেশ নিবিষ্ট চিত্তে প্রতিমাখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর চাঙারির কাপড় খুলিয়া বাহির করিল সোনালি রূপালি লাল সবুজ রাংতার আভরণগুলি। একখানা কাপড় মাটির উপর বিছাইয়া তাহার উপর আভরণগুলি থাকে থাকে সাজাইয়া ফেলিয়া আঠার মালসাটা টানিয়া আঠা মাখাইতে মাখাইতে গুনগুন করিয়া গান ধরিল–

হাতে দিব বাজুবন্ধ গলাতে সাতনর
চরণে বাজিবে মল ঝমর ঝমর। (২/১৭৯)

---

[১] শ্রী সনৎকুমার মিত্র, *পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০

Dhaka University Institutional Repository

'রাঙাদিদি' গল্পে লোকজ শিল্পকর্মের উল্লেখ রয়েছে। পটুয়া নারীরা যে বিভিন্ন লোকজ শিল্প কর্ম তৈরিতে নিপুণ কারিগর তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। বিভিন্ন রকমের চুড়ি, পুতুল, কাঁথা বা কাপড়ে নক্সা তৈরি শিল্পের বর্ণনা এ গল্পে প্রদত্ত হয়েছে–

চুড়ি গুলির রঙের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নামকরণ উহারা (পটুয়া নারীরা) নিজেরাই করিয়া থাকে। হলুদ রঙের চুড়িগুলির নাম সোহাগিনী, গাঢ় সবুজ গুলিকে বলে নীলমানিক, গুলবাহার চুড়ির রঙ গোলাপী। ঘোর লালের নামের বাহার সবচেয়ে বেশী– 'মনচোর'!

পুতুলের নাম আছে- 'কেশবতী; 'চম্পাবতী; 'কালিন্দী। কেশবতীর মাথায় বেড়প রকমের খোঁপা, চম্পাবতীর গায়ের রঙ হলুদ, নীল রঙের পুতুলের নাম কালিন্দী। মাথায় হাঁড়ি 'গোয়ালিনী' হাতে সাজি 'মালিনী', এ তো পুরানো নাম। এছাড়া পক্ষীরাজ-ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, লক্ষ্মীপেঁচা এসবও আছে। সরস্বতী নিজেই পুতুল গড়ে; গণপতি তাহাকে শখ করিয়া এ কাজ শিখাইয়াছে। আরও একটি ব্যবসা আছে পটুয়ার মেয়েদের। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ির মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তুলিবার জন্য। ছোট-বড়-তিন-চার রকমের সূচ হাতে করিয়া তাহারা গৃহস্থের বাড়িতে যায়, গৃহস্থ কাপড় দেয়, কস্তা দেয়– তাহারা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নক্সাগুলিও তাহাদের মুখস্থ। লতাপাতা, পাখি, ফুল, খেজুরছড়ি, বরফিকাটা, বৃন্দাবনী, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। পাঁচ বছরের পটুয়ার মেয়ে মা ঠাকুরমার কাছে উঠানে বসিয়া ধূলার উপর আঙুল দিয়া নক্সা আঁকিতে শেখে, মুখস্থ করে। (২/২৫৪-৫৫)

সমগ্র রাঢ় অঞ্চল লোকজ শিল্পকলার ঐতিহ্যে ও প্রাচুর্যে ভরপুর। তারাশঙ্করের জন্মভূমি লাভপুরসহ বীরভূমের রাজনগর, লোকপুর, বক্রেশ্বর, তাঁতিপাড়া, করিধ্যা, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানে এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সাধারণত রাঢ় সমাজের অন্ত্যজ জনসম্প্রদায় এ শিল্পের ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। প্রান্তশ্রেণির রুচি ও সংস্কৃতির এক অনাবিল মাধুর্য লোকজ শিল্পকলার মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। আবহমানকাল থেকে বস্তুগত সংস্কৃতির এক অতুলনীয় উপাদান রূপে এ শিল্প বিবেচ্য হয়ে আসছে।

বিবিধ সংস্কৃতি

বীরভূমসহ রাঢ়ের বিস্তৃত অঞ্চলের সংস্কৃতিতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। সংস্কৃতির এই বিপুলায়তন জগৎ গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। নান্দনিক এই সংস্কৃতিতে আরো কিছু উপাদান রয়ে গেছে। যেগুলিকে আমরা বিবিধ সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করছি। এর মধ্যে চুরি-ডাকাতি করার পূর্বে দীক্ষা সংস্কৃতি, চুরি করে ধৃত হয়ে জেলে যাওয়ার সময় ডোমদের বিশেষ রীতি-সংস্কৃতি, জেলেদের বিচিত্র আচার ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চুরি-ডাকাতি করার পূর্বে দীক্ষা সংস্কৃতি

চুরি বা ডাকাতি করার ক্ষেত্রে ডোমদের কিছু আচার-ব্রত বা রীতি রয়েছে। ঘোর অমাবস্যা রাতে কালীতলায় পাঁঠা পুজো দিয়ে চৌর্যবৃত্তি শুরু করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। 'চোরের মা' গল্পে এ রকম একটা রীতির উল্লেখ রয়েছে। নামকরা দাগী চোর শশীর বড় ভাইয়ের সন্তান ফিঙে প্রথম চৌর্যবৃত্তিতে অংশগ্রহণের পূর্বে শশী এ ধরনের একটা দীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে–

শশী বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার ছেলে হাবল আসিয়া বলিল-আজকে তো অমাবস্যা রইছে গো; কালীতলায় ফিঙের পূজোটা দিলে না কেনে? আজ ওকে বার কর, বেশ তো ডাগর হয়েছে।

–হুঁ। শশী-চিন্তাকুলভাবে বলিল হুঁ। তারপর সে হুঁকাটি পুত্রের হাতে দিয়া বলিল, পারবে হ্যাঁরে, ফিঙে পারবে?

হাবল বলিল– পারবে না কেনে? সে একবারে লাফ মারছে-হুঁ। তবে নিয়ে আয়, একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে আয়; কালীতলায় যে পূজো আজকে। (২/২১৪)

'প্রহ্লাদের কালী' গল্পে ডাকাতি করার পূর্বে বিশেষ রীতি-পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। প্রহ্লাদ দুর্ধর্ষ ডাকাত। ডাকাতি করার পূর্বে সে তার বাবার সাথে একদিন শেয়ালদহড়ার জঙ্গলে ফৌজদার-বাবার আস্তানায় পুজো দিতে গিয়েছিল। ডাকাতির পূর্বে প্রহ্লাদের এই বিশেষ রীতির বর্ণনা গল্পকার তুলে ধরেছেন এভাবে–

ফৌজদার-বাবা বিনা বাক্য ব্যয়ে পুজো নিলেন। মদের বোতল নিবেদন করে নিজের পাত্রে ঢেলে নিয়ে বাকিটা দিলেন তাদের বাপ-বেটাকে। পুজো শেষ করে বলি। তার বাবা একটা বড় পাঁঠা নিয়ে গিয়েছিল সেদিন।... তার (প্রহ্লাদের) বাবা আর সে-দুজনে কার-না-কার পাঁঠাটা ধরেছিল, বাবা দিয়েছিল বলি এই তলোয়ারে। ... সাঁ শব্দে বাতাস কেটে ঝিলিক হেনে নামল, ঝপ করে একটা শব্দ হল, পাঁঠাটা কেটে দু ফাঁক হয়ে গেল। তার তিন দিন পর সে (প্রহ্লাদ) বেরিয়েছিল প্রথম ডাকাতিতে। (৩/১৬৮)

চুরি বা ডাকাতি করার পূর্বে এই রীতি পালন কেবল রাঢ়ের আদিম সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে দেখা যায়।

চুরি করে ধৃত হয়ে জেলে যাওয়ার সময় ডোমদের আচরিত রীতি সংস্কৃতি

'চোর' গল্পে ডোম সমাজের নিজস্ব কিছু আচার-আচরণ, প্রথা-সংস্কার, রীতি-নীতির কথা বলা হয়েছে। শত বিপদ আপদের মধ্যেও তারা সেসব আচার-আচরণ পালন করে থাকে। চুরির দায়ে যেদিন সদরে গিয়ে ডোমরা আত্মসমর্পণ করেছিল সেদিনের বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে–

সেদিন ডোমদের আত্মসমর্পণের দিন! সদরে গিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সমস্ত পাড়া জুড়িয়া কান্নার রোল উঠিল। কনেস্টবল দারোগা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। এত দুর্দশার মধ্যেও গত রাত্রে খাসী কাটিয়া মাংস

Dhaka University Institutional Repository

রান্না হইয়াছিল। বিদায় ভোজ জাতীয় ব্যাপার। ইংরেজি ফ্যাশানের অনুকরণে নয়-তিনপুরুষ ধরিয়া তাহাদের এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। বাসী মাংস ও ভাত খাইয়া পান মুখে দিয়া ডোমেরা ম্লানমুখে চলিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে গেল। স্টেশনে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিবে। পথে বাহির হইয়া তাহারা চিৎকার করিয়া কান্নাবন্ধ করিল। এখন তাহারা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। ফিরিবে তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে। এই নিয়ম।

(২/৩০৮)

ডোম সমাজের নারী-পুরুষেরা এই রীতি পালনে অভ্যস্ত। ডোম পুরুষেরা চুরি করে, ধরাও পড়ে, আবার ধৃত হওয়ার সময় বিদায়কালীন ভোজ ও রীতিনীতি পালন করে থাকে। রাঢ়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিতে এই রীতিনীতি ভিন্নতর মাত্রা যুক্ত করেছে।

জেলেদের রীতি-সংস্কৃতি

জেলে সম্প্রদায়ের বিশেষ রীতি-নীতির কথা উল্লেখিত হয়েছে 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে। জেলেপাড়ায় মজলিস, কিংবা বিচার-আচার যাই হোক না কেন মদ সেখানে থাকতেই হবে। মদ্যপানে জেলেদের এই রীতির বর্ণনা দিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন–

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অপরাধ যাহাই হউক মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবণিতা ধর্মরাজতলায় জমিয়াছে। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল। (২/৩৭৮)

প্রান্তিক জেলে জীবনের এই সংস্কৃতি রাঢ় সংস্কৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাঢ়ের ব্রাত্য জনজাতির বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষের মধ্যে এ রকম স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ভাষা

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে রাঢ়ের বৃহত্তর ভূ-খণ্ডে বসবাসরত নানা শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম, পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের ভাবপ্রকাশের জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা। শ্রেণি বৈষম্য ভাষাকে অনেক সময় প্রভাবিত করে। এর ফলে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের মানুষেরা সমাজে তুলনামূলকভাবে নিম্নবর্ণের চেয়ে শুদ্ধ চলিত ভাষায় কথা বলে থাকে। সে দিক থেকে সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত প্রান্তিক জনজাতি অভিজাত শ্রেণির তুলনায় ভাব প্রকাশে অপেক্ষাকৃত কম শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। প্রান্তিক চরিত্রের মানুষেরা সর্বদা সমাজের কেন্দ্রচ্যুত থাকে বলে প্রমিত ভাষাভঙ্গি তাদের সাদা-মাটা জীবনের অলিতে গলিতে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। প্রান্তিক চরিত্রগুলো তাদের নিজস্ব কথাবার্তার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক

Dhaka University Institutional Repository

উপভাষা বা কথ্যভাষার ব্যবহার বেশি করে থাকে। কখনো কখনো সাধু-চলিতের দ্বৈত মিশ্রণও তাদের কথোপকথনে লক্ষ করা যায়। অঞ্চলভেদে ব্রাত্য জনগোষ্ঠী তাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশে স্থানিক ভাষা ও উত্তরাধিকার সূত্রে রপ্ত নিজস্ব ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকে। তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে সেতুবন্ধনরূপে কাজ করেছে।

'স্থলপদ্ম' গল্পে ব্যবহৃত ভাষায় বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের শুদ্ধ উচ্চারণ প্রান্তিক চরিত্রে এসে বদলে গেছে। যেমন-

> বেলে কহিল, কি লো রাধে মুড়ি খেয়েছিস?
> রাধে কহিল, 'মাছি থেলে মুলি কাবে, আমাল থেলে
> বালো থেলে' বলিয়া সে ছেলেকে
> ঘুম পাড়াইতে বসিল।
> পাকীতে দান কেলে, পাকীতে দান কেলে, খান্না দোব কিছে? (১/৬২)

প্রান্তিক চরিত্ররা নিজেদের মতো করে সহজভাবে শব্দ উচ্চারণের জন্য শব্দের বর্ণ গুলো বিকৃত করে। উপরের উদাহরণটিতে 'পাখি' বিশেষ্য পদটি 'পাকী' হয়েছে 'ধান' বিশেষ্যটি 'দান' হয়েছে 'খেলে' ক্রিয়াপদটি 'কেলে' হয়েছে।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপের ওঝা খোঁড়া শেখ তার চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহার করেছে। সংলাপের মধ্য দিয়ে খোঁড়া শেখের বিকৃত রুচিও ফুটে উঠেছে। খোঁড়ার ভাষায় চলিত কথ্যরূপের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়–

সে (খোঁড়া) বলিল দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে দেখ দেখি। জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমনই করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ সে যে কি বাহারের খেলা মাইরি। (১/৩৭০)

'দেখ দেখি', 'মাইরি' ইত্যাদি শব্দ গুলি চলিত ভাষার কথ্যরূপে, ব্যবহৃত হয়।

'মতিলাল' গল্পে রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে মতিলালের সংলাপে:

দাঁড়া, একখানা বড় আরশি এনে দোব তোকে। একটা টাকা দিস দেখিনি। (১/৪৮৭)

অন্যত্র

মামার ভিটে তো মোটে এইটুকুন ছোট ঘর, ছেলেপিলে হলে কুলোবে কেনে?

Dhaka University Institutional Repository

'দোব, দেকিনি, কেনে ক্রিয়াপদের এই বিশেষ রূপটি রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতি তাদের ভাষায় প্রায়শ ব্যবহার করে থাকে।

'ইমারত' গল্পে রাজমিস্ত্রি জনাব আলীর ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পরিবর্তিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। শব্দগুলি ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ হলেও উচ্চারণে ভিন্নতা লক্ষণীয়–

পরের ষোল আনি টাকা, যখুন ষোল আনি কাম করে লিবি, তখুন সি হল পারা ভসম্ (ভস্ম)। তাতে যা খাবি সে দিবে তুকে তাগদ। আর ফাঁকি দিয়ে লিবি-তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি সে হবে বদহজমী। (২/৫৫২)

এখানে ক্রিয়াপদের 'লিবি' 'খাবি' ইত্যাদির পরিবর্তিত রূপ ব্যবহৃত হয়েছে; সর্বনামের 'সি' 'তুকে' ইত্যাদির সঠিক রূপের বদলে পরিবর্তিত রূপের (সে, তোকে) প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

এই গল্পের ভাষায় বিদেশি আরবি ফারসি শব্দের সাবলীল প্রয়োগে গল্পকার তারাশঙ্কর বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন–

সে (জনাব আলী) জানে খোদাতায়ালার দরবারে এটা তার 'গুনাহ্'। তার এই পাপ 'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাহের গোনাহ্গারি তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষকে সে দেখেছে। ভালমানুষ আছে বৈকি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আসেন, ইমানদার মানুষ আছেন-তাইতো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওঁরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে, ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে, জেনা ব্যাভিচার করছে। সে সুদ খায় না; ঘুষ নেয় না; চুরি করে না। দস্তুরী অবশ্য নিয়ে থাকে সে মালিক জানে। (২/৫৬৩)

'গুনাহ', 'পয়গম্বর', 'বিলকুল', 'জেনা', 'দস্তুরী' ইত্যাদি আরবি ফারসি ভাষার শব্দকে তারাশঙ্কর গল্পের চরিত্র অনুযায়ী অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন।

'কমল মাঝির গল্প' -এ সাঁওতাল চরিত্রের উপযোগী ভাষা সৃষ্টিতে তারাশঙ্করের পারদর্শিতা অতুলনীয়। রাঢ়ের আদিবাসী সাঁওতালদের কথ্যভাষাকে তিনি এ গল্পে বাঙময় করে তুলেছেন–

কমল বলত–মনে মনে বল্– বুড়াবুড়ীর ছেল্যা–উ বটে তু– বটে। হঁ। ভাই বটে। ভাই বটে। ভাই বটে। আর আজ হাঁড়িয়া খাবি না। বেশি যদি হাঁকুপাঁকু করে পিরেতটো তবে নিজের লহু খানিকটা চিরে মাটিতে ফেলায়ে দে। বল–লে,খা। লে,খা। লে,খা। (৩/৩২০)

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষার আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে তারাশঙ্করের সাঁওতালদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন গল্পে। এরকম একটি গল্প 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পটিতে সাঁওতাল নারী ফুলমণির কথায় সাঁওতাল ভাষার কথ্যরূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে–

সিটো? কেনে এই দ্যাখ-ছোঁড়াগুলান ছুঁকছুঁক করে-আমি সোন্দর কিনা-খুব ছুঁকছুঁক করে, ভাব করতে চায়।...তারপর দেখলাম উ বজ্জাত বটে। লয় তো কুঁড়ে বটে। লয়তো চোর বটে-ছ্যাঁচড় বটে-মাতাল বটে। কেউ ভাল বটে-তা আমার ভাল লাগল না। তখন তাকে ছেড়ে দিলম। (৩/৪৬১)

রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূমের সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত ভাষার পাশাপাশি বীরভূমের আঞ্চলিক কথ্যভাষার কোন কোন রূপ ব্যবহার তারা আত্তীকৃত করেছে। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে ভাষার এই গ্রহণ-বর্জন চলেছে অবিরত।

প্রান্তিক জমাদার বা মেথর শ্রেণির ভাষার সাবলীল প্রয়োগ দেখা যায় 'বাবুরামের বাবুয়া' গল্পে। এ গল্পে চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার মধ্যে হিন্দি শব্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ভাষাই যেন এ গল্পে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে–

উঠো আমার জমাদারনী-সুখীয়া। পরম সুখীয়া বাবু!
আমার জিন্দগীর ওহি তো একঠো সুখ আছে! হ্যাঁ তবে আমাকে বড় বকে বাবু; মারেভি। (৩/৩৩৬)

প্রান্তিক চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের দক্ষতা অতুলনীয়। ভাষাকে তিনি চরিত্রের উপযোগী করে তুলেছেন। ভাষার গীতল ও সাবলীল প্রয়োগ চরিত্রকে মূর্ত করে তুলেছে এবং গল্পকে দিয়েছে ভিন্নতর দ্যোতনা। চরিত্রাভিমুখী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কল্লোল- পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর অদ্বিতীয়। রাঢ়ের প্রান্তিক চরিত্রের ভাষার ভুবন বিনির্মাণে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। অভিজ্ঞতা এবং স্বীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে রাঢ়কেন্দ্রিক বীরভূম অঞ্চলের প্রান্তজনের ভাষা ব্যবহার ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী সাধু-চলিত, কথ্য, দেশি-বিদেশি ও আঞ্চলিক উপভাষা প্রয়োগে তাঁর সফলতা বিস্ময়কর।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রান্তিক চরিত্রের স্বরূপ' শীর্ষক এই গবেষণায় তারাশঙ্করের ছোটগল্পে রাঢ়ের প্রান্তিক জনচরিত্রের স্বরূপ, তাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে শুরু করে জীবনের সার্বিক পরিকাঠামো স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। যেসব প্রান্তজনগোষ্ঠী রাঢ়ের সমাজজীবনে এনেছে বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা, সংস্কৃতিতে এনেছে দেশজ ঝাঁজ; ভাষায় ছড়িয়ে দিয়েছে আঞ্চলিক মৃত্তিকার ঘ্রাণ, সেইসব সম্প্রদায়ের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালবাসা আর বঞ্চনার কথামালা তারাশঙ্কর দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পের ক্ষয়িত আদর্শ, মধ্যবিত্তের নৈতিকতার দ্বন্দ্ব, পলায়নপরতা আর ভঙ্গুর মূল্যবোধ থেকে তিনি অনুভূমিক দূরত্বে অবস্থান করেছেন। এইজন্যে তাঁর গল্প বিশ্বাস, সত্য আর সুন্দরের ত্রিমাত্রিক চেতনায় প্রদীপ্ত। রাঢ়ের প্রান্তজনের লিপিকাররূপে এখানে তিনি তাঁর আপনত্বকে অতিক্রম করে ভিন্নতর এক বিশালতায় ধ্রুব এবং অপ্রতিরোধ্য।

বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্কর স্বতন্ত্র এইজন্যে যে, তাঁর চোখ দিয়েই বাঙালি পাঠক রাঢ়ের ভূ-প্রকৃতি, ভূ-সংস্কৃতি হতে শুরু করে এতদঞ্চলে বসবাসরত বিবিধ জনজাতির গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও তাদের রহস্যেঘেরা বহুবর্ণিল জীবনের আদিমতাকে প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর রাঢ়ের প্রবাদপ্রতিম কথাকোবিদ হিসেবে একালের পাঠকের সঙ্গে রাঢ় ভূ-খণ্ডের সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। স্ব সময়ের চেতনা থেকে প্রাগ্রসর তারাশঙ্কর তাঁর গল্পের ভুবনে বুনে দিয়েছেন কালিক দ্বান্দ্বিকতা। তাই তাঁর গল্প অতীতের সিঁড়ি অতিক্রম করে বর্তমানের প্রাণস্পন্দনকেই যেন ধারণ করে আছে।

ব্যক্তি তারাশঙ্করের দেশ-কাল ও সাহিত্যভাবনার মতো মৌলিক বিষয়কেও এই আলোচনায় অপরিহার্য প্রাসঙ্গিকতায় নবতর দৃষ্টিকোণ থেকে নিবিড়ভাবে অনুধ্যান করা হয়েছে। রাঢ়ের প্রান্তিক জনজাতিকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পে তিনি যে সাহিত্যের ভুবন বিনির্মাণ করেছেন তার প্রেরণা এসেছিল রাঢ়ের-ই নিভৃত পল্লিগ্রামের অবহেলিত অসহায় জনপদের যাপিত জীবন থেকে। দেশ-কাল তাঁর সাহিত্যভাবনায় কেবল প্রমূর্তই হয়নি, সেই সাথে তা রাঢ়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে প্রতীকায়িত করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রযত্ন বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। লাভপুর তাঁর মনোজগতে সাহিত্য সৃষ্টির যে বীজ বুনে দিয়েছিল তাই একদা সে অঞ্চলের আলো-বাতাসে, ভাব ও ভাষাতে ঋদ্ধ হয়ে সুশোভিত ও পল্লবিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলা ছোটগল্পে তারাশঙ্করের অবস্থান' শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করে তারাশঙ্করের পূর্ববর্তী গল্পকারদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাকে ভিন্নতর আঙ্গিকে প্রতিস্থাপিত করে ছোটগল্পে তারাশঙ্করের প্রাতিস্বিকতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ছোটগল্পের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তারাশঙ্করের মৌলকত্বকে নতুন প্রেক্ষণবিন্দু থেকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা ছিল এ অধ্যায়ে। ছোটগল্পের পালাবদলে, কালবদলে কিংবা জাতবদলে তারাশঙ্কর কেন অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র সারথি, জটিল-এ প্রশ্নের সহজ সমীকরণ এ পরিচ্ছেদে গুরুত্বের সঙ্গে নিবন্ধিত হয়েছে। ছোটগল্পের উন্মেষ, বিকাশ ও ব্যাপ্তিতে অন্যান্য গল্পকারদের মতো তারাশঙ্করের ব্যতিক্রমী অবদানকে বিনম্রচিত্তে- এ অধ্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের যে ঐশ্বর্য ও বৈভব, তিনি সে ঐশ্বর্যের ধারক ও বাহক।

এ গবেষণাকর্মে রাঢ়ের প্রান্তজনশ্রেণির জীবন, জীবিকা, সংস্কার-সংস্কৃতির আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। রাঢ়ের ব্রাত্য জনজাতির জীবনকে সুগভীর প্রযত্নশীলতায় তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে সাগ্রহে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের জীবনের নানা অকথিত উপাখ্যানের নন্দিত চিত্ররূপ উঠে এসেছে 'জীবন' অধ্যায়ে। এতদঞ্চলের বিভিন্ন শ্রমজীবী, পেশাজীবী জাতি, ধর্ম-বর্ণের মানুষের জীবনের অস্তিত্ব- সংগ্রামের বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ পরিচ্ছেদে। রাঢ়ের বিপ্রতীপ পরিবেশে বেড়ে ওঠা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবোধে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-বাস্তবতা, আনন্দ-বিষাদেও যে সকরুণ ইতিহাস, তা উক্ত পরিচ্ছেদে প্রতিবিম্বিত করা হয়েছে।

জীবিকার ক্ষেত্রে কোন কোন শ্রেণি বা গোত্র তাদের পূর্বপুরুষের পেশাতেই বৃত্তাবদ্ধ থেকেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দৃশ্যের ব্যতিক্রমী চিত্রায়ণও লক্ষ করা গেছে তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে। এসব ক্ষেত্রে প্রান্তিক চরিত্র স্বশ্রেণি-বিচ্ছিন্ন হয়ে রুচিশীল জীবিকা গ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রস্থ সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সংস্রব স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে। 'জীবিকা' অংশে রাঢ়ের নিরভিমান জনজাতির বিচিত্র জীবিকার কারণ, ধরন, গতি, প্রকৃতিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিনির্ণয় করা হয়েছে। কালিক পরিবর্তনের যে ঢেউ একদা রাঢ়ের সামন্ত সমাজকে আন্দোলিত করেছিল, তারই ফেনিল স্রোত এ অঞ্চলের প্রান্ত সম্প্রদায়ের জীবিকার বন্দরে আছড়ে পড়েছিল। এ কারণে এদের জীবিকার ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জন, পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন কীভাবে ঘটেছে তা প্রদর্শিত হয়েছে এ-পরিচ্ছেদে।

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ের প্রবর্ধমান সংস্কার ও সংস্কৃতির বিচিত্র ভুবনকে এ গবেষণায় ভিন্নতর মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে। নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অন্বেষণ করা হয়েছে এই সংস্কৃতির বহুবর্ণিল রূপ ও তার শেকড়কে। রাঢ়ের বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভূত সংস্কার ও সংস্কৃতির বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কালের বিচারে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এই সমাজের অন্তর্গত বিবিধ সম্প্রদায়ের সরলপ্রাণ মানুষগুলি নানামাত্রিক কুসংস্কারকে যুগ যুগ ধরে ধারণ ও লালন করে আসছে। যুগসঞ্চিত ও প্রজন্মপালিত এই সমস্ত সংস্কার-বিশ্বাসকে এ গবেষণায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যাতীত কিছু কিছু সংস্কারকে প্রান্তিক মানুষের চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা ও বিশ্বাসবোধের সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে 'সংস্কার ও সংস্কৃতি' পরিচ্ছেদে।

রাঢ়ের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ইতিহাসকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ গবেষণাকর্মে। সামন্ত সমাজকাঠামো ভেঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের সন্ধিক্ষণেও এতদঞ্চলের সংস্কৃতি কীভাবে তার নিজস্বতাকে ধারণ করে আপন মহিমায় দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে তার বর্ণনা ওঠে এসেছে এই গবেষণাকর্মে। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন পূজা, পার্বণ, ব্রত, লোকাচার, লোকরীতি, লোকছড়া, লোকনৃত্য, লোককলা, সঙ্গীত, যাত্রা, মেলা, প্রবাদ-বচন, কিংবদন্তি, আবাসস্থল, খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিবিধ সংস্কৃতির চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রূপান্বিত হয়েছে সংস্কার-সংস্কৃতি অধ্যায়ে। তারাশঙ্করের গল্পে বর্ণিত রাঢ়ের বিলুপ্তপ্রায় দুর্লভ সংস্কৃতির বিচিত্র দিক নানা তথ্য-উপাত্ত সহকারে প্রতিচিত্রায়িত করা হয়েছে উক্ত পরিচ্ছেদে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রাঢ় মাটির স্বভাব শিল্পী। জীবনের গাঢ় কালো অন্ধকার দিনগুলিতেও তিনি অটল অবিচল বিশ্বাসে ছিলেন দৃঢ়। নিয়তির উপর কারো হাত নেই, মানুষ নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবমাত্র– এ রকম বিশ্বাসবোধ তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তায় সদা জাগ্রত ছিল। সমকালীন যুগের অস্থিরতা তাঁকে চিন্তিত করেছে সত্য, কিন্তু বিপর্যস্ত করেনি। ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাসে তিনি ছিলেন একাত্ম। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামমুখর তারাশঙ্কর ছিলেন জীবনযুদ্ধে হার না মানা অপরাজেয় নায়ক। তাঁর মানসপ্রবণতায় রাঢ়ের রুক্ষতা ও সতেজতার দ্বৈত সংমিশ্রণ সর্বদা প্রবহমান। তিনি রাঢ়ের জাত, রাঢ়-ই তাঁর পৃথিবী। রাঢ়ের প্রান্তিক সমাজের ব্রাত্য মানুষগুলির অকথিত নানা অধ্যায় তাঁর সাহিত্যে উন্মোচিত হয়েছে। তিনি রাঢ়ের অন্ত্যজ মানুষদের জীবনাচার দেখেই ক্ষান্ত হননি, সেই জীবনকে গভীর দর্শনে, বন্ধনহীন আবেগে কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়ের প্রান্তিক চরিত্রের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা সভ্য সমাজের কাছে এতদিন অপ্রকাশ্য ছিল। তিনি রাঢ়ের প্রান্ত জনচরিত্রের জীবনাঙ্কনে একক কৃতিত্বের অধিকারী কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক। দেশীয় আচার-আচরণ, প্রথা, রীতি-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিমুখ রূপে বিবেচ্য হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র- পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর নবতর ধারার স্রষ্টা। 'কল্লোল' কালের নেতিচেতনা থেকে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। তাঁর সাহিত্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও বাস্তবতার জলছবির বুননে। তাঁর সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুই রাঢ় বাংলা। সেখানে বসবাসরত অগণিত ব্রাত্য জনজাতির আচরিত জীবন, জীবিকা ও কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহের বিষয়। সাহিত্যে তিনি মানবধর্মের ফুল ফুটিয়েছেন। তাই শত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে রাঢ়ের গণমানুষের প্রতিচ্ছায়া। রাঢ়ের প্রান্তিক মানুষের কাহিনিকার হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান সুবিদিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প গ্রন্থ

(বর্ণক্রম অনুসারে)

জলসাঘর	:	কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪১
পৌষলক্ষ্মী	:	কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৯৬২
প্রতিধ্বনি	:	কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ	:	৩ খণ্ডে ১৯০ টি গল্প সংকলিত, ১ম খণ্ড ১৯৭৫ (সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৪), ২য় খণ্ড ১৯৭৬ (অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৫), ৩য় খণ্ড ১৯৭৭(সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৫) সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ
তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প	:	কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৩
তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প	:	কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯
তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প	:	কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪৭
স্থলপদ্ম	:	কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

লেখক/ সম্পাদক নামের বর্ণানুক্রমে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ* (কলকাতা: এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম সংস্করণ, ১৪১৬)

অজয় রায় : *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা: সাহিত্যিকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫)

অতুল সুর : *বাঙলা ও বাঙালরি বিবর্তন* (কলকাতা: সাহিত্যলোক, তৃতীয় সংস্করণ,২০০১)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের পুত্তলিকা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২)

অরুণ সান্যাল (সম্পাদক) : *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১)

অলোক রায় : *তারাশঙ্কর দেশ-কাল* (কলকাতা: সব্যসাচী অধিকারী ১/৪৭ রাখাল ঘোষ লেন,১৯৯৮)

আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মডার্ন টাইপ ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* (কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৪)

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর দেশ-কাল সাহিত্য* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার/
সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক): *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ* (কলকাতা: মিত্র ওঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৬, তারাশঙ্কর স্মারক সমিতি পরিবেশক)

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার লোক-সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)

গিয়াস শামীম : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২)

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: মুক্তধারা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮)

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪)

গৌতম ভদ্র/
পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১)

চিত্ত মণ্ডল/
প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পাদক) : *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০৩)

Dhaka University Institutional Repository

জগদীশ ভট্টাচার্য : *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী* (কলকাতা: ভারবি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)

জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক) : *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* ১ম খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪)

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : *কল্লোলের কাল* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৩)

: *প্রমথ চৌধুরী* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৬)

তপন রুদ্র (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ২০০৯)

: *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস সমগ্র* (ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, *তারাশঙ্কর রচনাবলী১০ম খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৮)

: *আমার সাহিত্য জীবন* (কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৪)

: *গ্রামের চিঠি* (কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৮৬)

ত্রিলোচন জানা : *তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রান্তিক সমাজ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৫)

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর-মানিক* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪)

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা* (কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭)

নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

বড়ু চণ্ডীদাস : *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত), (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬৪)

বিনয় ঘোষ : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬)

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

বিষ্ণু বসু (সম্পাদক) : *তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৯)

বীরেন্দ্র দত্ত : *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০)

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

: (সম্পাদিত) *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০১)

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৯)

মহীবুল আজিজ : *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (ঢাকা: শাখি অফসেট প্রেস, প্রথম মুদ্রণ, ২০০২)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : *মেঘনাদবধ কাব্য*, ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদিত), (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৯)

মিল্টন বিশ্বাস : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯)

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩)

রঞ্জনকুমার দাস (সম্পাদিত) : *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), (কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় : *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা* (কলকাতা: নর্বাক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭)

রথীন্দ্রনাথ রায় : *ছোটগল্পের কথা* (কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৯৮৮)

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭)

শিশির কুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প* (কলকাতা:দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০২)

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়/

অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) : *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (কলকাতা: লক্ষ্মী নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৮)

শ্রী সনৎকুমার মিত্র : *পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা* (কলকাতা: বিশ্বাস পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮২)

সনৎকুমার গুপ্ত (সম্পাদিত) : *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৭)

সাফিকুন্নবী সামাদী : *তারাশঙ্করের ছোটগল্প: জীবনের শিল্পিত সত্য* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪)

সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক : *তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা: প্রতিভাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা::দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০)

: *তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪০৮)

: (সম্পাদিত) *তারাশঙ্কর অন্বেষা* (কলকাতা: রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

সুকুমার সেন	:	*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৫ম খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৬)
সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত)	:	*ধ্রুবপদ* (বুদ্ধিজীবীর নোটবই), (কলকাতা: বি.বি.সি প্রিন্টিং এন্টারপ্রাইজ, বার্ষিক সংকলন-৪, ২০০০)
সুবোধ দেবসেন	:	বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯)
সোহরাব হোসেন	:	*বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্য জীবন* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৪)
সৈয়দ আকরম হোসেন	:	*প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)
সৌমিত্র শেখর ড.	:	*কথাশিল্প অন্বেষণ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬)
হাসান আজিজুল হক	:	*কথাসাহিত্যের কথকতা* (ঢাকা:সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক- প্রবন্ধ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর প্রসঙ্গ, *তারাশঙ্কর: দেশ-কাল সাহিত্য*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

জগদীশ ভট্টাচার্য : ভারত শিল্পী তারাশঙ্কর, *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদক: রঞ্জনকুমার দাস (কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

জরাসন্ধ : তারাশঙ্কর ও রাঢ়দেশ, *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৬, তারাশঙ্কর স্মারক সমিতি পরিবেশক)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কথা, *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদক: রঞ্জনকুমার দাস (কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

দীপক চন্দ্র : তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি, *তারাশঙ্কর: দেশ-কাল সাহিত্য*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, সম্পাদক: শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (কলকাতা: লক্ষ্মী নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮)

বরুণকুমার চক্রবর্তী : তারাশঙ্কর: আচার- ধর্ম ও সংস্কার, *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৯)

বিনয় ঘোষ : তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদক: রঞ্জনকুমার দাস (কলকাতা: নাথ

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলা ছোটগল্প: রূপ- রূপান্তর, *একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯* (ঢাকা: বংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)

বীরেন্দ্র দত্ত : তারাশঙ্করের আগে ও পরে, *তারাশঙ্কর: দেশ-কাল সাহিত্য*, সম্পাদক: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

রণজিৎ গুহ : একটি অসুরের কাহিনী, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯)

রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্পকার তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, সম্পাদক: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা: রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭)

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : জীবন- সত্যের সার্থক সন্ধানী তারাশঙ্কর, *শনিবারের চিঠি* (তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদক: রঞ্জনকুমার দাস (কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)

সুরেশচন্দ্র মৈত্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: উপন্যাসে ও উপকথায় অকৃত্রিম, *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*, সম্পাদক: অরুণ সান্যাল (কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ,১৯৯১)

সেমন্তী ঘোষ : সাব- অলটার্ন, *ধ্রুবপদ* (বুদ্ধিজীবীর নোটবই), সম্পাদক: সুধীর চক্রবর্তী (কলকাতা: বি.বি.সি প্রিন্টিং এন্টারপ্রাইজ, বার্ষিক সংকলন-৪, ২০০০)

হিতেশরঞ্জন সান্যাল : বাংলায় জাতি'র উৎপত্তি, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, সম্পাদক: শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (কলকাতা: লক্ষ্মী নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

	:	*Census Report of India*, 1901, 1931
C.A. Bayly	:	*Ralling Around the Subaltern*, The Journal of Peasant Studies, Vol. 16, No-1, 1988.
Crapo Richley H.	:	*Cultural Anthropology*, Mcgraw-Hill, 5th ed, 2002, New York
David Arnold	:	*Gramsci and Peasant Subalternity in India*, The Journal of Peasant Studies, Vol.II, No-4, 1984.
W. W. Hunter	:	*The Annails of Rural Bengal*, 1975